মাসুদ রানা

অন্ধ শিকারী

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অন্ধ শিকারী ১

কাজী আনোয়ার হোসেন

বহু বছর পর লণ্ডনের রাস্তায় নিজের এক
শিস্যের সঙ্গে হঠাৎ করেই দেখা হলো গিলটি মিয়ার।
এর পরপরই শুরু হলো ঘটনা প্রবাহ।

জড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা।
ক্রমে উন্মোচিত হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের
এক ঘৃণ্য, বিশ্বাসঘাতী ষড়যন্ত্র।
যা সফল হলে পারমাণবিক শক্তিগুলো
জড়িয়ে পড়বে স্যাবোটাজ কাউন্টার-স্যাবোটাজে–
বীভৎস প্রতিশোধের লড়াইয়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২১৭

অন্ধ শিকারী ১

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা-২১৭

অন্ধ শিকারী ১

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

ISBN 984 16 7217-0

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-217
ANDHO SHIKARI
Part-1
By: Qazi Anwar Husain

এক

মস্কো। প্রসপেক্ট মিরা ওয়ান ইলেভেন। সুউচ্চ এক ফ্রন্ট অ্যাপার্টমেন্টের চারতলা। বিলাসবহুল সীটিংরুমে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়সী, রাশভারি এক ব্যক্তি—জেনারেল পিওতর সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো। গ্লাভনোই রাযভেদিভেটেলনোই আপ্রাভলেনিয়ে বা জিআরইউ বা সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স প্রধান। বেলা বাজে এগারোটা। এখনও রোব পরে অলস পায়ে ঘরময় পায়চারি করছেন জেনারেল।

আজ অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই তাঁর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বময় কর্তা, প্রেসিডেন্ট ও পার্টির সাধারণ সম্পাদকের গোপন নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি নিয়েছেন। অসুস্থতার অজুহাতে। আজই শুরু হয়েছে ছুটি। কেন হঠাৎ করে ছুটি নিতে বলা হয়েছে জানেন না জেনারেল মার্চেঙ্কো, তবে অনুমান করতে পারেন।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে সপরিবারে নিজের সরকারী সামার রিট্রিট কিসলভদ্সক্-এ গিয়েছিলেন মার্চেঙ্কো। ওখানে অবসর কাটানোর ফাঁকে ফাঁকে ব্রিটেনের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভদের পরাজিত করে লেবার পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে বিস্তারিত এক রিপোর্ট তৈরি করেন তিনি। লেবার পার্টি মস্কোপন্থী, ওদের ক্ষমতায় বসানো গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাভ। ছুটি সেরে মস্কো ফিরে

রিপোর্টটা সাধারণ সম্পাদককে নিজে যেচে পড়তে দিয়েছিলেন জেনারেল মার্চেঙ্কো।

তিনি জানেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করেন, তাঁর দেখিয়ে দেয়া পথে এগোতে পারলে লেবার পার্টির জয় ঠেকাতে পারবে না কেউ। ওরা ক্ষমতায় গেলে দলের ভেতর যেসব কট্টর মার্কস-লেনিন ও ট্রটস্কিপন্থী আছে, তাদের সাহায্যে চরম এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়া যাবে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে। তাঁর এ বিশ্বাসের কারণ আছে। গত দু'বছর ধরে টাকা, মেয়েমানুষ এবং আনুষঙ্গিক এটা-ওটার দেদার চাহিদা মিটিয়ে আসছেন জেনারেল ওই দলের বাঘা বাঘা সব 'পন্থীদের'।

অর্থের অভাব নেই জেনারেল মার্চেঙ্কোর। রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে দেশের স্বার্থে যত খুশি খরচ করার অধিকার রয়েছে তাঁর। তেমনি লোকবল। শুধু ব্রিটেনেই আছে ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে কয়েক হাজার জিআরইউ রেসিডেন্ট। প্রায় সবাইকেই কাজে লাগিয়েছেন তিনি। আর মেয়েমানুষ? ওর চেয়ে সস্তা আর কি আছে দুনিয়ায়? এর ফলও তেমনি পেয়েছেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। সম্প্রতি ব্রিটিশ ডিফেন্স মিনিস্ট্রির এক রাঘব বোয়ালের কাছ থেকে এক হাত ঘুরে ন্যাটোর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট হাতে পড়েছে তাঁর, যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। কাজেই ছুটি নেয়ার গোপন নির্দেশের কারণ যে তাঁর সেই রিপোর্ট, অনুমান করতে পারেন জেনারেল পিওতর সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো।

ডিসপেনসার থেকে গরম এক কাপ কালো কফি নিয়ে আবার সীটিংরুমে ফিরে এলেন তিনি। বাসায় এ মুহূর্তে আর কেউ নেই। স্ত্রী দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে বরফ জমা গোর্কি পার্কে স্কেট্ করতে গেছেন। আকাশের মুখ ভার। আধ ঘণ্টাখানেক হলো বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে। তবে ভাব দেখে বোঝা যায় আবার শুরু হলো বলে। অ্যাপার্টমেন্টের সামনের

প্রশস্ত রাস্তায় জমে ওঠা বরফ নিরলসভাবে পরিষ্কার করে চলেছে গোটা ছয়েক বাবুশকা।

আনমনে ওদের কাজ দেখছেন সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো। থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছেন গরম কফিতে। হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। কে এল? স্ত্রী বা ছেলেমেয়েরা হতে পারে না, ঘণ্টাখানেকও হয়নি বেরিয়েছে তারা।

প্রসপেক্ট মিরা ওয়ান ইলেভেন মূলত জিআরইউর সিনিয়র অফিসারদের আবাসিক এলাকা। এদের পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরের আর কেউ প্রবেশ করতে চাইলে হোস্টের অনুমতি প্রয়োজন হয়। এছাড়া গার্ড পোস্টের ঝামেলা তো রয়েইছে। কাজেই বাইরের কেউ হতে পারে না। তাহলে কে? ভাবতে ভাবতে দরজা খুললেন জেনারেল।

দীর্ঘদেহী এক যুবক দাঁড়িয়ে সামনে। অচেনা। এ নিশ্চয়ই অন্য কারও কাছে এসেছে, ভাবলেন তিনি। পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না বয়স। পরনে চমৎকার ছাঁটের গ্রে ওভারকোট, মাথায় ফারের শাপকা। শীতল, স্থির চাউনি তার নীল দু-চোখে। তার খটখটে শুকনো পালিশ করা জুতো ইঙ্গিত দিচ্ছে, উষ্ণ গাড়ি থেকে সরাসরি সেন্ট্রালি এয়ারকণ্ডিশণ্ড এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে প্রবেশ করেছে সে।

ওপরে উঠে এল জেনারেলের দৃষ্টি। চোখাচোখি হলো দুজনের। এই সময় কথা বলে উঠল যুবক। ভরাট, প্রায় গমগমে কণ্ঠে বলল, 'কমরেড জেনারেল পিওতর মার্চেঙ্কো?'

'হ্যাঁ!' বিস্মিত হলেন তিনি। এ তাঁরই কাছে এসেছে! আশ্চর্য! কই, গেটের সিকিউরিটি তো হোস্টের অনুমতি চায়নি! এ জাতীয় ব্যতিক্রম আর কখনও এই ব্লকে হয়েছে বলে জানা নেই জেনারেলের।

'আমি মেজর কিরলভ। নাইনথ্ ডিরেক্টরেট। সিপিএসইউ জেনারেল সেক্রেটারির পার্সোন্যাল স্টাফ।'

কেজিবির অসংখ্য শাখার একটি নাইনথ্ ডিরেক্টরেট। উঁচু পদের পার্টি নেতাদের ব্যক্তিগত এবং অফিস ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান এদের কাজ। এদের মত সব বিষয়ে কড়া ট্রেইনড্, বিশ্বস্ত এবং নির্দয় বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে আর একটিও গড়ে ওঠেনি। ক্রেমলিন গার্ড এদের আরেক পরিচয়। জেনারেলের কোঁচকানো ভুরু সমান হয়ে গেল। নামটা কানে যাওয়ামাত্র বুঝতে পেরেছেন, এই মেজরই পরশু জেনারেল সেক্রেটারির তরফ থেকে ফোনে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল।

'বলুন, মেজর?'

'একটা চিঠি, কমরেড জেনারেল,' গ্রেটকোটের পকেট থেকে বাদামি রঙের একটা খাম বের করে এগিয়ে ধরল মেজর কিরলভ।

'ধন্যবাদ।' খামটা রোবের পকেটে রাখতে যাচ্ছিলেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। থেমে গেলেন মেজরকে মাথা দোলাতে দেখে।

'দুঃখিত, জেনারেল। ওটা পড়ে এখনই ফেরত দিতে হবে।'

কৌতুক বোধ করলেন মার্চেঙ্কো। 'কার নির্দেশে?'

'জেনারেল সেক্রেটারি, সিপিএসইউ,' বলতে গিয়ে একটু যেন কঠোর হয়ে উঠল মেজরের চেহারা।

মুহূর্তে কৌতুক উবে গেল জিআরইউ প্রধানের। 'আই সী! তা...ইয়ে, ভেতরে আসুন, মেজর।'

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল। আমি এখানেই অপেক্ষা করতে চাই।'

'বেশ।' কয়েক পা পিছিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভেতরের চিঠিটা বের করে পড়লেন। পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল। মোটা নিবের সাহায্যে স্বয়ং জেনারেল সেক্রেটারি লিখেছেন চিঠিটা। ছাপার মত ঝরঝরে হস্তাক্ষর, চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে

করে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি, বাড়তি কথা নেই একটিও।

যা অনুমান করেছিলেন জেনারেল, ঠিক তাই। আচমকা তাঁকে ছুটি নেয়ার নির্দেশের পটভূমি তাঁর সেই রিপোর্টটিই। এবং আজই, ৩১ ডিসেম্বর, এ ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন সাধারণ সম্পাদক। মাঝরাতে। পড়া শেষে চিঠিটা মেজর কিরলভের হাতে ফেরত দেয়ার নির্দেশও আছে ওতে। খামে পুরলেন জেনারেল চিঠিটা। ফিরে এলেন দরজার কাছে।

ওটা পকেটে রেখে বলল মেজর, 'ঠিক সাড়ে এগারোটায় আপনার জন্যে গাড়ি নিয়ে নিচে অপেক্ষা করব আমি, কমরেড জেনারেল।'

'আমি অধীর অপেক্ষায় থাকব,' হাসি ফুটল মার্চেঙ্কোর মুখে।

মেজরের গাম্ভীর্যেও যেন সামান্য ফাটল ধরল এবার। তবে তা খুবই সামান্য। জেনারেলকে সম্মান জানানোর জন্যে নড করল কিরলভ। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লিফটের দিকে চলল। এক মিনিট পর সীটিংরুমের জানালা দিয়ে কুচকুচে কালো একটা চইকা লিমুজিন বেরিয়ে যেতে দেখলেন জেনারেল। সেন্ট্রাল কমিটির এমওসি নাম্বার প্লেট ওটার। শোফার নেই, মেজর নিজেই ড্রাইভ করছে। বড় রাস্তায় উঠে দক্ষিণমুখো ছুটল চইকা।

ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল। হাসতে শুরু করলেন। ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে চেহারা। তাঁর রিপোর্টটা মনে ধরেছে জেনারেল সেক্রেটারির, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আরও সুখের এবং তৃপ্তির ব্যাপার যে ওটা প্রস্তুতের আর কোন ভাগীদার নেই। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর একার। সব যদি ঠিকঠাক মত চলে, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরপর একদিন পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য দেশগুলোর, এক এক করে। হুঁম! মাঝরাতে, ভাবলেন মার্চেঙ্কো।

মস্কোর হাজার মাইল পশ্চিমে, লণ্ডনে, আরও একজন ভাবছে মাঝরাতের

কথা। অভিজাত ওয়েস্ট এণ্ডের বেলগ্রাভিয়া রোডের এক কার পার্কে ভাড়া করা পিচ্চি এক ভলভো এস্টেটে বসে আছে সে। নজর উল্টোদিকের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ফন্টেনয় হাউসের ওপর।

পাকা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে জিম প্রেসটনের, আজ রাতেই মহামূল্য গ্রেন ডায়মণ্ডগুলো হাতাবে সে। ঠিক মাঝরাতে। সারা শহর যখন নতুন বছরকে বরণ করার উৎসবে বেসামাল উন্মত্ত থাকবে, তখন। তবে আগে নিশ্চিত হতে হবে ওগুলো সে সময় জায়গামতই থাকবে, স্থান বদল করবে না। এবং ওগুলোর মালিক, শেফিল্ডের ডিউকের ছোটবোন, লেডি ফেডোরা; যেমনটি খবর সংগ্রহ করা গেছে, ডিউকের আমন্ত্রণে তাঁর উত্তর ইয়র্কশায়ারের বাগানবাড়িতে আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্বামীসহ লণ্ডন ত্যাগ করছেন।

জিম প্রেসটন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। জন্ম কলকাতায়। বছর পনেরো আগে এ দেশে আগমন তার। আর ফিরে যায়নি। রয়ে গেছে দূর সম্পর্কীয় এক চাচার আশ্রয়ে। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ প্রেসটন। নারকেলের রশির মত পাক দেয়া পেশীবহুল চওড়া দেহ। চেহারা শিশুসুলভ। একমাথা কোঁকড়া কটা চুল, আগোছাল। পেশায় আগে ছিল প্রেসটন ছিঁচকে চোর। হাতে খড়ি নিয়েছিল কোলকাতায় বাঙালি এক ওস্তাদের কাছে। বর্তমানে চুরি ছেড়ে খানিকটা জাতে উঠেছে সে। লণ্ডনের অন্যতম সেরা ক্র্যাকস্‌ম্যান এখন জিম প্রেসটন।

পিঠ সোজা করে বসে আছে সে। পরনে শোফারের ইউনিফর্ম। এটাও ভাড়া করা। ফন্টেনয় হাউসে থাকে তার শিকার। স্থির, নিষ্কম্প দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে আছে প্রেসটন। পার্কে আরও অনেক গাড়ি আছে, প্রায় সবগুলোর সঙ্গেই রয়েছে ইউনিফর্ম পরা শোফার। কাজেই প্রেসটন নিশ্চিত, কেউ সন্দেহ করবে না তাকে। ঠিক সাড়ে সাতটায় মৃদু হাসি

ফুটল তার মুখে। বেরিয়ে আসছে শিকার। লেডি ফেডোরা এবং তাঁর স্বামী, রবার্ট ফিলবি।

ভবনের আউট লেখা গেটের বিশাল স্টীলের পাল্লা খুলে গেছে। ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক লিমুজিন—ডিমলার জাগুয়ার। রবার্ট ফিলবি নিজেই ড্রাইভ করছেন। ভদ্রলোক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন হোমরা চোমরা। পাশেই লেডি ফেডোরা। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো প্রেসটন। সকালের মিষ্টি রোদ জাগুয়ারের মসৃণ চকচকে দেহে পড়ে পিছলে এসে ধাঁধিয়ে দিয়েছে চোখ।

এক মুহূর্ত থেমে থাকল গাড়িটা। বড় রাস্তায় ওঠার আগে ডানে-বাঁয়ে দেখে নিলেন ফিলবি। তারপর নিঃশব্দে গড়িয়ে দিলেন ভারি জাগুয়ারটিকে। মসৃণ গতিতে জিম প্রেসটনের নাকের ডগায় এসে বাঁক নিল ওটা, তারপর রাজকীয় চালে ছুটল হাইড পার্ক কর্নারের দিকে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর স্টার্ট দিল প্রেসটন, লট থেকে বেরিয়ে এসে রওনা হলো পিছন পিছন।

দশ মিনিট পর পার্ক লেনে পড়ল গাড়ি দুটো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল প্রেসটন। সামনে কাউটস্ ব্যাঙ্কের একটি শাখা রয়েছে। লকার ভাড়া দেয়াই এদের মূল ব্যবসা। ভয় হলো ডায়মণ্ডগুলো হয়তো ওদের কাছে গচ্ছিত রেখে যাবেন লেডি ফেডোরা। কিন্তু না, থামল না জাগুয়ার ব্যাঙ্কের সামনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল প্রেসটন।

গতি ক্রমেই বাড়ছে সামনের গাড়ির। গ্রেট কাম্বারল্যাণ্ড প্লেস ছাড়িয়ে গ্লস্টার প্লেসে পড়ল ওটা। ঝড়ের গতিতে ছুটছে এখন উত্তরমুখো, ইয়র্কশায়ারের দিকে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এম ওয়ান মোটরওয়েতে ওঠা পর্যন্ত জাগুয়ারের পিছনে লেগে থাকল জিম। তারপর খুশি মনে ফিরে চলল শহরের দিকে। ইয়র্কশায়ার পৌঁছতে পুরো ছয় ঘণ্টা লাগবে ডিমলার জাগুয়ারের।

তাহলে? ভাবছে জিম প্রেসটন, ডায়মণ্ডগুলো স্থান বদল করেনি।

ফন্টেনয় হাউসেই আছে। না থাকার কোন কারণ নেই। ব্যাঙ্কে রেখে যাননি ওগুলো লেডি ফেডোরা। গত এক সপ্তাহ তার চ্যালা বিল সাইমন কড়া নজর রেখেছে ফিলবি দম্পতির ওপর। এর মধ্যে কোন ব্যাঙ্কেই যাননি ওঁরা। সঙ্গে করেও নিয়ে যাননি। এক মিলিয়ন পাউণ্ডে ইনশিওর করা আছে ডায়মণ্ডগুলো, লণ্ডন থেকে অতদূরে নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ওগুলো নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না ইনশিওরেন্স কোম্পানি।

অতএব? নিশ্চিন্ত মনে চড়াও হবে সে আজ ফন্টেনয় হাউসে। কাজ সারতে এক ঘণ্টা, বড়জোর দেড় ঘণ্টা লাগবে তার। বাজারে চালু যে-কোন তালা বা সেফ খোলা বিশেষ কোন ব্যাপার নয় জিম প্রেসটনের কাছে। মাত্র কয়েক মিনিটের খেল্। আসল হলো কৌশল, ওটা জানা চাই প্রথমে। তারপর তার প্রয়োগ। এ সব শিখেছে প্রেসটন চাচার কাছে। দু বছর হলো মারা গেছে চাচা। তার আগে দূর সম্পর্কের ভাতিজাকে নিজের জানা সমস্ত কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেছে লোকটা।

প্রেসটনের মত সে-ও ছিল নামকরা ক্র্যাকস্‌ম্যান। দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভাতিজাকে মনের মত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল সে মৃত্যুর আগে। এ লাইনে কাজ করে প্রচুর কামিয়েছে প্রেসটন। টাকার কোন অভাব নেই তার। তবে অন্যের হয়ে এ কাজ করে না সে কখনও, করে কেবল নিজের জন্যে। আত্মতুষ্টির জন্যে। বয়স ত্রিশ পার হতে চলল, এখনও বিয়ে থা' করেনি জিম প্রেসটন। দক্ষিণ লণ্ডনের ওয়াণ্ডওঅর্থে চার রুমের বিশাল এক ফ্ল্যাট ভাড়া করে রাজার হালে থাকে। একজনের তুলনায় ফ্ল্যাটটা অতিরিক্ত বড়, ভাড়াও তেমনি। কিন্তু তাতে পরোয়া নেই প্রেসটনের। দু-হাতে খরচ করে।

তবে বাইরে প্রেসটন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। চোখে পড়ার মত দামী কাপড় চোপড় পরে না। চলাফেরা করে ঝক্কর মার্কা একটা ফিয়াটে। ওটা

ছিল চাচার। মারা যাওয়ার সময় দিয়ে গেছে ওকে। সামর্থ্য থাকলেও নতুন গাড়ি কেনেনি, পরিচিতদের চোখ টাটাতে পারে, তাই।

আরাম আয়েশের সব রকম আধুনিক উপকরণ আছে তার ফ্ল্যাটে। একটা বড় বদ-অভ্যেস প্রেসটনের, কিছু একটা চোখে পড়লে বা মনে ধরলেই হলো। সেটা তার চাই-ই চাই। তার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত সে। গত কয়েক মাস আগে থেকে লেডি ফেডোরার গ্রেন ডায়মণ্ডগুলোর ওপর চোখ পড়েছে তার। সেই থেকে লেগেছে ওর পিছনে।

লণ্ডন আণ্ডারওয়ার্ল্ডে প্রচুর প্রভাব প্রেসটনের। যদিও সেখানকার কেউ নিশ্চিত জানে না কি কাজ করে সে। পুলিসের কাছে 'ফেস' বা 'প্রোফাইল' হিসেবে পরিচিত সে। তবে ওদের 'ফর্ম বুকে' কোন অভিযোগ নেই প্রেসটনের বিরুদ্ধে। লোক দেখানো একটা ব্যবসা আছে তার। কার রেকিঙের ব্যবসা। সেই সুবাদে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সজ্জিত এক মেশিন ওয়ার্কশপের মালিক সে। এর জন্যে আছে দুই কর্মচারী। যারা আসলে দক্ষিণ লণ্ডনের দাগী মাস্তান। ঝুট্ ঝামেলায় পড়তে হয় প্রেসটনকে প্রায়ই, তখন ওদের প্রয়োজন পড়ে।

রেন্টাল কোম্পানিতে প্রথমে গাড়িটা ফেরত দিল জিম প্রেসটন। তারপর শোফারের ইউনিফর্ম। ওর নিচে একটা গরম পোলো গেঞ্জি এবং ট্রাউজার পরাই ছিল তার। টুকটাক কিছু কেনাকাটা সেরে ট্যাক্সি চেপে রওনা হলো সে দক্ষিণ লণ্ডনের দিকে। মাইল তিনেক এগিয়ে হঠাৎ ফুটপাথে অতিপরিচিত একজনকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল প্রেসটন বসা অবস্থায়। 'ড্রাইভার! পুল ওভার! পুল ওভার!!'

ডানদিকের ফুটপাথ ধরে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলেছে মানুষটি। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ পিছনেই ব্রেক কষার কড়া আওয়াজে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সে।

*

যেমন অস্বাভাবিক রোগা, তেমনি ছোটখাট লোকটা। ছোট্ট গোল মুখ, টিকালো নাক। ভাসা ভাসা চোখ। দৃষ্টিতে অদ্ভুত সারল্য। গিলটি মিয়া। পরনে চকলেট রঙের ট্র্যাক স্যুট। ভুরু কুঁচকে যথাসম্ভব দ্রুত পা চালাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হয় কারও ওপর চটে আছে মনে মনে।

আসলেই তাই। ভীষণ চটে আছে গিলটি মিয়া। বেহায়া, বেলেহাজ, বেতমিজ ইংরেজদের ওপর। আরে বাবা, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পেরোলেই যে বচর ঘোরে, এ তো জানা কতা। তাই লিয়ে এত হাঙ্গামা-হুজ্জতের কী আচে? ভাবছে সে। রাস্তাঘাটে ছোঁড়াছুঁড়ি থেকে শুরু করে বুড়োবুড়িরা পর্যন্ত দলে দলে জটলা করছে। পরিচিত হলে তো কথাই নেই, অপরিচিতরা পর্যন্ত এ-ওর কোমর ধরে এক পাক্ নেচে নিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে চলছে পাইকারি চুমু।

লাজ-লজ্জার বালাই নেই ব্যাটাদের। কেন, আনন্দ প্রকাশ করার কি এছাড়া আর কোন উপায় নেই? তার ওপর একেকজনের পোশাকের কি ছিরি! গায়ে ওগুলো না থাকলেই বরং ভাল লাগত। তাও তো অনেক মানুষই শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেছে লম্বা ছুটিতে। তারা সবাই থাকলে না জানি কি অবস্থা হত লণ্ডনের। ময়-মুরুব্বি দেখাদেখি নেই, ছোটবড় বাছ-বিচার নেই...হ্যাঁ, আপনমনে মাথা দোলাল গিলটি মিয়া।

যাকে বলে সত্যিকার উৎসব, ক্যালকাটায় দেখেছে সে। দুগ্গা পুজো কি হোলি, অথবা ঈদ, বক্‌রি'দ, বড়দিন, উফ্! সে যে কী আনন্দের ব্যাপার ছিল! ওসবের পায়ের কাচেও লাগে না ইংরেজদের এ উৎসব। আচমকা ব্রেক কষল গিলটি মিয়া। ওর পথ আগলে দাড়িয়েছে চার-পাঁচটা উদ্ভট পোশাক পরা যুবক-যুবতী। চুলের দৈর্ঘ্য প্রায় সবারই সমান। কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে, মাঝ বরাবর ভালমত না তাকালে ঠাহর করা মুশকিল।

খুব সম্ভব গিলটি মিয়ার আকার এবং গায়ের রঙ আকৃষ্ট করেছে ওদের। মজা করার জন্যে তার বাঁ কাঁধে হাত রাখল একটি মেয়ে। পুরু মেক আপ্ নিয়েছে মেয়েটি। তার ওপর বাঁ গালে একজোড়া নগ্ন, আলিঙ্গনাবদ্ধ নারী-পুরুষের উল্কি। ডান হাতে ধরা একটা বিয়ারের খোলা ক্যান গিলটি মিয়ার মুখের সামনে নিয়ে এল মেয়েটি।

'কামন, ডার্লিং! হ্যাভ আ সিপ্!'

চট্ করে মুখটা দু'ইঞ্চি পিছিয়ে নিল গিলটি মিয়া। 'ধন্যবাদ। অপাত্রে না ঢেলে ওগুলো তোমার মাতায় ঢালো, মা জননী। মাতা ঠাণ্ডা করো। আর বুকটাও ঢাকো দয়া করে। যে ভাবে উদোম করে রেকেচো, আমার মরা বাপেরও জীবন-যৌবন ফিরে আসবে দেকে।'

বুঝল না কেউই কিছু, তবুও হেসে উঠল সবাই। কাঁধের হাতটা আলতো করে সরিয়ে দিল গিলটি মিয়া। নাক কুঁচকে উঠতে চাইছে আপনাআপনি, কষ্ট করে সামলে রেখেছে। 'ছেড়ে দে, মা,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'মুকের দুর্গন্ধে ডেঁড়িয়ে থাকাই দায়।'

এক পা এক পা করে জটলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া। তারপর হন্ হন্ করে হাঁটা ধরল। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিল ও রোজকার মত। ফরসা হওয়ার পর থেকে ইংরেজদের তামাশা দেখতে দেখতে অজান্তেই অনেকটা দূরে চলে এসেছে কখন যেন। অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। তাই ভেতরে ভেতরে খানিকটা ব্যস্ত। চেষ্টা করছে কারও সাহায্য ছাড়াই পথ খুঁজে বের করতে।

আটাশ তারিখ লণ্ডন এসেছে গিলটি মিয়া। ওর জন্যে নতুন নিয়ম করা হয়েছে, রানা এজেন্সির প্রতিটি শাখায় ছ' মাস করে কাজ করতে হবে ওকে। এতে দেশ দেখা যেমন হবে, তেমনি সে সব দেশের মানুষ, ভাষা, আদব-কায়দা ইত্যাদি সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে। ব্রাঞ্চ-

এজেন্টরাও অনেক কিছু শিখবে ওর কাছে। এসব ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

এখানকার অফিশিয়াল কাজ এখনও শুরু হয়নি গিলটি মিয়ার। বড়দিন এবং নববর্ষ উপলক্ষে লম্বা ছুটি চলছে। এজেন্সির এ-দেশি এজেন্টরা প্রায় সবাই অনুপস্থিত। সিকিউরিটি গার্ড আর দু'-চারজন বাঙালি অফিসার ছাড়া কেউ নেই। তাদেরও ফাইল ওঅর্ক ছাড়া করার কিছু নেই তেমন। সবকিছুতে গা ছাড়া গা ছাড়া ভাব। তাই গিলটি মিয়াও মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে গা ছেড়ে।

ক'দিন পর আসছে মাসুদ রানা। প্রধানমন্ত্রীর দফতরে এজেন্সির কী এক জরুরি ফাইল অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, ওটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে খুব শিগগির। সে সময় ওর লণ্ডন উপস্থিতি প্রয়োজন।

আবার ব্রেক কষল গিলটি মিয়া। দু'পাশের বাড়িঘরের দিকে তাকাল। নাহ্! মহাবিরক্তিতে চোখমুখ কোঁচকাল ও। আবারও ভুল পথে এসেছে। এদিক-ওদিক তাকাল। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিস কনস্টেবলের ওপর চোখ পড়ল। হল্লারত একদল যুবতীর দিকে চেয়ে আছে হাঁ করে। তার কাছ থেকে পথের হদিস জেনে নিলে কেমন হয়?

থাক, ভাবল গিলটি মিয়া। আরাকবার চেষ্টা করে দেকি। তারপর নাহায় জিজ্ঞেস করা যাবে। আবার পা চালাল ও। জটলা দেখলেই চোখ কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ভাবখানা, করগে তোদের যা.মন তাই। মিনিট পাঁচেক চলার পর বুঝল গিলটি মিয়া, এবারও ভুল পথেই এসেছে সে। গতি মন্থর হয়ে এল। থেমে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় ঠিক পিছনেই ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে চমকে উঠল।

লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। পরক্ষণেই একটা ট্যাক্সি থেকে উড়ে বেরিয়ে এল তালগাছের মত লম্বা কে একজন, জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। হতভম্ব হয়ে পড়ল ও। হড়বড় করে কী যেন বলছে

তালগাছ। কানে আসছে ঠিকই, কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। কোন্ ভাষা ওটা?

'…চিনতে পারছেন না, ওস্তাদ! আমি প্রেসটন, জিম প্রেসটন!' কানের কাছে পরিষ্কার বাংলায় লাউড স্পীকারের মত চেঁচাচ্ছে লোকটা। 'ওস্তাদ, আমি বউবাজারের সেই প্রেসটন।'

এবার স্বর ফুটল গিলটি মিয়ার। ট্যাক্সি ড্রাইভার হাঁ করে দেখছে ওদের। পথচারীরাও ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। 'আরে আরে, ছাড়ুন! কি করচেন, ছাড়ুন!'

আল্‌তো করে গিলটি মিয়াকে নামিয়ে দিল প্রেসটন। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে চেয়ে আছে। আনন্দ যেন উপ্‌চে পড়ছে তার দু'চোখ দিয়ে। আবার বলল সে, 'ওস্তাদ, আমি প্রেসটন।'

এবার বুঝল গিলটি মিয়া। মুখ তুলে তাকে দেখছে তো দেখছেই। 'আ-আপনি…মানে, তুমি…পেস্‌টন! ক্যালকাটার পেস্‌টন?'

'হ্যাঁ, ওস্তাদ,' হাসি দু'কান স্পর্শ করল তার। অভিভূতের মত কতক্ষণ ওস্তাদের দিকে চেয়ে থাকল সে। 'আজ আমার এমন সুদিনে আপনার দেখা পেলাম, কি যে আনন্দ হচ্ছে, ওস্তাদ! আমার ভাগ্যটা সত্যিই ভাল।'

গিলটি মিয়া কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। বিস্ময়ের ঘোর এখনও তার কাটেনি। সেই এতটুকুন পেস্‌টন, যাকে ক্যালকাটায় নিজহাতে মহাবিদ্যা শিখিয়েছে সে, আজ এত বছর পর কি না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসে লণ্ডনে তার সঙ্গে দেকা? ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে ঠিক ভরসা হচ্ছে না।

'আসুন আমার সাথে,' তার বাহু ধরে আকর্ষণ করল জিম প্রেসটন।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, কোতায়…'

'যেখানে আমি নিয়ে যাব।'

'কিন্তু…' শিস্যের কথার তোড়ে বাকি কথা বলার ফুরসত পেল না

গিলটি মিয়া।

'কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। আগে গরীবখানায় চলুন, তারপর শুনব আপনার কথা।'

প্রায় টেনে হিঁচড়ে ট্যাক্সিতে তুলল তাকে জিম প্রেসটন। রওনা হয়ে গেল ট্যাক্সি ওয়াটারলূ ব্রিজের দিকে। সারাপথ একাই বক্ বক্ করল প্রেসটন, গিলটি মিয়াকে মুখ খোলার বিশেষ একটা সুযোগ দিল না। তার ফ্ল্যাটে পা রেখে থমকে গেল গিলটি মিয়া। অবাক বিস্ময়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ঘরগুলো। 'এই তোর গরীবখানা?'

হাসল প্রেসটন। 'এইবার বোঝা গেল সত্যিই চিনেছেন আপনি আমাকে।'

'মানে?'

'তখন থেকে তো কেবল একবার আপনি একবার তুমি করে আসছেন।'

'এই কতা? তা তুই কি আর আগের মতন ছোটটি আচিস? অতবড় জোয়ান মরদকে কি চাইলেই তুই তুকারি করা যায়?'

'শুরু যখন একবার করেই ফেলেছেন, চালিয়ে যান। আপনার মুখে ওসব সম্বোধন মোটেই ভাল লাগে না, ওস্তাদ। কেমন পর পর মনে হয় নিজেকে।'

শিষ্যটি তার আগের মতই বিনয়ী আছে বুঝতে পেরে আটাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি আরও দু'ইঞ্চি প্রসারিত হলো গিলটি মিয়ার।

'বাদ দিন ওসব, কি খাবেন বলুন। খিদে পেয়েছে নিশ্চই?'

এইবার খেয়াল হলো গিলটি মিয়ার, ন'টা বাজতে চলেছে, এখনও পেটে কিছু দেয়ার সুযোগ হয়নি। 'পেয়েচে মানে? সেই ভোর সক্কাল থেকে রাস্তা হারিয়ে কানা মুরগির মতন ইদিক-উদিক ঘুরে মরচি। পেটে ধাড়ি ছুঁচোর কেত্তন চলচে।'

'পথ হারিয়েছিলেন!' বিস্মিত হলো জিম। 'সে কি!'

'তবে আর বলচি কি?' পেটে হাত বোলাল গিলটি মিয়া।

'আচ্ছা এখন থাক। পরে শুনব। আগে খাবারের ব্যবস্থা করি,' কিচেনের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল সে। খাবার ব্যাপারে গুরুর কড়া বাছ-বিচারের কথা মনে পড়ে গেছে। 'ওস্তাদ, আপনার জন্যে...?'

'সেদ্ধ ডিম আর কলা। আচে না?'

'অবশ্যই। সঙ্গে কফি, না চা?'

'নির্ভেজাল সাদা পানি।'

নাশতা সেরে সীটিংরূমে এসে বসল ওরা। 'তুই তাহালে একনও টায়াড?' প্রশ্ন করল গিলটি মিয়া।

বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকল জিম প্রেসটন।

'বুজলিনে? থ্রী সেবেনটি নাইনের কতা বলচি, একনও চলচে ওসব? আমি বাপু রিটায়াড, ছেড়ে দিয়েচি।'

হেসে উঠল প্রেসটন। অকপটে নিজের বর্তমান পেশা সম্পর্কে জানাল গিলটি মিয়াকে। 'এখন বেশ ভাল আছি, ওস্তাদ। একটা দান মারতে পারলেই বেশ কিছু দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। অনেক ভাল আছি আগের চেয়ে।'

'সে তো বুজতেই পারচি,' ঘরের চারদিকে নজর বোলাল সে। 'সুদিন সম্পর্কে তকন কি যেন শুনলুম? কিসের সুদিন?'

'আজ রাতে খুব বড় একটা দাঁও মারতে যাচ্ছি, ওস্তাদ। খুব বড় দাঁও!'

'যা। সাবধান থাকিস। পেচনে একটা চোক রাকবি সব সোমায়,' ডান হাত তুলল গিলটি মিয়া শিস্যকে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে।

'এমন দিনে আপনার দেখা পেলাম, বুকের বল অনেক বেড়ে গিয়েছে, ওস্তাদ।'

আরও আধ ঘণ্টা গল্প-গুজব করে আসন ছাড়ল ওস্তাদ। 'এবার যেতে হয়। দেরি হয়ে গেচে।'

'সে কি!' আকাশ থেকে পড়ল জিম। 'কোথায় যাবেন?'

হেসে ফেলল গিলটি মিয়া। 'যেকেনে যেতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলুম, সেকেনে।'

বেকুবের মত চেহারা হলো প্রেসটনের। 'তাই তো! কিন্তু, ওস্তাদ, আপনি এখানে কেন, কি কাজে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন, কিছুই তো জানা হলো না।'

'বলব, বলব। কিন্তু আজ নয়, সোমায় নেই। আরাকদিন।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল জিম প্রেসটন। 'আরেকদিন নয়, ওস্তাদ। কালই আসুন, একটা জিনিস দেখাব আপনাকে। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, অমন জিনিস আগে কখনও দেখেননি আপনি।'

'জিনিসটা কি?'

'উঁহুঁ, বলব না। দেখাব।'

একটু ভেবে রাজি হয়ে গেল গিলটি মিয়া। 'ঠিক আচে। আসবো।'

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কুনো দরকার নেই। একাই যেতে পারব আমি ট্যাক্সি লিয়ে।'

দুই

ঘরে ফিরে নিজের জন্যে এক কাপ এসপ্রেসো তৈরি করল প্রেসটন। মনটা খুশি খুশি লাগছে। জন্মের পর বহু বছর কোলকাতায় কেটেছে তার। সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক কারণেই হোক বা আর যেভাবেই হোক, ছেলেবেলা থেকেই মনের ভেতর বেশ কিছু সংস্কার স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে তার ভারতীয়দের মত। জিম প্রেসটনের স্থির বিশ্বাস, এমন দিনে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে শিক্ষাগুরুর দর্শন পাওয়া গেছে, তখন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, গ্লেন ডায়মণ্ড চুরির স্বপ্ন আজ সত্যি সত্যিই বাস্তবায়িত হবে তার।

এসপ্রেসো পান করতে করতে একটা স্কেচের ওপর চোখ বোলাতে বসল জিম। তার শিক্ষানবিস বিল সাইমনের আঁকা। বিল বয়সে কিশোর। কাজ যত কঠিনই হোক, জটিল হোক, পিছ পা হতে জানে না। লেগে থাকে আঠার মত। শেখার আগ্রহের কমতি নেই। জিমের ধারণা, ভবিষ্যতে বিলও তারকা হতে পারবে এ লাইনে।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে সাইমনকে ফন্টেনয় অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে পাঠিয়েছিল জিম প্রেসটন। অত্যন্ত দামী বিশাল এক ফুলের তোড়া নিয়ে। ব্লকের আটতলায় থাকেন ফিলবি-ফেডোরা দম্পতি। ডোরবেলের শব্দ শুনে স্বয়ং লেডি ফেডোরা দরজা খুললেন। সামনে নিষ্পাপ চেহারার বিল

সাইমনের হাতে তোড়াটা দেখে বিস্ময়ে, খুশিতে হেসে উঠলেন মহিলা। 'ওহ্, হাউ লাভলি!'

তোড়ার ভেতর রাখা প্রেরকের নেমকার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লেন তিনিঃ কমিটি অভ দ্য ডিসট্রেস্‌ড ভেটেরানস্ বেনেভোলেন্ট ফাণ্ড। এরকম অজস্র সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক লেডি ফেডোরা। প্রায় নিত্যই এ ধরনের সৌজন্য উপহার এক আধটা গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। কালও নিলেন। তোড়াটা সামলে ধরার কসরৎ করছেন ফেডোরা, এই সময় বেয়ারার ছেলেটা প্রাপ্তি রসিদ এবং একটা বল পেন এগিয়ে দিল।

একসঙ্গে এত কিছু করা অসম্ভব, তাই সাইমনের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসলেন হার লেডিশিপ। 'এক মিনিট, প্লীজ!' তোড়া নিয়ে সীটিংরূমের দিকে ছুটলেন তিনি। খুদে হলওয়েতে কয়েক মুহূর্ত একা থাকার সুযোগ পেয়ে গেল বিল সাইমন। দ্রুত দরজার ফ্রেমের ওপর শকুন চোখ বোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে এই ফাঁকে। ফ্রেমের ভেতরদিক এবং আশপাশের দেয়ালে কোন বাযার বা সুইচ আছে কি না নিশ্চিত হতে চায়।

কাজটা পুরো হওয়ার আগেই ফিরে এলেন লেডি ফেডোরা। সাইমনের হাত থেকে স্লিপ এবং কলম নিয়ে সই করতে গেলেন। কিন্তু আঁচড় পড়ছে না কলমের। কালি নেই। নেই করেই ওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে বিল। লেডিকে বিব্রত হতে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল সে, বারবার করে ক্ষমা চাইতে লাগল। ফেডোরার হাসিটা প্রশস্ত হলো তার অবস্থা দেখে। 'দ্যাটস অল রাইট, মাই বয়। আমার হাতব্যাগে একটা পেন আছে মনে হয়। দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কি না,' ঘুরে দ্রুত পা চালাতে চালাতে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো।'

ব্যগ্র দৃষ্টিতে আবার কাজে লেগে পড়ল বিল সাইমন। এবং মুখ তুলতেই নজর পড়ল জিনিসটার ওপর। দরজার পাল্লার সঙ্গে, হিঞ্জের

সামান্য ওপরে, চিরুনির মোটা দাঁতের মত, আধা ইঞ্চি কি তারও ছোট একটা প্লানজার কন্ট্যাক্ট ফিট করা আছে। ওদিকে ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে খুদে একটা সকেট। দরজা বন্ধ হলে সকেটে প্রবেশ করবে প্লানজার, অ্যাকটিভেট হবে ওটা অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করলেই। সকেটের ভেতর, জানা আছে নিষ্পাপ বিলের, আছে একটা মাইক্রোসুইচ।

প্লানজার যতক্ষণ ওই সুইচের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, ততক্ষণ সব ঠিক আছে। কিন্তু যেই ও দুটো বিচ্ছিন্ন হবে পরস্পর থেকে, অর্থাৎ দরজা খোলা হবে, বেজে উঠবে অ্যালার্ম। অবশ্য ওটা চালু না থাকলে অন্য কথা। বেজে ওঠার আগে ত্রিশ সেকেণ্ড মৃদু 'পিপ্...পিপ্' শব্দে জানান দেবে সে। এর মধ্যে মাস্টার সুইচ অফ করতে হবে ঘরের মালিককে।

বাকি কাজটুকু সারতে মাত্র তিন সেকেণ্ড সময় লাগল বিল সাইমনের। পকেট থেকে সুপারগ্লুর একটা টিউব আর খুদে একটা প্লাস্টিসিন বল বের করল সে। বলটা সকেটে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা গ্লু ঢেলে দিল তার ওপর। একটু পর বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে জায়গাটা চাপ দিয়ে পরখ করে দেখল সে। লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। প্লানজার ঢুকতে পারবে না এখন আর ভেতরে। মাইক্রোসুইচের সঙ্গে সংযোগ ঘটার উপায় রইল না ওটার।

অকেজো হয়ে গেল অ্যালার্ম সিস্টেম। যতক্ষণ না প্লানজার আবার সকেটে ঢোকার পথ পাবে, ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিট টেরই পাবে না কখন দরজা বন্ধ হলো কি খুলল। সই করা রসিদ নিয়ে ফিরে এলেন লেডি ফেডোরা। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সাইমন। সিধে হলো সে। কাগজটা নিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এল।

স্কেচে পরিষ্কার করে ওই অ্যাপার্টমেন্টের এন্ট্রান্স, পোর্টার'স লজ ইত্যাদির এবং সিঁড়ি ও এলিভেটরের লোকেশন এঁকেছে বিল সাইমন।

খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেয়নি। চোখে যা যা দেখেছে তার সবই স্থান পেয়েছে স্কেচে। কফিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবল প্রেসটন, যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই অ্যালার্ম সিস্টেম অন্ করে রেখে গেছেন ফিলবি।

হাসি পেল। বিলের কাছে শুনেছে, দরজায় দুটো তালা দেখেছে সে। দুটো কেন, চারটে হলেও কিছু আসে যায় না। সময় খানিকটা বেশি নষ্ট হবে, এই যা। তাতে অসুবিধে নেই। কেউ দেখে ফেলবে, তেমন কোন চান্সও নেই। কারণ সিঁড়ি বা এলিভেটর, দু'টোই অ্যাপার্টমেন্টের ফ্রন্ট ডোর থেকে দূরে এবং চোখের আড়ালে।

তবে এ ধরনের পয়সাওয়ালাদের বাসস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে প্রেসটন। সে নিশ্চিত, কেবল অ্যালার্ম বা তালাই নয়, আরও দু'চারটা ফাঁদ অবশ্যই আছে ভেতরে। সে সবের মোকাবেলার জন্যেও প্রস্তুত সে। কফি শেষ করে একটা নিউজ পেপার কাটিঙের ফাইল বের করল জিম। অন্য সব তারকা রত্নচোরের মত সে-ও সচিত্র সোসাইটি গসিপ্ কলামের নিয়মিত পাঠক-সংগ্রাহক।

এই ফাইলটি সম্পূর্ণ লেডি ফেডোরা এবং তাঁর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সম্পর্কিত। এ সব অনুষ্ঠান মর্যাদার লড়াইয়ের স্থান। প্রতিটি লড়াইতেই জিত হয়েছে ফেডোরার, যার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে তাঁর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া গ্লেন ডায়মণ্ডের অলঙ্কার সেটের।

সবার ওপরের ছবিটির দিকে চেয়ে থাকল প্রেসটন। সর্বশেষ পেপার কাটিং এটা। প্রিন্স চার্লস পত্নী লেডি ডায়ানার সঙ্গে বাকিংহাম প্যালেসের এক পার্টিতে হাস্যোজ্জ্বল লেডি ফেডোরাকে দেখা যাচ্ছে। এদিনও ডায়মণ্ডের সেটটি পরেছিলেন ফেডোরা। জিম প্রেসটনের মুখস্থ এই ডায়মণ্ডগুলোর ইতিহাস।

১৯০৫ সালে মার্গটের তরুণ আর্ল দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করে ফেরার

পথে চারটে আনকাট পাথর নিয়ে আসেন দেশে। ১৯১২ সালে বিয়ে করেন আর্ল। তার কিছুদিন আগে কার্টার অভ লণ্ডনকে পাথরগুলো কেটে আকার দেয়ার দায়িত্ব দেন তিনি। নববধূর জন্যে ওগুলো দিয়ে অলঙ্কার তৈরি হবে। সে সময়ে আমস্টার্ডামের আশারস্ ছিল সেরা ডায়মণ্ড কাটার। কাটিঙের কাজটা তাদের ওপর অর্পণ করে কার্টার।

টানা দু'মাস পরিশ্রম করে পাথরগুলোকে দু'জোড়া চমৎকার আটান্ন ফ্যাসেটের নাশপাতির আকার দেয় আশারস্। একজোড়ার প্রতিটির ওজন দাঁড়ায় দশ ক্যারেট, অন্য জোড়ার বিশ ক্যারেট। এরপর পাথরগুলো লণ্ডন নিয়ে আসে কার্টার বাকি কাজ সারার জন্যে। তারা সাদা সোনা ও অনেকগুলো ছোট ছোট ডায়মণ্ডের সমন্বয়ে ছোট দুটো দিয়ে চোখ ঝলসানো ইয়ার রিঙ এবং অন্য দুটো দিয়ে কম্পোজড্ টায়রা তৈরি করে।

অলঙ্কার গড়ার কাজ শেষ হওয়ার আগেই আর্লের বাবা, শেফিল্ডের সপ্তম ডিউক মারা যান। আর্ল হন পরবর্তী ডিউক। তাঁদের বংশের উপাধি ছিল গ্লেন, সেই সূত্রে ডায়মণ্ডগুলোও লোকের মুখে মুখে গ্লেন নামে ফিরতে থাকে। কালে ওটাই হয়ে যায় ওগুলোর পরিচয়। ১৯৩৬ সালে মারা যান অষ্টম ডিউক। এক ছেলে ছিল তাঁর।

এঁর দুই ছেলে মেয়ে। ছেলের জন্ম ১৯৪৪ এবং মেয়ের ১৯৪৯ সালে। লেডি ফেডোরাই সেই মেয়ে। শেফিল্ডের নবম ডিউকের কন্যা, দশম ডিউকের ছোট বোন। মেয়েকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসতেন নবম ডিউক, তাই মৃত্যুর আগে ডায়মণ্ডগুলো তাঁকেই দিয়ে যান তিনি। এতে তাঁর ভাইয়ের কোন আপত্তি ছিল না।

ছবির ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে লাগল জিম প্রেসটন। 'ওগুলো পরার সৌভাগ্য আর কোনদিনও হবে না তোমার, ডিয়ার লেডি,' বিড়বিড় করে বলল সে।

*

রাত ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত ফন্টেনয় হাউসের উল্টোদিকের কার পার্কে বসে থাকল প্রেসটন আরেকটা ভাড়া করা গাড়িতে। এ মুহূর্তে চমৎকার ছাঁটের দামী কাপড়ের ডিনার স্যুট পরে আছে সে। পাশের সীটে রাখা বড়সড় রিবন বো বাঁধা এক বোতল বিখ্যাত কোম্পানির শ্যাম্পেন। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রেসটন বাড়িটির দিকে। সবগুলো ফ্লোরে আলো জ্বলছে, জ্বলছে না কেবল আটতলায়।

প্রতি তলাতেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। দশটার পর থেকে একে একে পৌঁছতে শুরু করল অভ্যাগতরা। ক্রমেই বাড়ছে ভিড়। দশটা পাঁচে গাড়ি ত্যাগ করল জিম প্রেসটন। বাঁ হাতের চিত করা তালুতে শ্যাম্পেনের বোতলটা ধরে দৃঢ় পায়ে রাস্তা পার হলো। সোজা এসে দাঁড়াল ফন্টেনয় হাউসের লবিতে। হাতের ডানে পোর্টার'স লজ, ঠিক যেমনটি এঁকেছে সাইমন স্কেচে। কোমর সমান উঁচু কাঁচের জানালার ওপাশে নাইট পোর্টারকে দেখা গেল, এক চোখ সামনের টিভির পর্দায়, অন্যটা প্রবেশ পথের ওপর।

জিম প্রেসটনকে দেখে উঠে এল লোকটা। মনে হলো কিছু বলবে। কিন্তু লোকটাকে সুযোগ দিল না সে। 'ইভনিং,' হাসি ফুটল জিমের চোখে মুখে। একই সঙ্গে পা বাড়াল এলিভেটরের উদ্দেশে। 'ওহ, অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার।'

প্রশ্ন করার কথা ভুলে গেল পোর্টার। বিনয়ে গলে গেল। 'থ্যাংক ইউ, স্যার। হ্যাপি নিউ ইয়ার!' সত্যিই প্রেসটনকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সে কোন ফ্লোর তার গন্তব্য। কিন্তু সামলে নিল। অমন দামী পোশাক-আশাক পরা একজন ভদ্রলোককে সরাসরি প্রশ্নটা করতে বাধল। অন্য দিন হলে প্রশ্নটা অবশ্যই করত সে। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আট-নয়টা

ফ্লোরে নিউ ইয়ার'স পার্টি আছে, ভদ্রলোক যে-কোন ফ্লোরের গেস্ট হতে পারেন। ফিরে গিয়ে টিভি দেখায় মন দিল সে।

লিফটে ওঠার আগে পিছনে চাইল একবার জিম প্রেসটন। ওর সঙ্গী হওয়ার জন্যে নেই কেউ। তাই চাইছিল সে। মৃদু শিস বাজাতে বাজাতে সেভেনথ্ ফ্লোরে উঠে এল জিম। পা চালিয়ে ফিলবি-ডেবোরার ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে দরজার ফ্রেম এবং সংলগ্ন দেয়ালে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল। এক সময় মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট মনে। ঠিকই দেখেছে বিল, কোন বাধার নেই। দুহাতে দস্তানা পরে নিল সে।

এবার দরজার তালায় মন দিল জিম প্রেসটন। বিশ ইঞ্চি ব্যবধানে দুটো তালা, একটা সাব মরটিজ, অন্যটা সেলফ ক্লোজিং ইয়েল লক। ভাল কী-ম্যানের জন্যে পরেরটা খুব একটা কঠিন সমস্যা নয়। তবে সাবটা ভোগাবে বেশ! হুইস্কির বোতল নামিয়ে রাখল জিম প্রেসটন, তারপর পকেট থেকে নিজের তৈরি বারোটা স্কেলিটন চাবির একটা গোছা বের করল।

প্রথমে সাব নিয়েই পড়ল। একটা একটা করে ভেতরে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। ষষ্ঠ চাবিটা পছন্দ হলো জিমের, খুব সহজেই ভেতরে প্রবেশ করেছে ওটা। এবার খুব আস্তে আস্তে ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল চাবিটা। ভেতরের কোথায় কোথায় প্রেশার পয়েন্ট আছে অনুমান করার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ পর থামল সে, মনে হলো পয়েন্টগুলো ট্রেস করতে সক্ষম হয়েছে। এবার হাঁটু গেড়ে বসে সরু একটা ফাইল দিয়ে নরম ধাতুর স্কেলিটনের ওপর কাজ শুরু করল প্রেসটন।

এগারোটা পাঁচে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে অন্ধকার। কিন্তু করিডরের আলোয় মোটামুটি দেখা যায় হলওয়ের আউটলাইন। চলে এল সে ভেতরে। বন্ধ করে দিল দরজা। কিন্তু তখুনি নড়ল না দরজা ছেড়ে। হলরুমটা আট ফুট বাই আট ফুট। পুরোটাই পুরু কার্পেট মোড়া। সন্দেহ

করল প্রেসটন, নিশ্চয়ই এর নিচে কোথাও প্রেশার প্যাড আছে। থাকতেই হবে।

তবে দরজার খুব একটা কাছে থাকার সম্ভাবনা কম। তাতে ঘরের লোকেরও প্যাড মাড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। নিঃশঙ্ক চিত্তে আলো জ্বালল জিম প্রেসটন। বাঁ দিকে আধখোলা একটা দরজা, ওপাশে ল্যাভেটরি। ডানে আরেকটা দরজা—ক্লোক রুম। অ্যালার্ম কন্ট্রোল সিস্টেমটা ওই রুমেই, নিশ্চিত জানে সে। কিন্তু ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

হিপ পকেট থেকে একজোড়া প্লায়ার্স বের করে কার্পেটের এক কোনা তুলল জিম, সরে খালি ফ্লোরের ওপর দাঁড়াল। এক মিনিটের মধ্যে প্যাডটা আবিষ্কার করে ফেলল সে। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে ওটা। একটাই। কার্পেট ছেড়ে দিল প্রেসটন, জায়গাটাকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে সীটিংরুমের দরজা খুলল এসে। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল আলোর সুইচের খোঁজে।

ঘরটা আয়তাকার। আঠারো বাই পঁচিশ হবে অনুমান। হাতের ডানেই রয়েছে সুইচ। প্রচুর ঝুঁকি আছে জেনেও হাত বাড়িয়ে খুব সাবধানে আলো জ্বালল সে। সামনের রুমে জানালা ছিল না, বাইরে থেকে ভেতরের আলো দেখার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এ ঘরে আছে। নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে আলো যাচ্ছে বাইরে। কিন্তু প্রেসটন নিরুপায়। বুবি ট্র্যাপে ভরা কোন রুমে পেন্সিল টর্চ জ্বেলে কাজ করতে রাজি নয় সে। তাছাড়া যখন জানাই আছে যে এ-ফ্ল্যাটের মালিক শহরে নেই, এ মুহূর্তে তার ফিরে আসারও কোন কারণ নেই, তখন দুশ্চিন্তারও কিছুই নেই।

অত্যন্ত দামী, রুচিশীল আসবাবে সাজানো ঘরটা। সামনের ঘরের চাইতেও পুরু এ ঘরের কার্পেট। সম্ভবত অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে ওটা ঘরের মাপে। এক ইঞ্চি ফ্লোরও দেখার উপায় নেই। প্রেসটনের ঠিক

সামনেই ভারি কার্টেন ঝুলছে। জানালা নিশ্চয়ই। ডানে ছোট পাথরের ফায়ার প্লেস। তার পাশে একটা বন্ধ দরজা। ওটা বোধহয় মাস্টার বেডরুম, অনুমান করল জিম প্রেসটন।

বাঁয়ে দুটো দরজার একটা বন্ধ, অন্যটা খোলা। ফাঁক দিয়ে বিশাল ডাইনিং টেবিলের এক প্রান্ত দেখা যায়। ঝাড়া দশ মিনিট একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জিম প্রেসটন। কেবল চোখ দুটো ঘুরছে অনবরত, চার দেয়াল আর সিলিঙ পরীক্ষা করছে। এর কারণ আছে। ভেতরে স্ট্যাটিক মুভমেন্ট অ্যালার্ম সেট করা থাকতে পারে। দেহের উত্তাপ বা নড়াচড়া সনাক্ত করতে পারলেই বেজে উঠবে তা বিকট শব্দে।

শক্ত হয়ে থাকা পেশীতে ঢিল দিল জিম প্রেসটন। নেই ওসব। থাকলে বেজে ওঠার কথা এতক্ষণে। তৈরিই ছিল সে। তেমন কিছু ঘটলে তিন সেকেণ্ডে পৌঁছে যেত করিডরে। তারপর ভাগলবা। কিন্তু তাই বলে বিপদ পুরোপুরি কাটেনি এখনও। প্রেশার প্যাড তো রয়েইছে, টাচ্ বেলও আছে হয়তো এ ঘরে। ছুঁয়ে ফেললেই শেষ। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে কিছু স্পর্শ করা যাবে না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জিম প্রেসটন।

সেফটা হয় এ-রুমে, নয়ত মাস্টার বেডরুমে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। এবং অবশ্যই বহির্দেয়ালের গায়ে বসানো। কারণ সেফ ধরে রাখার মত চওড়া নয় ভেতরের দেয়ালগুলো। এগারোটা বিশে সেফটা সনাক্ত করতে সক্ষম হলো জিম প্রেসটন। সীটিংরুমে, ওর নাক বরাবর সোজা, প্রশস্ত একজোড়া ডবল-গ্লেজড্ পিকচার উইণ্ডোর মাঝের ফাঁকা দেয়ালে ঝুলছে বড় একটা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়না। ওটার পিছনে।

যেমনটি থাকার কথা, দেয়ালের সঙ্গে ঠেকে নেই আয়নার পিঠ। বরং ইঞ্চি দেড়েক ফাঁক আছে দুটোর মাঝখানে। ফাঁকটা কেন রয়েছে বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না জিম প্রেসটনের। মুচকে হেসে প্লায়ার্স জোড়া বের করল

সে। ফ্লোর থেকে টেনে তুলে ফেলল কার্পেটের সবচেয়ে কাছের প্রান্ত, তারপর এক পা দু পা করে এগিয়ে চলল আয়নার দিকে ওটা সরিয়ে সরিয়ে।

আয়নাটার ঠিক নিচেই রয়েছে এ ঘরের একমাত্র প্রেশার প্যাডটি। এক মুহূর্ত ভাবল জিম। তারপর দরজার কাছে ফিরে গিয়ে ঘুরে ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখা একটা কফি টেবিল তুলে নিয়ে এল। দুই ফুট বাই দেড় ফুট প্রেশার প্যাডটার ওপর বসিয়ে দিল ওটা। টেবিলের চার পায়া প্যাডের বেশ দূরে দূরে সেট হয়েছে, চাপ পড়ার কোন চান্সই নেই।

এবার দেয়াল আর আয়নার সংযোগস্থানের দিকে নজর দিল প্রেসটন। আয়নার পিছনে ফিট করা আছে বড় একটি ম্যাগনেটাইজড্ স্টীলের খণ্ড। ওদিকে দেয়াল থেকে সামান্য বেরিয়ে রয়েছে একটি শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ক্যাচ্। ওই ক্যাচ্ই ধরে রেখেছে আয়নাটিকে। অ্যালার্ম ম্যাগনেট। আয়নাটা খুললেই বেজে উঠবে। অতএব স্টীলের খণ্ডটির সঙ্গে সংযোগ ছুটে গেছে, ব্যাপারটা টের পেতে দেয়া যাবে না চুম্বক বাবাজীকে।

এ জন্যেও তৈরি জিম প্রেসটন। বুক পকেট থেকে চার বাই চার ইঞ্চি এক খণ্ড ম্যাগনেটাইজড্ স্টীল পাত বের করে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে দেয়ালের চুম্বক আর আয়নার স্টীলের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর বাঁ হাতে পাতটা চুম্বকের সঙ্গে ঠেসে ধরে অন্য হাতে হ্যাঁচকা টানে আয়নাটা খসিয়ে আনল। আয়না সরে গেলেও কিছুই টের পেল না চুম্বক পাতটির কারণে।

হাসি ফুটল জিম প্রেসটনের মুখে। ওয়াল সেফটা চমৎকার একটা হামবার মডেল ডি। জানে সে, এর দরজা আধ ইঞ্চি পুরু হাই-টেনসিল, কঠিন ইস্পাতের তৈরি। হিঞ্জের জায়গায় আছে মোটা রড, সেফের সিলিঙ এবং ফ্লোরের মাঝে সেঁধিয়ে আছে তার দু'মাথা। এর তালাও তেমনি।

তিনটে হার্ডেনড্ স্টীলের লিভার, ডোর ফ্রেমের দেড় ইঞ্চি গভীরে ঢুকে থাকে বন্ধ অবস্থায়।

দরজার ভেতর দিকে রয়েছে টিনপ্লেট বক্স, লকিঙ লিভার কন্ট্রোলার। আর বাইরে, জিম প্রেসটনের দিকে চেয়ে রয়েছে চমৎকার দেখতে একটি তিন চাকার হুইল কম্বিনেশন লক। কিন্তু তালা খোলার ঝামেলায় আজ আর যাবে না সে। যা করবে সরাসরি। দরজার হিঞ্জ সাইডের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত উড়িয়ে দেবে বিস্ফোরকের সাহায্যে। তাতে যদিও দরজাটা পুরোপুরি খোলা সম্ভব হবে না, তবে যেটুকু ফাঁক সৃষ্টি হবে, ওতেই চলে যাবে কাজ।

শ্যাম্পেনের বোতলটা কফি টেবিলের ওপর রাখল জিম প্রেসটন। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুলে ফেলল ওটার তলা। ফলস্ বোতল। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়া জিনিসগুলোর ওপর নজর বোলাল সে। কটন উলে যত্নের সঙ্গে মুড়ে রাখা একটা ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটর, ছোট ছোট কয়েক খণ্ড চুম্বক, নিত্য ব্যবহার্য ফাইভ এএমপি তারের খুদে একটা রীল এবং ইংরেজি 'ভি'-এর মত দেখতে একখণ্ড ধাতব, সিএলসি। চার্জ লাইনার কাটিং।

জিনিসটা শক্ত, তবে ইচ্ছেমত টেনে লম্বা করা বা সোজা-বাঁকা করা যায়। এক দলা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে মোড়া রয়েছে জিনিসটা। আধ ইঞ্চি পুরু স্টীলের দেয়াল কি করে সহজে কাটা সম্ভব, ভালই জানে জিম প্রেসটন। দ্রুত, দক্ষ হাতে কাজ শুরু করে দিল সে। সিএলসিটাকে টেনে খানিকটা লম্বা করল, তারপর দরজার হিঞ্জ সাইডে সাঁটিয়ে দিল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভে মুড়ে।

ওটার এক মাথায় ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটরটা বসিয়ে দিল সে। ওর এক প্রান্তে দুটো তামার তার, উঠে এসেছে ভেতর থেকে। একটা অন্যটার সঙ্গে লেগে পরে শর্ট সার্কিটের বিপদ যাতে ডেকে না আনে, সে জন্যে তার দুটো টেনে দুদিকে সরিয়ে দিল প্রেসটন। এবার ফাইভ এএমপি তারের এক

প্রান্তের দু'মাথা ভাল করে পেঁচাল তামার তার দুটোর সঙ্গে। ওর অন্য মাথায় আগে থেকেই ফিট করা আছে একটা থ্রী পিন প্লাগ।

এবার তারের রীল খুলে প্লাগ লাগানো প্রান্তটা হাতে নিয়ে মাটিতে চোখ রেখে সাবধানে পিছিয়ে আসতে শুরু করল জিম প্রেসটন। গেস্ট বেডরুমে যাওয়ার করিডরে এসে দাঁড়াল সে। বিস্ফোরণের সময় আড়ালটা প্রয়োজন হবে। প্লাগটা রেখে পকেট থেকে বড় একটা পলিথিন ব্যাগ বের করল প্রেসটন। কিচেনে এসে পানি ভরে ঢোল বানাল ব্যাগটা।

ওটা নিয়ে সেফের সামনে ফিরে এল, সেফের ঠিক ওপরেই একটা থাম্ব ট্যাক লাগিয়ে তার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল ব্যাগটা। সেফের ডালা পুরোপুরি আড়ালে পড়ে গেছে ওটার। বিনে পয়সার শক্ অ্যাবজরবার। পানির মত শক্ অ্যাবজরবার আর হয় না। করিডরেই পাওয়া গেল একটা প্লাগ পয়েন্ট। সুইচটা অফ আছে কি না চেক করে প্লাগটা পয়েন্টে ঢুকিয়ে দিল প্রেসটন।

ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। মাথার ওপরে, পায়ের নিচে নিউ ইয়ার'স পার্টির হল্লা ক্রমেই বাড়ছে। অংশগ্রহণকারীদের দুম্-দাম্ নাচ আর চেঁচামেচি বন্ধ ঘরে থেকেও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। সীটিংরুমে এসে টিভির সুইচ অন করে দিল প্রেসটন। এবার অপেক্ষার পালা। ক্রমেই বাড়ছে পার্টির হল্লা। অসহ্য লাগছে। বারোটা বাজতে এক মিনিট থাকতে যেন যাদুমন্ত্রবলে আচমকা থেমে গেল সব আওয়াজ। এখন টিভির ঐতিহ্যবাহী স্কটিস গান শুনতে পাচ্ছে জিম। অথচ পাঁচ হাতের মধ্যে থেকেও এতক্ষণ একটা অক্ষরও কানে প্রবেশ করেনি তার।

হঠাৎ করেই অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। পর্দায় ভেসে উঠল পার্লামেন্ট হাউসের মাথায় বসানো বিশাল বিগ বেন ঘড়ি। প্রেসটন জানে, সমগ্র ব্রিটেনবাসী এই মুহূর্তে যার যার পানীয়ের গ্লাস মাথার ওপর তুলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে টিভির পর্দায় চোখ রেখে। আর কয়েক সেকেণ্ড পরই

বিস্ফোরিত হবে তাদের কণ্ঠ। বারোটা বাজতে পনেরো সেকেণ্ড বাকি থাকতে একজন ধারা বর্ণনাকারীর মুখ ভেসে উঠল বিগ বেনের পাশে। কাউন্ট ডাউন করছে।

দ্রুত করিডরে এসে প্লাগ পয়েন্টের সামনে বসে পড়ল প্রেসটন হাঁটু গেড়ে। কাউন্ট ডাউন শেষ। সামান্য বিরতি। তারপরই শোনা গেল বিগ বেনের মেঘ ডাকার মত গম্ভীর 'ডঙ-ঙ-ঙ-ঙ-ঙ! ডঙ-ঙ-ঙ-ঙ-ঙ!' একই সঙ্গে হাইড্রোজেন বোমা পড়ল যেন ফন্টেনয় হাউসের মাথায়। জিম প্রেসটনের কানে পর্যন্ত পৌঁছল না সিএলসি বিস্ফোরণের আওয়াজ।

এক মিনিট অপেক্ষা করে প্লাগ বের করে নিল সে পয়েন্ট থেকে। তার পেঁচাতে পেঁচাতে ফিরে চলল সেফের কাছে। অতবড় প্লাস্টিকের ব্যাগ বা ভেতরের পানির কোন চিহ্নমাত্র নেই। কেবল কফি টেবিল এবং তার আশপাশে পানির সামান্য আভাস, তাও ভাল করে না তাকালে বোঝা যায় না। সেফের দরজা দেখে মনে হয় কোন দানব বুঝি ধারাল কুড়ালের কোপে হিঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ওটা।

ভেতরে একটা ক্যাশ বাক্স এবং একটা ভেলভেট ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। বাক্সটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না প্রেসটন। ব্যাগ বের করে ভেতরের জিনিসগুলো ঢালল কফি টেবিলের ওপর। গ্রেন ডায়মণ্ড। ঝলমল করছে ঘরের আলোয়। যেন নিজের আগুনে জ্বলছে ওরা। সঙ্গে আনা সবকিছু ঝট্‌পট্‌ গুছিয়ে ফেলল প্রেসটন। ইয়ার রিঙ জোড়া ঢুকিয়ে দিল প্যান্টের পকেটে।

কিন্তু সমস্যা হলো টায়রাটা নিয়ে। ওটা এত বড় হতে পারে ভাবেনি প্রেসটন। পকেটে ভরা যাবে না জিনিসটা, বিশ্রিভাবে ফুলে থাকবে পকেট। ওদিকে ফলস্‌ বোতলটাও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে। ওটাও কারও চোখে পড়া চলবে না। পার্টিতে পান করার জন্যে আনা শ্যাম্পেন কেউ

ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। খুঁজেপেতে একটা সুদৃশ্য ব্রিফকেস নিয়ে এল জিম প্রেসটন। খোলাই আছে। ভেতরের জিনিসপত্র কার্পেটের ওপর ফেলে দিল সে কেসটা উপুড় করে।

দু-মিনিট পর হাতে ব্রিফকেস ঝুলিয়ে ফন্টেনয় হাউস ত্যাগ করল জিম প্রেসটন।

নরম তুষার মোড়া চওড়া রাস্তা ধরে তীরবেগে চইকা লিমুজিন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে মেজর কিরলভ। এ মুহূর্তে গাড়িঘোড়া তেমন একটা নেই। আর থাকলেও অসুবিধে ছিল না। কারণ চইকা চলছে রাস্তার মাঝখানের 'ভ্লাস্তি' বা এলিটদের জন্যে রিজার্ভ লেন ধরে। কেবলমাত্র সেন্ট্রাল কমিটির এমওসি নাম্বার প্লেটওয়ালা গাড়িই চলতে পারে ওই লেনে। আশপাশে ট্রাফিকের যত চাপই পড়ুক, এই লেনে পড়ে না কখনও।

মেজরের পাশেই বসেছেন জেনারেল পিওতর মার্চেঙ্কো। সময়মতই নিচে মজুদ ছিল মেজর। জেনারেল উঠে বসতে রওনা হয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশে। তারপর পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, একটা কথাও হয়নি দু'জনের মধ্যে। কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে মেজর? ভাবলেন জেনারেল। বৈঠকের কথা তিনি জানেন, কিন্তু তা কোথায় বসবে জানেন না। চিঠিতেও কিছু লেখেননি প্রেসিডেন্ট। একবার জায়গাটার নাম মেজরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার ইচ্ছে উঁকি দিল মনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলেন মার্চেঙ্কো। দরকার কি? গেলেই তো জানা যাবে।

ছবির মত আলো ঝলমল উক্রেইন হোটেল পিছনে ফেলে উত্তরে চলছে এখন চইকা লিমুজিন। অনুমান করলেন জেনারেল, বোধহয় উসভোয় চলেছে, প্রেসিডেন্টের স্বর্গতুল্য দাচায়। ওখানেই বসবে বৈঠক। কিন্তু

আরও পাঁচ মিনিট পর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আচমকা ডানে বাঁক নিয়ে টোয়েন্টি সিক্স কুটুযভ্স্কি প্রসপেক্টে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

সামনেই সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আশিতলা এক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক। এর অবিশ্বাস্যরকম বড় প্রতিটি ফ্ল্যাটে থাকেন একজন করে পলিটব্যুরোর সদস্য। ভবনটির উঁচু দেয়ালের বাইরে, সামনের পেভমেন্টে গিজগিজ করছে সাদা পোশাক পরা নাইনথ্ ডিরেক্টরেটের গার্ড। এদের সংখ্যা অনুমান করাও মুশকিল। তবে ভেতরে ঢোকার প্রকাণ্ড বিদ্যুৎচালিত গেটে মোতায়েন গার্ডদের পরনে ইউনিফর্ম আছে।

পুরু ধূসর গ্রেটকোট, ইয়ারফ্ল্যাপ নামানো ফারের শাপকা। শাপকার সামনে গাঁথা নীল রঙের ক্রেমলিন গার্ডের প্রতীক। গেটে নিজের পরিচয়পত্র দেখাল মেজর কিরলভ। খুলে গেল গেট। ভবনটির সামনে দাঁড়ানো অসংখ্য গাড়ির ফাঁকে চইকা পার্ক করে নেমে পড়ল মেজর। একটি কথাও না বলে জেনারেলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ভেতরে।

আরও দু'জায়গায় পরিচয়পত্র দেখাতে হলো কিরলভকে। তারপর একজোড়া লুকোনো মেটাল ডিটেক্টর ও একজোড়া এক্স-রে স্ক্যানারের বাধা পেরিয়ে লিফট। চারতলায় নেমে পড়ল মেজর জেনারেলকে নিয়ে। এই ফ্লোরে থাকেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক। হাত বাড়িয়ে ঝকঝকে পালিশ করা পুরু কাঠের দরজায় নক্ করল মেজর কিরলভ।

খুলে গেল দরজা। সাদা পোশাকে আরেক মেজর দাঁড়িয়ে সেখানে। মাথা ঝাঁকিয়ে জেনারেলকে ভেতরে ঢোকার অনুরোধ করল সে। পা বাড়ালেন তিনি। ওদিকে মেজর কিরলভ পিছিয়ে গেল। ঘুরে লিফটের দিকে চলল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এসে জেনারেলকে গ্রেটকোট এবং শাপকার

ভারমুক্ত করল। এরপর বিশাল এক সীটিংরূমে নিয়ে এল তাঁকে সাদা পোশাকধারী মেজর। অস্বাভাবিক উষ্ণ ভেতরটা, অন্তত জেনারেল মার্চেঙ্কোর তাই মনে হলো। তবে বিস্ময়করররকম অনাড়ম্বর। আসবাবপত্র যা আছে সাধারণের চেয়ে সামান্য উঁচু মানের হতে পারে বড়জোর, তার বেশি নয়। সুইডিশ অথবা ফিনিশ সাদা কাঠের তৈরি। বাড়তি বা শোভা বর্ধনের জন্যে অতিরিক্ত কিছুই নেই। যা আছে, ব্যবহৃত হওয়ার জন্যেই আছে।

ব্যতিক্রম শুধু কার্পেট। দেখেই বোঝা যায় দুষ্প্রাপ্য বোখারা কার্পেট। এত পুরু আর চমৎকার ডিজাইনের কার্পেট দ্বিতীয়টি দেখেননি জেনারেল। ঘরের মাঝখানে নিচু একটা কফি টেবিল ঘিরে পাঁচটা চেয়ার সাজানো। তিনজন প্রায় বৃদ্ধ লোক রয়েছেন ঘরে, জেনারেল ঢুকতে ঘুরে তাকালেন সবাই। সব ক'জনকেই চেনেন জিআরইউ প্রধান। তেমনি তাঁরাও চেনেন ওঁকে। সবাই মাথা দুলিয়ে নিঃশব্দে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন জেনারেলের সঙ্গে।

ওদের একজন, মাথা ভরা টাক যাঁর, ভ্লাদিমির ইলিচ পেত্রোফস্কি, মস্কো ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রফেসর। আরও তিনটে পরিচয় আছে ভদ্রলোকের। এক, সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য, দুই, অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সের সদস্য এবং তিন, সেন্ট্রাল কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা।

দ্বিতীয়জন, হালকা পাতলা গড়নের, ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভ, কেজিবির অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক কলাকৌশলের পিছনে মাথা খাটিয়েছেন যিনি জীবনের বেশিরভাগ সময়। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, প্রেসিডেন্টের বাল্যবন্ধু।

এবং তৃতীয়জন, চার মন ওজনের বিশালবপু, ড. জোসেফ পাভলভ।

অ্যাকাডেমিশিয়ান। অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য। ভদ্রলোক দাবার গ্র্যাণ্ড মাস্টারও বটেন। এবং প্রেসিডেন্টের বাল্যবন্ধু। জেনারেল মার্চেঙ্কো জানেন, এই মানুষটির ওপর প্রেসিডেন্ট অনেক ব্যাপারেই নির্ভরশীল। জরুরি কোন পরিস্থিতি দেখা দিলেই পরামর্শ করার জন্যে গ্র্যাণ্ড মাস্টারকে ডেকে পাঠান তিনি। এঁরা এখানে কেন, ভাবছেন জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো।

সীটিংরুমের অন্দরমহলের দিকের দরজার জোড়া পাল্লা খুলে গেল। দু'পাশে শীতল চাউনির দুই প্রকাণ্ডদেহী রোবট সদৃশ বডিগার্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত মানুষটি। পাঁচ ফুট আটের বেশি হবেন না ভদ্রলোক। মাথার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট চকচকে টাক। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। নীল চোখ। নাকটা খাড়া। থুতনিতে খাঁজ। চওড়া, মসৃণ কপাল।

'আপনারা দয়া করে বসুন,' কাছে এসে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। চেহারা ফ্যাকাসে লাগছে। ভদ্রলোক অসুস্থ, হার্টের রোগি। যত না বয়স, অসুস্থতার কারণে তারচেয়ে অনেক বেশি মনে হয়। এক বছর আগে ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে বুকে পেসমেকার স্থাপন করা হয়েছিল তাঁর। সেই থেকে জনসমক্ষে বলতে গেলে প্রায় বেরই হন না তিনি।

কুটুযভ্স্কি প্রসপেক্টের এক মাইল পশ্চিমে, পঁচিশ একর জুড়ে রয়েছে বার্চের বিশাল এক বনানী। লেনিনের দাচা ছিল ওখানে, সরকারী অবসর যাপন কেন্দ্র। ১৯১৭ সালের পর জীবনের বেশির ভাগ সময় ওখানেই কেটেছে তাঁর। মৃত্যুও হয়েছে লেনিনের ওই দাচায়। স্ট্যালিনের আমলে ওটাকে রূপান্তরিত করা হয় হাইপার এক্সক্লুসিভ সেন্ট্রাল কমিটি হসপিটালে।

বর্তমান বিশ্বের সেরা, সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত হসপিটাল ওটা। তার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ছয়জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসক রোজ দল বেঁধে এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন প্রেসিডেন্টের। সবার ধারণা, তাঁদের ঐকান্তিক এবং একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলেই আজও খাড়া আছেন ভদ্রলোক। আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ওঁরা।

প্রেসিডেন্ট বসতে একে একে অন্যরা বসলেন। জেনারেল মার্চেস্কোর আসন পড়েছে ঠিক তাঁর পাশেই। হাসি হাসি মুখে ওঁর দিকেই চেয়ে আছেন তিনি। প্রেসিডেন্টের চোখে পলক পড়ে খুব কম। যখন পড়ে, খুবই ধীরগতিতে পড়ে। ঠিক শিকারী বাজের মত। সময় নষ্ট করলেন না তিনি, কোন রকম ভূমিকার ধারও মাড়ালেন না। 'আমাদের বন্ধু, কমরেড্ জেনারেল মার্চেস্কোর রিপোর্টটি পড়েছেন আপনারা সবাই।'

ওটা কোন প্রশ্ন ছিল না। তবুও সম্মতিসূচক মাথা দোলালেন অন্য তিনজন। ওদিকে জেনারেল বিস্মিত হলেন। এঁদের সবাইকে পড়তে দেয়া হয়েছিল তাঁর রিপোর্ট?

'ওয়েল। আমি তাঁর ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আশা করি আপনাদেরও কারও দ্বিমত নেই। নাকি আছে?'

নেতিবাচক মাথা দোলাল সবাই।

এরপর ঝাড়া এক ঘণ্টা ভাষণ দিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলল সবাই। ভাষণ শেষে মত বিনিময় পর্ব। তারপর চারজনের একটা কমিটি গঠন করা হলো। অ্যালবিয়ন কমিটি। জেনারেল মার্চেস্কোর রিপোর্ট বাস্তবায়নের কার্যকর রূপরেখা তৈরি করবে কমিটি। অত্যন্ত গোপনে, মস্কোর বাইরে বসে। রূপরেখার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কাজে কেউ সেক্রেটারির সাহায্য নিতে পারবেন না, যার যার নোট নিজেকেই করতে হবে। পনেরো দিনের মাথায় কমিটি প্রেসিডেন্টের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট করবে ঠিক হলো। এই সময়টা তাদের সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হবে। বাতাসও যেন কিচ্ছুটি টের না পায়।

ব্যাপারটা প্রেসিডেন্ট সাংঘাতিক গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন, ভেবে খুশির অন্ত নেই জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কোর। এ জাতীয় বৈঠক সবসময় নোভাইয়া প্লোশেদের সেন্ট্রাল কমিটি ভবনে হয়ে থাকে। স্ট্যালিনের আমল থেকে তাই হয়ে আসছে। ব্যতিক্রম ঘটল আজই। কারণটা সহজ। তাঁদের একত্র হওয়া, বৈঠক করা ইত্যাদি পলিট ব্যুরোর অন্য সদস্যদের চোখে পড়তে পারে, অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারে তাদের, সে ঝুঁকি নিতে চাননি প্রেসিডেন্ট।

আরেকটা ব্যাপার আছে লক্ষ করার মত। এমন গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে কেজিবিকে যুক্ত করেননি তিনি। যদিও ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের ব্রিটেন সম্পর্কে জ্ঞান বলতে গেলে অগাধ। একজন অবশ্য আছেন কেজিবির, কিন্তু তিনি অবসরপ্রাপ্ত। ওদের না রাখার কারণ যাই হোক, জেনারেল খুশি। বহির্বিশ্বে ঘটতে চলা কোন রুশ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সম্ভবত এই প্রথম কেজিবি অনুপস্থিত।

'কারও কিছু বলার আছে?' প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

নড়ে উঠলেন ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভ, কেজিবির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

'বলুন, ভিক্টর।'

'কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি, আমার শোফার নেই। নিজেই গাড়ি চালাই, কখনও কখনও আমার স্ত্রীও ড্রাইভ করেন সাহায্যের জন্যে। কিন্তু আপাতত তাঁকে দিয়ে কাজ চালাতে চাই না আমি গোপনীয়তার স্বার্থে। একজন বিশ্বস্ত শোফার পেলে উপকৃত হতাম।'

'ঠিক আছে,' একটু চিন্তা করে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনার জন্যে কেজিবির একজন ড্রাইভার নিয়োগের ব্যবস্থা করছি। সকালে রিপোর্ট করবে সে। লোকটা খুবই বিশ্বস্ত। এক সময় আমার অফিশিয়াল শোফার ছিল।'

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

এর মিনিট পাঁচেক পর শেষ হলো বৈঠক।

তিন

অসময়ে নেমেছে ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি। ফলে লম্বা ছুটি কাটিয়ে নতুন করে কর্মোদ্যত লণ্ডন কিছুটা যেন থিতিয়ে পড়েছে। হঠাৎ হঠাৎ বিরতি দেয় বৃষ্টি, ধোঁয়ার মত সাদাটে কুয়াশা ভেসে বেড়ায় বাতাসে। কোথাও ঘন কোথাও হালকা, পর্দার মত। বাতাস তেমন একটা নেই। কাজেই তেমন নড়াচড়া করে না পর্দাটা, স্থির হয়ে ভেসে থাকে। দেখতে দারুণ লাগে মাসুদ রানার।

ভীষণরকম প্রতিকূল আবহাওয়া। বৃষ্টির ফলে ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। হাড়ের ভেতরের মজ্জা পর্যন্ত জমে যাওয়ার জোগাড় কনকনে শীতে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না লণ্ডনবাসীর। হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে নেই কেউ, সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই পথে নেমে এসেছে। পায়ে রেইন বুট, গায়ে বর্ষাতি, মাথায় ছাতা—ব্যস্ত পায়ে যে যার কর্মস্থলের দিকে ছুটছে তারা।

আবহাওয়ার গতিবিধি লক্ষ করার ফুরসত নেই। প্রকৃতির নিয়মে শীত আসবে, বর্ষা আসবে, ওটাই স্বাভাবিক। সেজন্যে কাজ কামাই করতে রাজি নয় এরা। সময়মত খাওয়া-বিশ্রাম যখন চলছে, কাজ চলবে না কোন যুক্তিতে? পাশাপাশি নিজ দেশের চিত্রটা কল্পনা করল মাসুদ রানা। এমন 'বাদল ঘন' দিনে বেশিরভাগ মানুষ ঘর ছেড়ে বেরই হত না। তাস

পিটিয়ে, আড্ডা মেরে, খেয়ে-দেয়ে লম্বা ঢেকুর তুলে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে বিকেলে জেগে উঠে ভাবত, দারুণ কাটল দিনটা।

সুযোগ পেলেই ফাঁকি মারা বাঙালির মজ্জাগত স্বভাব। প্রায় সবার মধ্যেই এ দোষ কিছু না কিছু আছে। যে জন্যে অন্যের দুয়ারে হাত পাতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্ভাগা বাংলাদেশের নিয়তি। বৈদেশিক ঋণের ভারে পিঠ কুঁজো হয়ে যেতে বসেছে, তবু বোধোদয় হয় না বাঙালির। কোনদিন হবে কি না ভবিতব্যও হয়তো নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবে না।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে নিজের ডেস্কে বসল মাসুদ রানা। দু'দিন আগে লণ্ডন এসেছে ও। মনে দ্বিধা আর শঙ্কা ছিল অনেক। এখন তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। একসময় রানা এজেন্সির কার্যক্রমের ওপর বেশ কিছু বিধিনিষেধ ছিল এদেশে। তদন্তে নেমে প্রতি পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হত। যে কাজ দু'দিনে সেরে ফেলা সম্ভব, সেটা শেষ করতে বিশ দিন লাগত। প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়া ছিল এক কথায় অসম্ভব, এমনকি সে তদন্ত সরকারের স্বার্থের অনুকূলে হলেও না।

ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে মাস খানেক আগে কমন্স সভার পরিচিত কয়েকজন সরকারী, কনজারভেটিভ পার্টির প্রভাবশালী সদস্যকে নিজের সমস্যা জানায় মাসুদ রানা। সেই সঙ্গে ইঙ্গিতে এটাও জানিয়ে দেয় যে, এসব বিধিনিষেধ তুলে না নেয়া হলে ব্রিটেনে রানা এজেন্সি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না ওর। এদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় উপকৃত হয়েছে রানার মাধ্যমে। ওর সমস্যা শুনে বিষয়টির সুরাহার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হবে বলে কথা দেয় তারা। কথা রেখেছে তারা সবাই।

কিন্তু বিরোধী লেবার পার্টি দাঁড়িয়ে যায় মাসুদ রানার বিরুদ্ধে। এক কথায় ওর দাবি নাকচ করে দেয় তারা। সঙ্গে গলা মেলায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, এমআই ফাইভ, এমআই সিক্স। একমাত্র বিএসএস এ-লড়াইয়ে রানার

পক্ষ নিয়ে সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ টাগ-অভ-ওয়রের পর রানার দাবি মেনে নিয়েছে সরকার। সবার প্রচণ্ড বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে গতকালই আনুষ্ঠানিকভাবে রানা এজেন্সির ওপর থেকে সব বিধিনিষেধের বেড়াজাল তুলে নেয়া হয়েছে।

ব্রিটেনের আধা সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার সমমর্যাদা লাভ করেছে রানা এজেন্সি। ক্ষমতা সীমাহীন। এবার তার খানিকটা কাজে লাগাবে মাসুদ রানা। লেবার পার্টির অনেক রথী সম্পর্কেই কনফিডেন্সিয়াল ফাইল আছে ওর এজেন্সিতে। তাদের মতিগতি আরও আগে থেকেই জানা আছে ওর। মায় সুইস ব্যাঙ্কে কার কত টাকা দফায় দফায় জমা হয়েছে, কোত্থেকে এসেছে সে টাকা, তা পর্যন্ত।

কিন্তু জেনেও কিছু করতে পারেনি রানা। কারণ বিধিনিষেধ। ওসব নাড়াচাড়া করার মত ক্ষমতা ছিল না। করতে গেলে বরং হিতে বিপরীত হত। আজ আর সে ভয় নেই। এক এক করে ব্যাটাদের মুখোশ খুলে দেবে ও। দেখতে চায় ধাওয়া খেলে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ঘেয়ো কুকুরগুলোর চেহারা কেমন হয়। কি ভেবে হেসে ফেলল রানা। লক্ষই করেনি কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে গিলটি মিয়া।

ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সে রানাকে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে দেখে। ভাবল, এখন থাক, পরে আসা যাবে বরং। ভাবনা-চিন্তার সময় ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। মনস্থির করে ঘুরে দাঁড়াতে গেল গিলটি মিয়া, এই সময় হেসে উঠল রানা। দেখাদেখি তারও দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে হাসল দুজন।

একসময় সচকিত হলো মাসুদ রানা। টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে চোখ পড়ল দরজার ওপর। গম্ভীর হলো ও। 'কি ব্যাপার, গিলটি মিয়া? হাসছ কেন?'

'আপনাকে হাসতে দেকে, স্যার।' অকপট স্বীকারোক্তি গিলটি মিয়ার।

তার মানে বেশ আগেই ঘরে ঢুকেছে ও, ভাবল রানা। 'কখন এলে? টের পাইনি তো!'

'আমার আসা-যাওয়া স্বয়ং উনি পর্যন্ত,' আকাশের দিক নির্দেশ করল গিলটি মিয়া তর্জনী খাড়া করে, 'টের পান না। আর আপনি তো...কতায় বলে, স্যার, তেলচোট্টাও একটা পাকি। বত্রিশ বচোর ধরে...।' রানার ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখে ব্রেক কষল গিলটি মিয়া। মুহূর্তও দেরি না করে অন্য লাইন ধরল। 'চেয়েছিলুম চলে যেতে, স্যার। কিন্তু আপনাকে হাসতে দেকে না ডেঁড়িয়ে পারলুম না। হাসলে আপনাকে কি যে...'

'বলো, কেন এসেছ।'

হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেল গিলটি মিয়ার। আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু পারা গেল না। পকেট থেকে লম্বামত সরু একটা প্যাকেট বের করে ছোট ছোট পায়ে রানার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল। 'লেবারদের সঙ্গে যুদ্যে আপনার জয় হয়েচে। তাই আমার তরপ থেকে এই ছোট্ট উপহার।'

হেসে উঠতে যাচ্ছিল রানা 'লেবারদের' শুনে, কিন্তু দমন করতে সক্ষম হলো শেষ পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে জিনিসটা নিল মাসুদ রানা। 'ধন্যবাদ।' প্যাকেটের ওপর চমৎকার একটা গ্যাস লাইটারের ছবি। 'কেন অনর্থক খরচ করতে গেলে বলো তো?'

গলে পানি হয়ে গেল গিলটি মিয়া। 'বাহ্! অনথক হতে যাবে কেন, স্যার? বিজয়ীকে যে বরমাল্য দিতেই হবে। ওটাই যে রেওয়াজ।'

'তোমার পছন্দ আছে। জিনিসটা দারুণ হয়েছে, গিলটি মিয়া। ধন্যবাদ।'

হাত কচলাতে লাগল গিলটি মিয়া। অনবরত হেঁ-হেঁ করছে। মাসুদ

রানার মুখে একবার ধন্যবাদ পাওয়াই অনেক, প্রায় আশাতীত। তার ওপর আরও একবার পেয়েছে। আনন্দ রাখার জায়গা হচ্ছে না তার ছোট্ট বুকের ভেতর।

সামাল দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করল মাসুদ রানা। মানুষটি সেন্টিমেন্টাল। তাল হারিয়ে কি করে বসে ঠিক নেই। আবার গম্ভীর হলো ও। 'তোমার ট্রেনিং কেমন চলছে, গিলটি মিয়া?'

ওকে আড়াল করে চোখের পানি মুছল সে চট্ করে। কেঁদে ফেলেছে খুশিতে। 'মন্দ নয়, স্যার। ভালই চলচে।'

গিলটি মিয়া বেরিয়ে যেতে আনমনা হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। কেমন মানুষ, বকলে হাসে আর স্নেহ-ভালবাসা পেলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। আগেও অনেকবার ওর চোখে পানি দেখেছে রানা। আসলে গিলটি মিয়া এসবে অভ্যস্ত নয় বলেই ব্যাপারটা ঘটে। জীবনের দীর্ঘ সময় পুলিসের লাথি-গুঁতো খেয়ে, মানুষের ঘৃণা, লাঞ্ছনা পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল মানুষটা। মনের মধ্যে গেড়ে বসেছিল ধারণা, এরই নাম বোধহয় জীবন। এরই নাম বেঁচে থাকা।

যা কখনও পায়নি, মানুষ হিসেবে মর্যাদা, ভাল কাজের স্বীকৃতি, মাসুদ রানার সান্নিধ্যে এসে তাই পেয়েছে সে। হঠাৎ এই পাওয়ায় এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। সে জন্যেই বুঝি সামান্য স্নেহের পরশ পেলে চোখ ভিজে ওঠে লোকটার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যাকেট থেকে লাইটারটা বের করল রানা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর ওটা সিগারেট প্যাকেটের ওপর রেখে পুরানো লাইটারটা ওপরের ড্রয়ারে পুরল। চারটের মধ্যে তিনটে ড্রয়ার ভর্তি ছোটবড় আরও অনেক উপহার সামগ্রী রয়েছে। এজেন্সির 'ফ্রী মুভমেন্টের' লাইসেন্স প্রাপ্তি উপলক্ষে বিএসএস এবং রানা এজেন্সির কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের তরফ থেকে পাওয়া।

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। রিভলভিং চেয়ারের উঁচু পিঠে হেলান দিয়ে ডুবে গেল চিন্তায়। লণ্ডন ত্যাগ করার আগে অবশ্যকরণীয় কি কি, মনের মধ্যে একটা একটা করে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাতে আরম্ভ করল।

'কি, ওস্তাদ,' আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে গিলটি মিয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে জিম। 'কেমন! বলেছিলাম না?'

কথা নেই গিলটি মিয়ার মুখে। সামনের কফি টেবিলে রাখা আছে ডালা খোলা সুদৃশ্য এক ব্রিফকেস। ভেতরে সাজানো গ্রেন ডায়মণ্ডের উজ্জ্বল দ্যুতি দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিয়েছে প্রথম দর্শনেই। শিস্যের এতবড় সাফল্যে খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু কেন যেন হতে পারছে না সে। বসে আছে মুখ গম্ভীর করে।

'কি হলো, ওস্তাদ? মুখ গোমড়া করে আছেন, আপনি খুশি হননি?'

'হয়েচি। শোন্, এ জিনিস কার জানিনে। জানার দরকারও নেই। কিন্তু মন বলচে, এগুনোর সঙ্গে অশুব কিছু একটা রয়েচে। পারলে আজই বিদেয় কর এসব জঞ্জাল। বেচে দে, না হয় নদীতে ফেলে দে, সঙ্গে রাকিসনে। বিপদ হতে পারে তোর।'

'এ কথা কেন বলছেন, ওস্তাদ?' মুখ শুকিয়ে গেল প্রেসটনের। চট করে ব্রিফকেস বন্ধ করে দিল সে।

'ঠিক জানিনে কেন বলচি। তবে নাকে বিপদের গন্ধ পাচ্চি আমি। যা বললাম তাই কর। দেরি করা ঠিক হবে না।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

দুপুর পর্যন্ত বেরোই বেরোই করেও ঘরে বসে থাকল জিম। মন খারাপ হয়ে গেছে। ভেবে রেখেছিল, এমন দামী জিনিস, রয়ে-সয়ে ভাল দামে বিক্রি করবে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কার কথা বলে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়ে

গেল ওস্তাদ। তবে এ-ও ভালই জানে সে, গিলটি মিয়ার মন শুধু শুধু ভয় পায় না। তার পিছনে কারণ থাকে। অতীতে বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছে সে।

ঠিক আছে, যা পাওয়া যায় তাই সই, ভাবল জিম প্রেসটন। তবু ওস্তাদকে অমান্য করবে না। আজই বিদেয় করে দেবে ডায়মণ্ডগুলো। তবে খানিক চিন্তা-ভাবনার পর ব্রিফকেসটার ব্যাপারে অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিল সে। ওটা হাতছাড়া করবে না, রেখে দেবে নিজের কাছে। এত সুন্দর ব্রিফকেস আর চোখে পড়েনি প্রেসটনের। জিনিসটা সে প্রকাশ্যে বের করবে না কখনও। রেখে দেবে গোপনে। কে-ই বা জানবে?

বণ্ড স্ট্রীট। পরিচিত এক জুয়েলারি দোকানের ভেতরে প্রবেশ করল জিম প্রেসটন। দোকানটা ছোট। তবে এদের হাতের কাজের সুনাম আছে খুব। গাঢ় রঙের স্যুট পরেছে আজ প্রেসটন। সিল্কের শার্ট, মিউটেড টাই। হাতে সাধারণ একটা অ্যাটাশে কেস।

খুদে কাউন্টারের ওপাশে বসা সুন্দরী অভ্যর্থনাকারিণী মুখ তুলে মধুর হাসি দিল এক চিলতে। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে, স্যার?'

'কিরলনস্কির সাথে দেখা করতে চাই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। 'বলুন, জেমস দেখা করবে।' এ দোকানের মালিক লোকটা।

মেয়েটি নড়ার আগেই দোকানের পিছনদিকের টিনটেড গ্লাসের দরজাটা খুলে গেল। খাটো, ভীষণ মোটা এক টাক-মাথা দাঁড়িয়ে ওখানে। জিমের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। 'মিস্টার জেমস! কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন,' বলে মেয়েটির দিকে তাকাল। 'আমার বন্ধু, বুঝলে? অনেকদিন পর দেখা।'

মাথা দুলিয়ে আরেক চিলতে হাসি দিল মেয়েটি। সামান্য পিছিয়ে গিয়ে

প্রেসটনকে ভেতরে ঢোকার জায়গা দিল লুইস কিরলনস্কি। কাঁচের দরজা বন্ধ করে নিজের ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। কেবল ডেস্কের ওপর একটা শেড পরানো বাতি জ্বলছে, গোল আলোটা পড়েছে টেবিলের মাঝখানে বিছানো সাদা একখণ্ড ব্লটারের ওপর। প্রেসটনকে পাশের একটা চেয়ার ইঙ্গিত করে নিজের আসনে বসল মোটা। 'তারপর, জেমস? ইন্টারেস্টিং কিছু?'

'আমি সব সময় ইন্টারেস্টিং জিনিসই এনে থাকি। কেবল তুমিই ওতে ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে পাও না।' কেসটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো বের করে ব্লটারের ওপর রাখল জিম প্রেসটন।

'আরে না! আমি কি সত্যি সত্যি···।' সামনের ঝলমলে পাথরগুলোর ওপর চোখ পড়তে ভাষা হারিয়ে ফেলল লুইস কিরলনস্কি। দম বন্ধ হয়ে এল তার। অবিশ্বাসে চোখ উঠে গেছে কপালে। 'গ্লেন···' দম নিল সে। 'তুমি গ্লেন ডায়মণ্ড···?'

হাসল জিম প্রেসটন। 'কি মনে হয়, ইন্টারেস্টিং?'

'ও-ও মাই গড্!' টাকে হাত বোলাতে লাগল কিরলনস্কি। ঝাড়া দশ মিনিট বসে থাকল সে বাক্‌হারা হয়ে। প্রেসটন যেমন এগুলোর ইতিহাস জানে, তেমনি সে-ও জানে। সোজা পথে কিরলনস্কি যত অর্থ কামিয়েছে, তার হাজার গুণ বেশি কামিয়েছে বাঁকা পথে। এগুলোর ওপর নজর ছিল তারও। কিন্তু থাকলে কি হবে? সে-তো আর জিম প্রেসটন্ নয়।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টেকো। 'ইউ, নটি বয়। ট্যালেন্টেড নটি বয়,' মন্তব্যটা দ্রুত যেন সংশোধন করল। পোলিশ অ্যাকসেন্টে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে কিরলনস্কি। কারণ সে পোল, ইহুদি।

১৯৩৯ সালে নাজি বাহিনীর পোল্যাণ্ড আগ্রাসনের সময় বন্দী হয় লুইস জিরলনস্কি। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত জার্মানদের হাতে আটক ছিল

সে। পরে মিত্রবাহিনী অসউইজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে অন্যদের সঙ্গে তাকেও মুক্তি দেয়। সে বছরই ইংল্যাণ্ড চলে আসে কিরলনস্কি। প্রথমে কয়েক বছর এক জুয়েলারি দোকানে চাকরি করে। তারপর নিজেই একদিন দোকান দিয়ে বসে।

এতগুলো বছর এ দেশে কাটিয়েও ইংরেজিটা ভালমত রপ্ত করতে পারেনি লুইস কিরলনস্কি। অবশ্য শেখার তেমন চেষ্টাও ছিল না তার। প্রচুর টাকার মালিক মানুষটি। সংসারে মেয়ের বয়সী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই তার। মেয়েটি এদেশী, এক সময় জিম প্রেসটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তার। একটি গুণ আছে লুইস কিরলনস্কির, জীবনে কখনও কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি। অন্যদের তুলনায় পয়সা কিছু কম দেয় সে, কিন্তু তবুও এখানেই বারবার আসে প্রেসটন তার ওই গুণটির জন্যে। জান চলে গেলেও একটি গোপন তথ্যও কেউ বের করতে পারবে না লুইসের পেট থেকে।

'কী এত ভাবছ?'

'ভাবছি অনেক কিছুই, বয়। এগুলো কোন সাধারণ পাথর নয় যে···। কি যে করি!'

'রাস্তা যা হোক কিছু একটা বের করো।'

'এগুলোর দাম কত হতে পারে অনুমান করতে পারো?'

'অনেক। এক মিলিয়ন পাউণ্ডের কম তো নয়-ই।'

'বোঝো তাহলে ঠ্যালা। এর জন্যে এমন এক ক্রেতা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে, যে জনসমক্ষে এগুলো বের না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিনতে রাজি হবে। এমন ক্রেতারও অভাব নেই। আছে, তবে খুব কম। তাদের কাছে এর ন্যায্য দামও আশা করতে পারো না তুমি। যা চাইব, নির্ঘাত তার অর্ধেক দাম বলবে।'

ভাগ্যিস, ব্যাটা আরও কমিয়ে বলেনি, ভাবল জিম প্রেসটন। 'কতদিন

অপেক্ষা করতে হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল লুইস কিরলনস্কি। 'তার কি কোন ঠিক আছে? কাল-পরশুও পেয়ে যেতে পারি যদি ভাগ্য ভাল হয়। আবার দু'চার বছরও লেগে যেতে পারে।'

'মুসিবত!'

'আরেকটা উপায় আছে তাড়াতাড়ি বিক্রি করার।'

'কি?'

'সেটিং ভেঙে সোনা আর ডায়মণ্ড আলাদা আলাদাভাবে বিক্রি করে দেয়া। তাতে দাম অবশ্য অনেক কমে যাবে।'

'আমাকে কত দিতে পারবে তাই বলো,' একটা সিগারেট ধরাল জিম প্রেসটন।

খানিক হিসেব কষল লুইস কিরলনস্কি। টাক চুলকাল। 'খাটনি অনেক, সময়ও লাগবে প্রচুর...সে যাক্। তোমাকে পুরো বিশ হাজার দেব আমি। তবে এখনই সব দিতে পারব না। অর্ধেক আজ, নগদ। বাকিটা এগুলো বিক্রি করে।'

আরও মিনিট পাঁচেক কথা হলো দুজনের। তারপর নগদ দশ হাজার পাউণ্ড পকেটে পুরে আসন ছাড়ল প্রেসটন। সেদিন এবং তার পরদিন পিছনের রূমের দরজা বন্ধ করে কাজ করল লুইস কিরলনস্কি এক মনে। কাজ শেষ করে বেরিয়ে এসে এক পাবলিক ফোন বুদ থেকে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্পে টেলিফোন করল।

এরপর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ভোরের প্রথম ব্রাসেলস্ ফ্লাইটের একটা আসন বুক করল সে নিজের জন্যে। দিনের আলো পুরোপুরি ফোটার আগেই হিথ্রো এয়ারপোর্টের লণ্ডন-ব্রাসেলস ডেইলি প্যাসেঞ্জার ব্যবসায়ীদের জটলা থেকে সামান্য তফাতে, সোফায় বসা দেখা গেল

কিরলনস্কিকে। আনমনা। পরনে ভারি ওভারকোট, মাথায় নরম টুইডের হ্যাট। হাতে হ্যাণ্ডগ্রিপ, মুখে বড়সড় একটা ব্রায়ার পাইপ।

কিন্তু পাইপ টানছে না লুইস। তামাক ওতে আছে ঠিকই, তবে তামাকের তলায় অন্য জিনিসও আছে। চেপেচুপে বসানো আছে চার চারটে গ্রেন ডায়মণ্ড। বিমানে আসন নিতেই হাসিমুখে এক হোস্টেস এগিয়ে এল লুইস কিরলনস্কির দিকে। মুখ নামিয়ে যথেষ্ট নম্রতার সঙ্গে বলল, 'পাইপটা দয়া করে পকেটে রাখুন, স্যার, প্লীজ। কেবিনে ধূমপান নিষেধ।'

'নিশ্চই নিশ্চই।' পাইপটা পকেটে রাখার সুযোগ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিরলনস্কি। ব্রাসেলস নেমে ট্যাক্সি চেপে উত্তরে ছুটল সে। মোটরওয়ে ধরে প্রথমে মিসিলেন, তারপর ডানে বাঁক নিয়ে উত্তরপুবের লিয়ের এবং নিয়েলেনের উদ্দেশে। বেলজিয়ামের পৃথিবী বিখ্যাত ডায়মণ্ড ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয় অ্যান্টওয়ার্পের পেলিকানস্ট্রাট এবং তার আশেপাশে।

বিশাল সব ডায়মণ্ড এন্টারপ্রাইজের শো-রূম এবং কারখানা আছে এখানে। দৈনিক কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা হয়। সারা দেশে এদের হাজারো সরবরাহকারী আছে। এমনই এক সরবরাহকারী রাউল লেভি। সে-ও পোলিস, এবং ইহুদি। লুইসের মত লেভিও বিশ্বযুদ্ধের পরে এদেশে এসে ব্যবসা শুরু করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে দুজনের। নিয়েলেন গ্রামে থাকে সে।

লাঞ্চের সামান্য আগে বৈঠকে বসল লুইস কিরলনস্কি ও রাউল লেভি। এক ঘণ্টা আলোচনা, দর কষাকষির পর পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে গ্রেন ডায়মণ্ডগুলো কিনে নিতে সম্মত করানো গেল লেভিকে। অর্ধেক টাকা এখন, বাকিটা বিক্রির পর পরিশোধের শর্তে। টাকা নিয়ে ওইদিনই লণ্ডন ফিরে এল কিরলনস্কি।

জানুয়ারির ছয় তারিখ, মাঝরাতের সামান্য আগে লণ্ডন ফিরে এলেন রবার্ট

ফিলবি। একা। স্ত্রী রয়ে গেছেন ভাইয়ের ওখানে, কিছুদিন বেড়িয়ে ফিরবেন। টানা ছয় ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত ফিলবি। ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী। স্লিম ফিগার। বয়স পঞ্চান্ন। দুই কানের ওপরে চুল বেশিরভাগই পাকা। অভিজাত চেহারা।

সোজা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে ঢুকে পড়লেন রবার্ট ফিলবি। গাড়ি লক্ করে স্যুটকেস নিয়ে উঠে এলেন নিজের ফ্লোরে। মন-মেজাজ ভাল নেই। স্ত্রীর এ-সময় গ্রামের বাড়িতে থেকে যাওয়া পছন্দ হয়নি তাঁর। কারণ ফেডোরার এই 'কিছুদিন' প্রায়-সময়ই মাস ছাড়িয়ে যায়। এবার কতদিন লাগবে কে জানে। তালা খুলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর পা রাখলেন রবার্ট ফিলবি।

দাঁড়িয়ে গেলেন চট্ করে। কুঁচকে উঠেছে কপাল। অ্যালার্ম সিস্টেম থেকে 'পিপ্' 'পিপ্' সঙ্কেত বেজে ওঠার কথা। কিন্তু উঠল না। কেন? যাওয়ার সময় তো তিনি নিজ হাতেই মাস্টার সুইচ অন্ করে দিয়ে গিয়েছিলেন অ্যালার্মের। নষ্ট হয়ে গেল নাকি সিস্টেম? বিরক্ত মুখে ক্লোক রুমে ঢুকলেন ফিলবি। অফ করে দিলেন ওটার মাস্টার সুইচ। তারপর স্যুটকেস রেখে সীটিংরুমে এলেন। বাঁ-হাতে টাইয়ের নট্ আলগা করতে করতে আলোর সুইচ টিপলেন।

এবং জায়গায় জমে গেলেন সামনের দৃশ্য দেখে। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল চোয়াল। দেহের পাশে ঝুলে পড়ল বাঁ হাত। সামনের দেয়াল এবং সেফটার অবস্থা দেখে মাথা ঘুরে উঠল। ধাতস্থ হতে এক মিনিট লাগল। লম্বা পায়ে ঘর অতিক্রম করে সেফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন রবার্ট ফিলবি। উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখলেন। তারপর পায়ের কাছে পড়ে থাকা একরাশ কাগজপত্র, কলম, নোটবই ইত্যাদির দিকে তাকালেন।

অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'ওহ্, গড! আমার ব্রিফকেস!'

পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ফিলবি ধপ্ করে। শ্বাস বইছে ঝড়ের বেগে। গালে হাত দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছেন। মুখের রক্ত সরে গিয়ে চেহারা হয়ে উঠেছে কাগজের মত। দশ মিনিট পর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন রবার্ট ফিলবি। রূমের এক কোণে স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নাম্বার টিপতে লাগলেন।

রিঙের পর রিঙ হচ্ছে ও-প্রান্তে, কিন্তু ধরছে না কেউ।

একটানা তিন দিন প্রচেষ্টা চালানোর পর ও-প্রান্তের সাড়া পেতে সমর্থ হলেন রবার্ট ফিলবি, ওয়েস্ট এণ্ডের এক নামী-দামী হোটেলের অ্যালকোভে সেদিনই সন্ধেয় লোকটির মুখোমুখি হলেন তিনি। তার আগের দিন রাতে অ্যান্টওয়ার্প থেকে ঘুরে এসেছে লুইস কিরলনস্কি।

বয়স ষাটের মত হবে লোকটির। আয়রন গ্রে চুল। হালকা খয়েরি চোখজোড়া অস্থির, কি যেন খুঁজে ফিরছে সারাক্ষণ। পোশাক-আশাক মূল্যবান, সুন্দর ছাঁটের। গোবেচারা ভাব, তবে দেখার চোখ দিয়ে দেখলে মানুষটি যে সাধারণ আর দশজনের মত নয়, 'অসাধারণ', সহজেই বোঝা যায়। আইনের দেয়ালের ওপাশে বসবাস তার।

'দুঃখিত। তিনদিন বাইরে ছিলাম। আপনার অসুবিধের জন্যে...বোঝেনই তো। ব্যাচেলর মানুষ। বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে যেতেই হলো। এবার বলুন কেন খুঁজছেন আমাকে।'

অল্প কথায় ব্যাপারটা তাকে খুলে জানালেন রবার্ট ফিলবি। শুনতে শুনতে দৃষ্টি আরও চঞ্চল হয়ে উঠল লোকটির। 'পুলিসকে জানিয়েছেন?'

'না,' দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন ফিলবি। 'ভাবলাম, আগে আপনাকে জানাই। তারপর অবস্থা বুঝে যা করার করব।'

'এখন আর চাইলেও ওদের জানাতে পারছেন না আপনি,' কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল অসাধারণ। 'দেরি হয়ে গেছে। তাতে উল্টো বিপদ হবে। আপনি নিজেই ফেঁসে যেতে পারেন। অবশ্য... ।'

'কি?'

'যদি এমন করা যায়, সেফ পাল্টে সব আগের মত...না, সম্ভব নয়। এ ক'দিন নিশ্চই শেফিল্ডে ছিলেন না আপনি। ছিলেন এখানেই। বাইরের কেউ না দেখে থাকলেও অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কেউ না কেউ দেখেছে আপনাকে। কাজেই ওসব করতে গেলে কেঁচে যাবে।'

'ঠিক।'

'আপনার স্ত্রী ক'দিন থাকবেন ভাইয়ের ওখানে?'

'ঠিক জানি না। তবে দুই এক সপ্তা তো বটেই।'

'গুড। এর ভেতর একই মডেলের আরেকটা সেফ বসাতে হবে আগের জায়গায়। যে করে হোক, নকল গ্রেন ডায়মণ্ড জোগাড় করতে হবে। সময় লাগবে। ধৈর্য ধরে কাজটা সারতে হবে। নইলে আপনার স্ত্রী ফিরে যদি দেখেন তাঁর সখের অলঙ্কার চুরি হয়েছে, তাহলেই হয়েছে। ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেয়া যাবে না তাঁকে ব্যাপারটা।'

'সে না হয় হলো, কিন্তু আসলগুলো উদ্ধারের কি ব্যবস্থা করা যায়?'

'আমার ওপর ছেড়ে দিন সে ভার। আজই খোঁজ-খবর শুরু করছি আমি। আমার ধারণা, অনেক আগেই লণ্ডনের বাইরে চলে গেছে ডায়মণ্ডগুলো। হয়তো এতক্ষণে কেটেকুটে অন্যরকম আকার দেয়া হয়েছে। চেনা সহজ হবে না। সে আমি বুঝব। আপনাকে যা বললাম, তাই করুন। সেফটা পাল্টান। ঘর, অ্যালার্ম সিস্টেম মেরামত করে ফেলুন। আর আপনার স্ত্রী যতদিন সম্ভব ভাইয়ের ওখানেই যেন থাকেন সে ব্যবস্থা করুন।

সবার সঙ্গে পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে হবে। বাকি সব সামলাব আমি। আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না। সময় হলে আমিই যোগাযোগ করব।'

আসন ত্যাগ করল লোকটা। কোনদিকে না তাকিয়ে ছোট ছোট পায়ে বেরিয়ে গেল হোটেল ছেড়ে। বসে থাকলেন রবার্ট ফিলবি। চিন্তিত। সেই সঙ্গে আতঙ্কিত। পারবে তো লোকটা?

চার

দুটো গাড়িতে এল ওরা চারজন। গাট্টাগোট্টা, বিশালদেহী সবাই। ভীতিকররকম হিংস্র চেহারা। মলেনস্ট্রাটে রাউল লেভির বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল দুই আরোহীসহ একটা কালো সেডান। অন্য দুজনকে নিয়ে আরেকটা সেডান দাঁড়াল শ' খানেক গজ এগিয়ে। দুটো গাড়ির প্যাসেঞ্জার সীটে বসা দুজন নেমে পড়ল। ড্রাইভার দুজন নামল না। আলো নিভিয়ে বসে থাকল চুপচাপ এঞ্জিন চালু রেখে।

সন্ধে সাতটা। প্রচণ্ড শীত পড়েছে আজ। মানুষজনের কোন চিহ্নই নেই রাস্তায়। আরোহী দুজন লেভির বাংলোর ফ্রন্ট ডোরে এসে নক্ করল। লেভি স্বয়ং খুলল দরজা। পাথরমুখো দুই বিশালদেহী ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। প্রতিবাদ জানাবার জন্যে মুখ খুলতে গেল রাউল লেভি, কিন্তু সোলার প্লেক্সাসে ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ খেয়ে স্বর আটকে গেল গলার কাছে।

চিত হয়ে পড়েই যাচ্ছিল সে আরেকটু হলে।

কলার চেপে ধরে ঠেকাল অন্যজন। দরজার কাছের একটা স্ট্যাণ্ডে ঝুলছে লেভির ওভারকোট, ওটা তার কাঁধের দুদিকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। তারপর দুজন দু'পাশ থেকে ধরে বাংলো থেকে বের করে নিয়ে এল তাকে। ব্যথায় এখনও চোখে আঁধার দেখছে রাউল লেভি। বাধা দেয়ার মত শক্তি বা ক্ষমতা কোনটাই নেই। ঘোরের মধ্যে হাঁটছে সে আগন্তুকদের সঙ্গে।

বাংলোর গেটে অপেক্ষমাণ সেডানের পিছনের দরজা মেলে ধরেছে ড্রাইভার ওদের এগিয়ে আসতে দেখে। ভেতরে ঠেলে ঢোকানো হলো রাউল লেভিকে। দু'পাশে বসল দুই বিশালদেহী। অবাক ব্যাপার, এতক্ষণে লোকগুলোর মুখ থেকে একটা শব্দও বের হতে শোনেনি লেভি। যেন কথা বলতে জানে না কেউ, বোবা। রওনা হয়ে গেল সেডান।

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পঞ্চাশ একর জোড়া বিশাল পাবলিক পার্ক কেসেলসি হেইডের ঠিক মাঝখানে এসে থামল গাড়ি দুটো। দ্বিতীয় গাড়ির একমাত্র আরোহী-কাম-চালক বেরিয়ে এসে প্রথমটির চালকের পাশের সীটে বসল। সে-ই দলনেতা। পিছন ফিরে সঙ্গীদের কিছু একটা ইঙ্গিত করল সে। এবার রাউল লেভির ডানদিকে বসা লোকটি দু'হাতে শক্ত করে ঠেসে ধরল তাকে। যাতে নড়াচড়া করতে না পারে লেভি।

বাঁ পাশের জন পকেট থেকে বের করল ভারি একজোড়া প্লায়ার্স। অত্যন্ত ধীর স্থির ভঙ্গিতে লেভির বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে পর পর তিনটে আঙুলের গাঁট গুঁড়ো করে ফেলল সে প্লায়ার্সের প্রচণ্ড চাপে। চিৎকার করতে পারছে না রাউল, কারণ ঘুরে বসে তার মুখ চেপে ধরে রেখেছে ড্রাইভার। সীটের নরম গদিতে প্রায় সেঁধিয়ে গেছে তার মাথার অর্ধেকটা।

মাথা ঝাঁকাল দলনেতা। 'কথা বলতে চাও?'

বুকের ভেতর ঘড় ঘড় করছে রাউল লেভির। মুখ চেপে ধরে রাখার ফলে

বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না আর্ত গোঙানি। দ্রুত মাথা দোলাল সে, বলতে চায়।

মুখ চেপে ধরা হাতটা সরে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় নেতিয়ে পড়ল লেভি। দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ফোঁপাল সে, গোঙাল। বাধা দিল না কেউ। মূর্তির মত বসে থাকল চার বিশালদেহী। আরও পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো তাকে কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার। তারপর মুখ খুলল দলনেতা। 'লণ্ডন থেকে চুরি যাওয়া ডায়মণ্ড। কোথায় আছে ওগুলো?'

পোলিস অ্যাকসেন্টের ফ্লেমিশ ভাষায় গড়গড় করে বলে গেল রাউল লেভি। দেরি করল না এক মুহূর্তও।

মাথা দোলাল দলনেতা সন্তুষ্ট হয়ে। 'সেফের চাবি?'

লেভির পকেটেই ছিল চাবি। গোছাটা নিয়ে দ্বিতীয় সেডান চালিয়ে তার বাংলোয় ফিরে চলল লোকটা। ডায়মণ্ডগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পার্কের গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল গাড়িটা। ভাঙা আঙুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরে অনবরত গোঙাতে লাগল রাউল লেভি। পাশের লোক দুটো একবার তাকালও না তার দিকে। যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ড্রাইভারও তেমনি। সোজা সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। স্টিয়ারিঙ হুইলে তবলা বাজাচ্ছে গ্লাভস পরা আঙুল দিয়ে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিরে এল দলনেতা। নিজের গাড়ি ছেড়ে এটায় এসে উঠল। 'শেষ একটা প্রশ্ন। এগুলো কে দিয়ে গেছে তোমাকে, কি নাম তার।'

মাথা দোলাল লেভি। বলবে না। কিন্তু বলতে বাধ্য করা হলো তাকে। ভাল হাতের আরও দুটো আঙুল খোয়াবার পর মুখ খুলল সে। বলে দিল লুইস কিরলনস্কির নাম। নিঃশব্দে পার্ক ত্যাগ করল গাড়ি দুটো। একটায় রাউল লেভিসহ তিনজন। অন্যটায় দলনেতা একা। টানা বিশ মিনিট পর

নিয়েলেনের দু'মাইল পুবে লুই স্ট্রাট ক্রসিঙে পৌঁছল তারা। সামনেই লিয়ের-হেরেন্টাল রেল লাইন, তীরের মত সোজা চলে গেছে।

রেল লাইনের দুই পারে ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা খামারবাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। জনমানবের কোন সাড়া নেই কোথাও। রেল ক্রসিঙের সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ল সেডান দুটো। আলো নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দেয়া হলো। প্রথম গাড়ির চালক বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে ঘরে তৈরি বিশেষ এক ধরনের মদ ভরা বোতল তুলে দিল লেভির ডানপাশের সঙ্গীর হাতে।

জোর করে বোতলের সবটুকু গেলানো হলো রাউল লেভিকে। তারপর চুপ করে বসে থাকল সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেল লেভি। ঢুলছে মৃদু মৃদু। তার বরং ভালই লাগছে। অ্যালকোহলের প্রভাবে হাতের ব্যথা এখন আর খুব একটা টের পাচ্ছে না। এগারোটা পনেরোয় গাড়ি থেকে ধরাধরি করে বের করা হলো তাকে।

রেল গাড়ির আওয়াজ আসছে। এগারোটায় লিয়ের থেকে ছাড়া মালবাহী ডিজেল-ইলেক্ট্রিক নন স্টপ লোকো আসছে। সাধারণত সত্তর মাইল বেগে এই ক্রসিং অতিক্রম করে ওটা। রাউল লেভি তখন প্রায় অজ্ঞান। দেহটা রেলের ওপর শুইয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেল লোকগুলো। অপেক্ষা করতে লাগল শেষটুকু দেখার জন্যে।

একেবারে অন্তিম মুহূর্তে নিথর পড়ে থাকা দেহটার ওপর চোখ পড়ল লোকো চালকের। পলকে ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে গেল সে। রেল আর হুইলের প্রচণ্ড ঘর্ষণে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। আতশবাজির ফুল্‌কির মত স্ফুলিঙ্গের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। গতি অনেকটা মন্থর হয়ে পড়ল মালগাড়ির। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

কম করেও ত্রিশ মাইল গতিতে রাউল লেভির দেহটা দ্বিখণ্ডিত করে

দিয়ে গেল নিয়ের-হেরেন্টাল লোকো। লাইনের ওপর চাকা ঘষে ঘষে আরও এক-দেড়শো গজ এগিয়ে থামল দীর্ঘ গাড়িটা। লাফিয়ে নামল চালক টর্চলাইট নিয়ে। কাছে এসে এক পলক দেখল সে রক্ত মাংসের খণ্ড দুটো। তারপর কাছের খামারবাড়ির দিকে ছুটল পুলিসে টেলিফোন করতে।

তার আগেই নিজেদের গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে গেছে কালো সেডান দুটো।

লোকগুলোকে দেখামাত্রই চিনে ফেলল লুইস কিরলনস্কি। চেহারাতেই ফুটে আছে তাদের প্রকৃতি। বাসায় লুইস একা, স্ত্রী মেলিণ্ডা গেছে শপিঙে। টিভিতে খবর দেখছিল সে। রোজই আশা করে, আজ হয়তো গ্লেন ডায়মণ্ড চুরি হওয়ার খবর বলবে টিভি। কিন্তু পাঁচ দিন পেরিয়ে গেল, এখনও কোন খবর নেই। ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। এমন গরম খবর কি করে গোপন থাকে?

করাঘাতের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দিল সে। ভেবেছে বুঝি মেলিণ্ডা। পরমুহূর্তে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল লোক তিনটে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। ইস্ট এণ্ডের মাস্‌ল্‌ম্যান এরা। আণ্ডারওয়ার্ল্ডে 'স্ল্যাগ' নামে পরিচিত। এদের দুটোকে বোধবুদ্ধিহীন রোবট বলে মনে হলো কিরলনস্কির। হুকুম পেলে করতে পারে না এমন কাজ নেই।

অন্যজন, মাথায় নোংরা সোনালি চুল। ছুঁচোর মত চেহারা। পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। দলনেতা। এই চেহারা এবং প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে অনেক আগেই পরিচয় হয়েছে লুইস কিরলনস্কির। অসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। তাদের অবশ্য ইউনিফর্ম ছিল পরনে। কাজেই বাধা দেয়ার কোন চেষ্টাই করল না সে। জানে বাধা দিয়ে বা দয়া ভিক্ষা করে কোন লাভ নেই। ওরা যা করতে এসেছে তা করবেই।

ঠেলতে ঠেলতে সীটিংরুমে নিয়ে এল তারা কিরলনস্কিকে। ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিল একটা আর্মচেয়ারে। পিছনে গিয়ে দাঁড়াল একজন, লুইসের দু'হাত টেনে নিয়ে গেল পিছনে, ধরে থাকল শক্ত করে। আরেকজন সামনে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ বিশাল ডান হাতে 'চটাশ্' 'চটাশ্' ঘুসি মারছে বাঁ হাতের তালুতে। একটা টুল নিয়ে এসে লুইস কিরলনস্কির মুখোমুখি সামান্য ডানদিকে সরে বসল দলনেতা।

'মারো!' হুকুম দিল সে।

লুইসের নাকমুখ লক্ষ্য করে ভয়ঙ্কর শক্তিতে ঘুসি মেরে বসল সামনেরজন। তামার তৈরি পাঞ্জা পরে নিয়েছে সে কখন যেন, খেয়াল করেনি কিরলনস্কি। চোখের পলকে চেহারা পাল্টে গেল তার। সামনের দিকের উভয় পাটির দাঁত মাড়ি সব ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। ঠোঁট হাঁ হয়ে গেল কেটে। থুতনি বেয়ে দরদর করে গড়িয়ে নামতে লাগল তাজা রক্ত। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে পিছনে হেলে গেল মাথাটা তার বেকায়দা ভঙ্গিতে।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল ছুঁচো। 'ওখানে নয়, হাঁদা! ওকে দিয়ে কথা বলাতে হবে জানো না? নিচে মারো।'

এবার লুইসের বুকের দু পাশে রিবের ওপর সর্বশক্তি দিয়ে পর পর দুটো ঘুসি চালাল লোকটা। ভেতরের হাড় ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল পরিষ্কার। ভাঙা গলায় প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল কিরলনস্কি। আবার হেসে উঠল দলনেতা। ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে সে। এ জাতীয় দৃশ্য সব সময়ই আনন্দ দেয় তাকে।

গায়ের সবটুকু জোর এক করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল কিরলনস্কি। কিন্তু পিছনের হাত দুটো যেন লোহায় গড়া, নড়ানো গেল না একচুলও। এই সময় কথা বলে উঠল দলনেতা। 'তুমি মানুষটা ভাল নয়, লুইস। আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে খেপিয়ে তুলেছ তুমি। কার কাছ থেকে

পেয়েছ জিনিসগুলো?'

কুলি করে মুখ ভর্তি রক্ত আর গোটা চারেক দাঁত ফেলল লুইস। উত্তর দিল না।

'বলে ফেলো কার কাছ থেকে পেয়েছ জিনিসগুলো। যত তাড়াতাড়ি বলবে ততই তোমার মঙ্গল। তার আগে শুনে রাখো, রাউল লেভির খোঁজ পেয়ে গেছি আমরা।'

চোখ বুজল লুইস কিরলনস্কি। মুখ খোলার লক্ষণ নেই কোন।

রেগেমেগে পাঞ্জা পরা সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল ছুঁচোমুখো। আবার শুরু হলো ঘুসি বৃষ্টি। যতক্ষণ না নামটা উচ্চারণ করল সে, ততক্ষণ চলল নির্দয় মার। নামটা শোনামাত্র হাত তুলে আঘাতকারীকে থামতে বলল নেতা। পিছনেরজন হাত ছেড়ে দিল লুইসের। গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল মৃতপ্রায় জুয়েলার। দম নিচ্ছে ছোট ছোট। নীল হয়ে গেছে ঠোঁটের চার পাশ।

'হার্ট অ্যাটাক করেছে ব্যাটার,' বলল একজন। 'মরল বলে।'

'চলো, কেটে পড়ি।'

দ্রুত বেরিয়ে এল দলটা। দূরে রেখে আসা পুরানো একটা ভ্যানের দিকে চলল জোর পায়ে। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল মেলিণ্ডা। দু হাতে গোটা পাঁচেক ঢাউস শপিঙ ব্যাগ নিয়ে নিজের দামী মেট্রো থেকে বেরিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়াল। বাংলোর সামনের দরজা খোলা দেখে বেশ অবাক হলো সে।

দু' মিনিট পর ব্যস্ত হাতে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে দেখা গেল মেলিণ্ডাকে। কাঁদছে ঝর ঝর করে। ছয় মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল অ্যাম্বুলেন্স, রয়্যাল ফ্রী হাসপাতালের দিকে ছুটল মৃতপ্রায় লুইস কিরলনস্কিকে নিয়ে। তার এক হাত ধরে পাশে বসে থাকল মেলিণ্ডা। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসতে হঠাৎ করেই চোখ খুলল লুইস।

আঙুলের ইশারায় তার মুখের সামনে কান পাততে বলল সে স্ত্রীকে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে বসল মেলিণ্ডা। প্রাণান্তকর চেষ্টায় ফিস্ ফিস্ করে দু'চারটে শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো কিরলনস্কি। শুনে কপাল কুঁচকে উঠল মেলিণ্ডার। হতভম্ব হয়ে গেছে। অ্যাম্বুলেন্স হ্যাম্পস্টেড পৌছার আগেই মারা গেল লুইস কিরলনস্কি।

হাসপাতালের 'ডেড অন অ্যারাইভেল' রেজিস্টারে নাম উঠল তার। লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যবচ্ছেদের জন্যে। এর কয়েক মিনিট পর টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল জিম প্রেসটনের। ফোন ধরে আহাম্মক হয়ে গেল সে। ওপাশে একটি নারীকণ্ঠ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কথা বলতে পারছে না। অনেকক্ষণ লাগল মেলিণ্ডার নিজেকে সামলাতে। রয়্যাল ফ্রীর ক্যাজুয়ালটি অ্যাডমিশন থেকে ফোন করেছে সে।

তার বক্তব্য মন দিয়ে শুনল জিম প্রেসটন। ঘুমের রেশমাত্র অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে। 'ঠিক আছে, মেলিণ্ডা। অনেক ধন্যবাদ। আর…লুইসের জন্যে আমি খুব দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। ঝামেলা মিটিয়ে তোমার ওখানে আসছি আমি, কেমন? রাখলাম।'

রিসিভার রেখে কয়েক মুহূর্ত ভাবল প্রেসটন। তারপর বিরতি না দিয়ে দু জায়গায় দু'টো ফোন করল। তার মেশিন ওয়ার্কশপের দুই কর্মচারী, স্মিথ ও টাশকে। দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে পৌছল প্রেসটনের ওখানে। নির্দেশমত যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে। এর ঠিক ত্রিশ মিনিট পর নক্ হলো দরজায়।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রেসটন। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে শেষবারের মত দেখে নিল সঙ্গীদের অবস্থান। বুক ভরে বাতাস টানল, তারপর খুলে দিল দরজা। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল অমার্জিত, ইতর চেহারার দুই মাসলম্যান। পিছনে দলনেতা, সোনালি চুলের ছুঁচোমুখো। দ্রুত পিছিয়ে

এল জিম প্রেসটন, ছোট্ট করিডর পেরিয়ে সীটিংরূমে এসে দাঁড়াল। করিডরের একদিকে কিচেনের দরজা, অন্যদিকে কোট'স কাবার্ড।

সঙ্গীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে এল দলনেতা, চেঁচিয়ে পিছনের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিল। সশব্দে লেগে গেল দরজা। পরক্ষণেই বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো অল্প পরিসর করিডরে। কাবার্ড ও কিচেনের মুখোমুখি দরজা নিঃশব্দে বিস্ফোরিত হলো। প্রথম আঘাত হানল বিল টাশ। কিচেন থেকে বেরিয়েছে সে। ভারি একটা স্লাইড রেঞ্চ সজোরে বসিয়ে দিল সে ছুঁচোর এক স্যাঙাতের মাথার পিছনে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে।

বিপদ বুঝে অন্যজন পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘাড় ঘোরাতেই মাথার ওপর একটা নেইলবার তুলে ধরে অপেক্ষমাণ বিকট চেহারার রজার স্মিথকে দেখে জানের পানি শুকিয়ে গেল তার। ধাঁই করে ওটা তার মাঝ কপালে ঝেড়ে দিল স্মিথ। আঘাত পাওয়া জায়গাটা স্পর্শ করার জন্যে হাত তুলল সে, কিন্তু খানিক উঠেই থেমে গেল হাতটা। ঝুলে পড়ল শিথিল হয়ে। ঝপ্ করে বসে পড়ল সে, তারপর সটান শুয়ে পড়ল চিত হয়ে।

পরের দৃশ্যটা হলো দেখার মত। ঠিক তাড়া খাওয়া ছুঁচোর মতই দশা হলো ছুঁচোমুখোর। সঙ্গীদের দেহ টপকে টপকে দরজার সামনে পৌঁছে গেল সে দুই লাফে। খামচা-খামচি করছে দরজার গায়ে, হাতল ধরতে চাইছে। হাত বাড়িয়ে লোকটার স্কার্ফ মুঠো করে ধরল জিম প্রেসটন। পিছনে টেনে এনে দড়াম করে দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিল মুখের একটা পাশ।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক হেঁচকা টানে এ-পাশের দেয়ালে এনে ফেলল তাকে প্রেসটন। দেয়ালে ঝোলানো মোনালিসার বড় একটা কাঁচ বাঁধানো পোর্ট্রেটের ওপর পড়ল সে, কাঁচ ভেঙে গালের কয়েক জায়গায় গভীর ক্ষতের

সৃষ্টি হলো তার। বিল আর স্মিথ ওদিকে অজ্ঞান দুটোকে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে হতভম্ব দলনেতাকে সীটিংরূমের রাস্তার দিকে পিকচার উইণ্ডোর সামনে নিয়ে এল জিম প্রেসটন।

এক মিনিট পর তার ফ্ল্যাটের জানালা গলে দেহের অর্ধেকটা শূন্যে ভেসে পড়ল ছুঁচোর। বিল এবং রজার কোমর আর পা ধরে ঠেকিয়ে রেখেছে তার পতন। 'কার পার্কটা দেখতে পাচ্ছ নিচের?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল প্রেসটন।

ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল লোকটার। প্রেসটনের এখানে আসতে চায়নি সে প্রথমে। লুইস কিরলনস্কির ওখান থেকে বেরিয়ে ডেরায় ফিরে যাওয়ার পথে থেমে ওদের নিয়োগকর্তাকে টেলিফোনে প্রেসটনের নামটা জানিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পারেনি। এ দায়িত্বটাও লোকটা গছিয়ে দিয়েছে তার ঘাড়ে। অবশ্য মোটা টাকার বিনিময়েই।

ওই লোভই কাল হলো শেষ পর্যন্ত। ওরা যত বড় মাস্তানই হোক, ইস্ট লণ্ডনের। এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অনাহূত। তাছাড়া যতই নির্দয় আর কসাই হোক না কেন, এসব সাউথ লণ্ডনারদের তুলনায় ওরা দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া কিছু নয়। এদের হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতার কেচ্ছা শুনলে শহরের অন্য সব এলাকার মাস্তানদের মত ওদের মাথাও চক্কর খায়। বোঝা যাচ্ছে তেমনি এক দলের হাতেই ধরা খেয়েছে আজ ওরা কপাল দোষে।

দুঃখে চোখে পানি এসে পড়ার জোগাড় দলনেতার। আসার সময় ভেবেছিল এত রাতে কেউ কিছু টের পাবে না। কেউ জানবে না তাদের 'বর্ডার ক্রসিঙের' ব্যাপারটা। অথচ ঘটল কিনা উল্টো, পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে!

মাথা দোলাল দলনেতা, পাচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে তার কপালে। ঢোঁক গিলছে সে ঘন ঘন।

'ওখানে আছড়ে পড়ে লাশ হয়ে যাবে তুমি এখনই। দারুণ একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে।'

শিউরে উঠল সোনালিচুলো। 'না! প্লী-ই-জ! মেরো না আমাকে।'

'ঠিক আছে, মারব না। বিনিময়ে আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।'

'হ্যাঁ, দেব। সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

সীটিংরূমে নিয়ে আসা হলো লোকটাকে চ্যাঙদোলা করে। বসিয়ে দেয়া হলো মেঝেতে। প্রেসটন বসল তার মুখোমুখি একটা সোফায়। 'বুড়ো মানুষটাকে কেন খুন করলে তোমরা?' গলায় বিন্দুমাত্র রাগের আভাস নেই তার।

'কথা আদায় করতে গিয়ে...'

'কিসের কথা? কার হুকুমে?'

'একটা চোরাই জিনিসের কথা। ওটা নাকি তোমার কাছ থেকে পেয়েছে লোকটা, শুনলাম।'

'লোকটাকে যে তোমরা মেরে ফেলেছ, তা জানো?'

একটু থমকাল 'স্ন্যাগ'। 'দুঃখিত। লোকটার হার্টের অবস্থা জানতাম না।'

'কে গায়ে হাত তুলেছে ওর?'

'না। আসলে তেমন...'

'চড়াৎ' করে লোকটার ডান কানের ওপর প্রচণ্ড এক চড় বসাল জিম। 'শুয়োরের বাচ্চা! পুরো মুখ থেঁতলে গেছে লোকটার। চার-পাঁচটা রিব ভেঙে গেছে বুকের। কার হুকুমে করেছিস তোরা এসব!'

'নাম জানি না। টেলিফোনে নির্দেশ পেয়েছি আমরা। শুধু কাগজগুলো পেলেই...'

'কিগুলো?' হতভম্ব হয়ে গেল জিম প্রেসটন।

'কাগজগুলো।'

'কিসের কাগজ!'

'তা জানি না। ব্রিফকেসের মধ্যে ছিল। ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল প্রেসটন। মাথায় খেলছে না কিছু। অমন বহুমূল্য ডায়মণ্ড বাদ দিয়ে কয়েকটা কাগজ...। 'ওগুলো নেই। ফিরে গিয়ে তোমার বেশ্যার বাচ্চা নিয়োগকারীকে বলবে, ব্রিফকেসটা পুড়িয়ে ফেলেছি আমি। ওর মধ্যে কাগজ-টাগজ ছিল কি না জানি না আমি। ঠিক আছে?'

জোরে জোরে মাথা দোলাল লোকটা। 'হ্যাঁ।'

'হারামজাদাগুলোকে ওয়াটারলু ব্রিজ পার করে দিয়ে এসো,' বিল এবং স্মিথের উদ্দেশে বলল জিম প্রেসটন। আরেকটা চড় কষাল ছুঁচোর গালে। 'জীবনে আর কখনও ভুলেও যদি দক্ষিণ লণ্ডনে পা রেখেছিস, সেদিনই হবে তোর শেষ দিন। মনে থাকবে কথাটা?'

ভদ্রলোকের মত সম্মতি জানাল লোকটা। 'থাকবে।'

'যা, মড়াখেকোর বাচ্চা!'

ঠেলে গুঁতিয়ে ওদের তিনটেকে দরজার কাছে নিয়ে গেল বিল আর রজার। আহত দুটো চাপা গলায় কাতরাচ্ছে। পিছন থেকে ডাকল জিম। ছুঁচোমুখোকে দেখিয়ে বলল, 'আমার হয়ে ওকে কিছুদিন মনে রাখার মত শুভেচ্ছা জানিয়ে দিয়ো। বুড়োর আত্মা খানিকটা শান্তি পাবে তাতে।'

হাসি ফুটল দাগী দুই সাউথ লণ্ডনারের কাটাকুটি ভরা মুখে। 'অবশ্যই। ভাববেন না,' বলল বিল টাশ।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে কিচেনে চলে এল প্রেসটন। কড়া করে এক কাপ এসপ্রেসো বানাল। আজ রাতে আর ঘুম আসবে না ওর কিছুতেই। কাজেই অহেতুক শুয়ে গড়িয়ে পিঠ ব্যথা না করে খানিক চিন্তা ভাবনা করা যাক।

কাপ নিয়ে বেডরুমে এসে বসল সে। ব্রিফকেসের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ আছে? ওগুলো উদ্ধার করার জন্যে ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছে ওর মালিক? কিসের কাগজ? কি করে জিমের সন্ধান পেল লোকটা?

তার কাছে ডায়মণ্ড নয়, কাগজগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ? গোপন জায়গা থেকে ব্রিফকেসটা বের করল জিম প্রেসটন। ভেতরটা ফাঁকা, জানা আছে তার। অর্থাৎ আর কিছু থেকে থাকলে আছে ওটার কোন ফলস্ কম্পার্টমেন্টে। এই সম্ভাবনার কথা ভুলেও ভাবেনি সে আগে।

এবার পেশাদার ক্র্যাকস্‌ম্যানের মত ব্রিফকেসটা পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করল জিম। এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলল ব্যাপারটা। আছে! দুই চুমুকে ঠাণ্ডা হয়ে আসা পানীয়টুকু ভেতরে চালান করে দিল প্রেসটন। তারপর একটা কাগজ কাটা ছুরি নিয়ে লেগে পড়ল কাজে। ছ' মিনিট পর শিস্ বাজাল সে ঠোঁট গোল করে। খুলে গেছে ফলস্ বেইস। ভেতর থেকে বের হলো দশটা ফটোকপি শীট।

সরকারী কাগজপত্রের ব্যাপারে খুব একটা জ্ঞান নেই জিম প্রেসটনের। তবে ওগুলোর মাথায় মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের ছাপ এবং বড় অক্ষরে লেখা 'টপ সিক্রেট' কথাটার অর্থ বুঝতে দেরি হলো না বিন্দুমাত্র। আনমনে শিস্ বাজিয়েই চলেছে প্রেসটন। ব্রিফকেসের মালিকের পেশাগত পরিচয় খুব ভাল করেই জানে সে। ওরকম একজন সম্মানিত পদস্থ কর্মকর্তা...না কি এর মধ্যে দোষের কিছু নেই?

বড় অফিসাররা অফিসের কাজ কখনও কখনও বাসায় বসেও করে থাকেন ফাইল-পত্র নিয়ে এসে। এক্ষেত্রেও কি সে রকম কিছু...? না, প্রবলবেগে মাথা দোলাল জিম। হতে পারে না। হলে অবশ্যই ব্যাপারটা পুলিসকে জানানো হত এতদিনে। টিভি-পত্রিকায় গ্রেন ডায়মণ্ড চুরি হওয়ার

খবর প্রকাশ হত। তাহলে? কাগজগুলো নিয়ে কি করা যায় ভাবতে বসল প্রেসটন।

ঠিক যেন ফণাতোলা বিষধর সাপ দেখছে খুব কাছ থেকে, এমন চেহারা করে কাগজগুলোর দিকে চেয়ে আছে গিলটি মিয়া। মুখোমুখি গালে হাত দিয়ে বসা জিম প্রেসটন। রাতেই কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে গিলটি মিয়ার সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে। সংস্কারাচ্ছন্ন জিমের দৃঢ় বিশ্বাস, ওস্তাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়েছিল বলেই ডায়মণ্ডগুলো চুরি করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে।

সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে তার সতর্কবাণী। চোরাই মাল দেখেই গিলটি মিয়া তাকে সাবধান করে বলেছিল, এর মধ্যে অশুভ কিছু আছে। কাজেই তার সঙ্গে কথা না বলে ওগুলো নষ্ট করা ঠিক হবে না বলে রেখে দিয়েছিল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে গিলটি মিয়া, একটা শীটও স্পর্শ করেনি কেন যেন।

'কি নাম বললি এর মালিকের?' ব্রিফকেসটা দেখাল সে ইঙ্গিতে।

'রবার্ট ফিলবি। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির বড় অফিসার।'

'হুঁম!' ঠোঁট মুড়ে আরও খানিক ভাবল গিলটি মিয়া। 'খালি হাতে ছুঁস্‌নি তো কাগজগুলো?'

'ছুঁয়েছি, ওস্তাদ। তখন আসলে অত ভেবে দেখিনি। ঝোঁকের মাথায়...।'

'ঠিক করিস্‌নি, ভাবা উচিত ছিল। ফিলবি লোকটা বিশ্বাসঘাতক, বেঈমানি করচে দেশের সাতে কুনো সন্দেহ নেই। নিচ্চয় এগুলোয় হারামজাদার হাতের ছাপ পাওয়া যেত খুঁজলে। কিন্তু তুই ধরেই ঝামেলা

পাকিয়ে ফেললি। যাক্‌গে, এগুলো নিয়ে একন কি করবি ঠিক করেছিস্‌?'

'আমি ওসব বুঝি না, ওস্তাদ। আপনি যা বলেন তাই হবে।'

যেন এমন কিছু শোনার অপেক্ষায়ই ছিল গিলটি মিয়া। কাগজগুলো কাছে টেনে নিয়ে এল সে হাতে ধরে।

'করেন কি, ওস্তাদ, করেন কি! আপনার হাতের ছাপ...'

'চুপ থাক্‌! ম্যালা ফ্যাঁচফ্যাঁচ করিস্‌নে। এক টুকরো কাপড় লিয়ে আয় দিকিন!'

বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ পালন করল জিম প্রেসটন। ঝুঁকে বসে কাজে লেগে পড়ল গিলটি মিয়া।

পাঁচ

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। দু'হাতে কপালের দু'পাশের রগ চেপে ধরে বসে আছেন সংস্থার প্রধান, স্যার মারভিন লংফেলো। দৃষ্টি উদভ্রান্ত। সামনে বিছিয়ে রাখা কাগজগুলোর ওপর মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে, কিন্তু পারছেন না। সারা দেহ কাঁপছে বৃদ্ধের, দুর্বল বোধ করছেন। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কপালের রগ ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়।

কাগজগুলো একটু আগে পৌঁছেছে লংফেলোর টেবিলে। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে। বাদামি রঙের পুরু খামে। ওপরে ফেল্ট টিপ্‌ পেনে আঁকাবাঁকা অক্ষরে তাঁর নাম এবং সংস্থার ঠিকানা লেখা। লেখার ধরনটা

আকৃষ্ট করেছিল লংফেলোকে। তাই আগ্রহ নিয়ে ওটাই প্রথমে খুলেছিলেন। পরমুহূর্তে চোখ কপালে উঠে গেছে, হাঁ করে ভেতর থেকে বেরোনো কাগজগুলোর দিকে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ তখন থেকে। সাধারণ খামে, নিয়মিত ডাকে এসব 'টপ্ সিক্রেট' ডকুমেন্ট আসতে পারে, ব্যাপারটা তাঁর কল্পনারও অতীত।

এগুলো কে পাঠাল, সে কোথায় পেল, কি করা যায় এ ব্যাপারে, কি করা উচিত ইত্যাদি হাজারো দুশ্চিন্তায় দিশেহারা অবস্থা লংফেলোর। মাথা খারাপ হওয়ার দশা প্রায়। ঘোলা চোখে আবার কাগজগুলোর ওপর নজর বোলালেন তিনি। নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল এগুলো। পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের ওপর সোভিয়েত সামরিক হুমকি প্রতিহত করার কনটিঞ্জেন্সি প্ল্যান। অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

শেষবারের মত কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখলেন লংফেলো। খালি হাতেই নাড়াচাড়া করছেন, কারণ প্রথমবারই গুরুত্ব না বুঝে ছুঁয়ে ফেলেছিলেন তিনি ওগুলো। কাঁপা হাতে শীটগুলো গোছালেন বৃদ্ধ একটা একটা করে, যথাসম্ভব আলগোছে। এমন সময় ইন্টারকম বেজে উঠল। 'মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন, স্যার।'

'রানা!' অথৈ সমুদ্রে পড়া মরণাপন্ন মানুষ ডুবে যাওয়ার আগমুহূর্তে যেন জীবনতরীর সন্ধান পেয়েছে। তড়াক করে আসন ছাড়লেন লংফেলো। কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'শো হিম ইন, প্লীজ!' দ্রুত পা বাড়ালেন দরজার দিকে। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। সামনেই দাঁড়িয়ে স্যুটেড বুটেড মাসুদ রানা।

'রানা!' ইংরেজি কেতা ভুলে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ। 'কংগ্রাচুলেশনস! মাই বয়, কংগ্রাচুলেশনস!'

'ধন্যবাদ, স্যার।' অনেক কষ্টে লংফেলোর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল ও।

'এসো এসো, বোসো। তোমার এজেন্সি ফ্রি ইনভেস্টিগেশন লাইসেন্স পাওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি, রানা। আয়্যাম সো হ্যাপি।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এ ব্যাপারে বিএসএস এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমার জন্যে যা করেছেন, সেই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না আমি।'

'শুধু শুধু বাড়িয়ে বলছ তুমি, রানা। বরং তোমার ঋণই আমরা শোধ করতে পারব না কোনদিন। প্রচুর করেছ তুমি বিএসএস-এর জন্যে। তোমাকে সাপোর্ট দিয়ে সেই ঋণই খানিকটা শোধ করলাম এই সুযোগে। সে যাক, বলো, তোমার নেক্সট প্রোগ্রাম কি?'

'আপাতত ঢাকায় ফেরা।'

'তাই?' চেহারা নিষ্প্রভ হয়ে গেল লংফেলোর। 'কবে যেতে চাইছ?'

'আজ রাতেই, স্যার।'

'আজই?' পুরোপুরি হতাশ হলেন বৃদ্ধ। ওর আসার খবরে যার-পর-নাই খুশি হয়েছিলেন, ভাবছিলেন সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু ও চলে যাচ্ছে শুনে সিদ্ধান্তটা পাল্টালেন লংফেলো। না, থাক। তাতে রানা ভাববে, সাহায্য করার প্রতিদান হিসেবে ওর ঘাড়ে কায়দা করে নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

'খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?'

'চিন্তা? হ্যাঁ, না মানে তেমন...।' খেই হারিয়ে থেমে পড়লেন লংফেলো।

'নতুন কোন ঝামেলা?'

খানিক আমতা আমতা করলেন তিনি। বলবেন, কি বলবেন না, ঠিক

করতে পারছেন না। কিন্তু মাসুদ রানা এক দৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে, এ অবস্থায় না বলে থাকাও সম্ভব নয়। যা হয় হোকগে, ভাবলেন বৃদ্ধ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, রানা। ঝামেলাই। বেশ অভাবনীয় ঝামেলা। কি করে যে এ থেকে উদ্ধার পাব বুঝতে পারছি না। আগে এই কাগজগুলোয় চোখ বোলাও, তারপর শুনো,' ফটোকপিগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

দুটো শীট দেখেই মুখ তুলল রানা। 'ন্যাটো ডকুমেন্ট!' ভুরু কুঁচকে উঠেছে ওর। 'এসব আপনার কাছে কেন?'

'সে প্রশ্ন তো আমারও, রানা।'

'বুঝলাম না।'

অল্প কথায় ঘটনাটা খুলে বললেন লংফেলো। 'প্রত্যেকটা হাইলি ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট। কি করে হোয়াইটহলের বাইরে এল, কার মাধ্যমে, বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে এসব। ফলে কী পরিমাণ ক্ষতি হলো ব্রিটেন এবং তার ন্যাটো মিত্রদের অনুমান করাও অসম্ভব। সবচে' বেশি যেটা ভাবাচ্ছে আমাকে, তা হলো হোয়াইটহল থেকে এগুলোর বাইরে আসার ব্যাপারটা। এ অবিশ্বাস্য! বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ছাড়া কোনমতেই এসব ডকুমেন্টের বাইরে আসার কথা নয়, রানা।'

'বিশেষ ব্যবস্থাটা কি?'

'প্রয়োজন পড়লে সীল করা ব্যাগে, কড়া সিকিউরিটির মাধ্যমে হোয়াইটহলের বাইরে আসতে পারে এগুলো। শুধুমাত্র ফরেন অফিস আর কেবিনেট অফিসে যাওয়ার জন্যে। আর কোথাও নয়। তাও খুব কম, খুবই কম।'

'এই আসা-যাওয়ার পথেই কেউ হয়তো ওগুলো বের করে ফটোকপি করিয়ে নিয়েছে সিকিউরিটিকে টাকা খাইয়ে, হতে পারে না?'

'পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাগের সীল ভাঙতে হবে, যা আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কারও পক্ষেই, এবং সীলে কোন অস্বাভাবিকতা থাকলে ফরেন বা কেবিনেট অফিস তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করবে আমাদের কাছে। কিন্তু তেমন কোন রিপোর্ট কখনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কালপ্রিট নিশ্চয়ই এতজনকে ঘুষ খাইয়ে...মানে, তা সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ সীল করা এবং ভাঙা, উভয় সময়ই চারজন করে সচিব পর্যায়ের হাই অফিশিয়াল সামনে উপস্থিত থাকেন।'

সেক্ষেত্রে সত্যিই সম্ভব নয়, মনে মনে স্বীকার করল মাসুদ রানা।

'আবার ধরো, কেউ ডকুমেন্টগুলো বাসায় বসে স্টাডি করবে বলে নিয়ে গেছে; তাও সম্ভব নয়। এ ধরনের নিয়ম নেই। বাকি থাকে একটাই বিকল্প। কখনও কখনও এসব স্টাডি করে দেখার জন্যে বড় বড় অফিসারদের টেবিলে দেয়া হয়। আমার বিশ্বাস, সেই সুযোগটাই কেউ নিয়েছে। গোপনে ফটোকপি করিয়েছে সুযোগ বুঝে, তারপর অফিসেরটা অফিসে ফিরিয়ে দিয়েছে। চোর যে-ই হোক, সচিব পর্যায়ের নিচে নয়।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল মাসুদ রানা। 'এখানে পৌঁছার আগে কয় হাত ঘুরেছে খামটা?'

'সর্টিং অফিসে দু'চারহাত ঘুরেছে নিশ্চয়ই। তারপর পোস্টম্যান, যে ডেলিভারি দিয়ে গেছে।'

'ভেতরের ওগুলো আপনি ছাড়া আর কেউ দেখেছে?'

'নাহ, আমিই খুলেছি খাম।'

'যে হাতিয়েছে, খুঁজলে হয়তো তার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে এতে,' অন্যমনস্কের মত বলল রানা। খেয়াল করেছে ও, দশটা ডকুমেন্ট একই মাসে প্রস্তুত করা হয়েছে, দশটা বিভিন্ন তারিখে, প্রায় পুরো মাস ধরে। সবগুলো হাতানোর জন্যে পুরো মাস চলেছে চৌর্যবৃত্তি। কারণ প্রতিটি

দলিল হাইলি ক্লাসিফায়েড। সাংঘাতিক গুরুত্ববহ, অবশ্যই ন্যাটোর প্রতিপক্ষের জন্যে।

'ঠিক বলেছ,' মাথা দোলালেন লংফেলো। 'ল্যাবে পাঠিয়ে দেখা যাক, কি ফল হয়।'

দলিলগুলো যে-ই পাঠিয়ে থাকুক এখানে, সে কোথায় পেল? ভাবল মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই পথেঘাটে কুড়িয়ে নয়, তাহলে?

ওগুলো ল্যাবে পাঠানো হলো। এক ঘণ্টা ধরে সবকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল চীফ টেকনিশিয়ান, তারপর হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকাল উপস্থিত লংফেলো ও মাসুদ রানার উদ্দেশে। 'দুঃখিত, স্যার। আপনাদের দুজনের ছাড়া আর কারও প্রিন্ট নেই। তবে ছিল, কোন সন্দেহ নেই।'

'মুছে ফেলা হয়েছে?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'রাইট, স্যার। কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে। ফাইবারের বসে যাওয়া দাগ বোঝা যায় পরিষ্কার।'

মস্কোর পশ্চিমে, উসপেনস্কো ব্রিজ পেরিয়ে কিছুদূর এগোলেই মস্কভা নদীর তীর ঘেঁষে চোখে পড়বে দাচা কমপ্লেক্স। কয়েক হাজার একর জুড়ে সাজানো-গোছানো, নয়নাভিরাম অসংখ্য কৃত্রিম গ্রাম। একটার পর একটা, গুণে শেষ করা যায় না। প্রতিটি দাচা বার্চ আর পাইনঘেরা। কর্মকর্তাদের শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে ওগুলোর আকার।

নামকরা শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং সামরিক বাহিনীর বড় বড় অফিসারদের দাচা পেরেদেলকিনোয়। এগুলোর আকার এবং গঠনশৈলি মোটামুটি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পলিটব্যুরোর সদস্যদের নিচের কর্মকর্তাদের দাচা ঝুকভকায়। এগুলো মোটামুটির থেকে যথেষ্ট বড় আর উন্নত। এর পরেরগুলো উসভোয়। সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যদের দাচা।

এগুলোর আকার, সৌন্দর্য আর জৌলুসের ছড়াছড়ি এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর। সবশেষে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের প্রধানের দাচা। ওটাও উসভোতেই।

রাশিয়ায় দাচা বলা হয় গ্রামের বাড়িকে। সেই দাচার সঙ্গে এই দাচার কোন মিলই নেই। শ' শ' আকাশছোঁয়া বার্চ আর পাইনঘেরা প্রতিটি দাচার পাহারায় রয়েছে সাদা পোশাকের নাইনথ্ ডিরেক্টরেট বা ক্রেমলিন গার্ড বাহিনী। ভ্লাস্তিদের নিরাপত্তা রক্ষায় সদা প্রস্তুত।

এখানেই ইনটেনসিভ সেশনে বসছে রোজ অ্যালবিয়ন কমিটি। দিন-রাত মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা প্রেসিডেন্টের অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে।

চিন্তায় পড়ে গেছে রানা মারভিন লংফেলোর সমস্যাটা নিয়ে। ও যদি ব্যাপারটা না জানত, কোন কথা ছিল না। নিশ্চিন্তে রওনা হয়ে যেতে পারত ঢাকার পথে। কিন্তু জানতে গিয়েই বিপদ বাধিয়ে ফেলেছে ও। জেনে শুনে মুখ বুজে থাকা যায় না, অন্তত বিএসএস না হোক, লংফেলোর কথা ভেবে হলেও একটা কিছু করা উচিত। এই 'একটা কিছু' যে কি, তা নিয়েই চিন্তায় পড়ে গেছে মাসুদ রানা।

রানা এজেন্সির ফ্রি ইনভেস্টিগেশন লাইসেন্স পাওয়ার ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছেন ওকে বৃদ্ধ। এই লাইনের সবাই যখন রানার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তখন লংফেলোই নিয়েছিলেন ওর পক্ষ। সতীর্থদের ভ্রূকুটি, অনুযোগ কিছুই গায়ে মাখেননি। সেই মানুষটি এতবড় বিপদে পড়েছেন জেনেও কি করে যায় রানা? বিবেক সায় দেয়নি। তাই যাত্রা কয়েকদিন পিছিয়ে দিয়েছে ও। যদিও লংফেলো মুখে বলেননি, কিন্তু ওঁর চোখ দেখেই রানা বুঝে নিয়েছে কি চাইছেন তিনি মনে মনে। আশা করে আছেন, ডকুমেন্টগুলো চুরি রহস্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব ও নিক।

কিন্তু বলতে পারছেন না। কেন পারছেন না, বোঝে মাসুদ রানা। বললে ও অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। ভাবতে পারে, ওকে সাহায্য করে তার প্রতিদান চাইছেন লংফেলো। তাই ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারেননি। ওদিকে গিলটি মিয়াও পড়েছে সমস্যায়। সবকিছু ঠিকঠাক, অথচ শেষ সময় রানা মন পাল্টাল কেন ভেবে পাচ্ছে না। একবারই বাইরে গিয়েছিল আজ রানা। কোথায়, জানে গিলটি মিয়া। ওটাই হয়েছে সমস্যা। বারবার প্রেসটনের চুরি করা ব্রিফকেসের কাগজগুলোর কথা মনে আসছে।

কাগজগুলো গিলটি মিয়া নিজ হাতে বিএসএস-এর ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়েছিল। তখন আসলে এতটা ভেবে দেখেনি সে। মাথায় ছিল ওগুলো সঠিক স্থানে পৌঁছে দেয়ার চিন্তা। এখন তার মনে হচ্ছে, ওটাই মাসুদ রানার যাত্রাবিরতির কারণ। অনেকক্ষণ থেকেই রানার আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে সে কারণে-অকারণে। ব্যাপারটা খুলে জানাতে চায় ওকে। কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তাছাড়া রানাও চিন্তিত। হঠাৎ করেই সুযোগটা পাওয়া গেল। নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরাল।

'তুমি কিছু বলবে, গিলটি মিয়া?' ঘোরাঘুরি করছে লোকটা, নজর এড়ায়নি রানার।

মাথা চুলকাল গিলটি মিয়া। 'স্যার, মানে একটা কতা...'

'কি কতা তাড়াতাড়ি বল। আমি ব্যস্ত।'

'ভেবেচেন আমি তা বুজিনি? ওসব আমি, স্যার, খুব...।' রানাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে প্যাচাল থামাল গিলটি মিয়া। 'মানে ক্যালকাটার আমার এক সাকরেদ...।'এবারও থেমে পড়তে বাধ্য হলো সে টেলিফোন বেজে উঠতে। মাসুদ রানার টেবিলের লাল ফোনটা। থাবা চালাল রানা রিসিভার লক্ষ্য করে, অন্য হাতে গিলটি মিয়াকে অপেক্ষা করতে বলল।

'হ্যালো!'

'রানা?' জলদগম্ভীর চিরপরিচিত গলাটা চিনতে পারা মাত্র বুকের রক্ত ছলকে উঠল ওর। ঢাকা থেকে বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল রাহাত খান (অবসরপ্রাপ্ত)।

'জ্বি, স্যার,' সিধে হয়ে বসল ও। চট করে হাতঘড়ির ওপর নজর বুলিয়ে নিল। বিকেল চারটা। তারমানে ঢাকায় রাত দশটা। বাসা থেকে করেছে নিশ্চয়ই বুড়ো। কি এমন জরুরি...।

'কেমন আছো?'

'জ্বি, ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, ভাল। তোমার ফ্রি ইনভেস্টিগেশনের লাইসেন্স পাওয়ার খবর শুনলাম। কংগ্রাচুলেশনস।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' জিভ কাটল মাসুদ রানা। খবরটা ওর নিজেরই দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু নানান ঝামেলায় দিতে পারেনি।

'তোমার ফ্লাইট ক'টায়। রওনা হচ্ছো আজ?'

'না, স্যার। একটু ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি, স্যার। বিএসএস-এ হঠাৎ করে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু ন্যাটো ডকুমেন্ট...'

'আমি শুনেছি, রানা। কথা হয়েছে লংফেলোর সঙ্গে। তা ইয়ে, ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছ কিছু?'

'ভাবছি এখনও, স্যার। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। এই কারণেই যাওয়া পিছিয়ে দিয়েছি।'

'ভালই করেছ। আমার মনে হয় এ সময় লংফেলোকে খানিকটা সাহায্য করা গেলে মন্দ হত না। যথেষ্ট করেছে ও তোমার জন্যে।'

'আমিও তাই ভাবছি, স্যার।'

'গুড।'

'এ ব্যাপারে স্যার লংফেলো আপনাকে কোন অনুরোধ করেছেন,

স্যার?'

'না না। কেবল ঘটনাটা জানিয়েছে। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে ওকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম। তখন ঘটনাটা বলল লংফেলো। ও হয়তো লজ্জায় পড়ে গেছে। বলতে পারেনি আমি অন্য কোন কিছু মনে করে বসতে পারি ভেবে।'

'আমারও সেরকমই ধারণা, স্যার। অন্য সময় হলে ভদ্রলোক কাজটা করে দেয়ার অনুরোধ করতে দ্বিধা করতেন না। আপনি কি, স্যার, কাজটা নিতে বলছেন?'

'না, রানা। নেয়া না নেয়া তোমার ইচ্ছে। তবে আমার মনে হয় নিলে মন্দ হত না। অনেক সাহায্য করেছে তোমাকে লংফেলো।'

ভড়ং গেল না বুড়োর, ভাবল মাসুদ রানা। রাহাত খান মনে মনে ঠিকই চাইছেন কাজটা ও নিক। অফিশিয়াল কাজের বাইরে কাউকে কিছু করতে সরাসরি কখনোই বলেন না কট্টর বুড়ো। বলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, যাতে কেউ না ভাবে তার ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাইছেন তিনি। কৌশলটা মন্দ নয়। 'কাজটা তাহলে নিচ্ছি আমি, স্যার।' সোজাসুজি বললেই হয়, কাজটা নিয়ে নাও, তা নয়। গজ গজ করল ও মনে মনে।

'ভালই হয় তাহলে, রানা। লংফেলো খুব খুশি হবে।'

সব স্যার লংফেলোর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, নিজের যেন কোন অনুভূতি নেই। 'ঠিক আছে, স্যার। নিলাম আমি কাজটা।'

'ভেরি গুড। তো, রাখলাম তাহলে।'

'জ্বি। স্লামালেকুম।'

রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল। 'কি যেন বলছিলে তখন তুমি?'

'আমার এক সাকরেদের কতা, স্যার।'

'কোন লাইনের, থ্রী সেবেনটি নাইন?'

হেসে ফেলল গিলটি মিয়া রানা ওকে নকল করছে দেখে। 'জ্বি, স্যার।'

'কি হয়েছে তার?'

'ওর কিচু হোইনিকো।'

'তবে?'

'কদিন আগে এক বাসায় চুরি করতে গেছল ও। গতমাসের শেষ তারিকে।'

'একত্রিশে ডিসেম্বর?'

'জ্বি। ওর পচোন্দের ক'টা ডায়মন।'

'হুঁম! তারপর? ধরা পড়েছে?'

'না, স্যার। পেসটন ধরা পড়ার বান্দাই লয়।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। তাড়াতাড়ি শেষ করো। কাজ আছে আমার, বাইরে যাব।'

'আপনি যে কাজে যাচ্চেন, সেই ব্যাপারেই···মানে···।' থেমে মাথা চুলকাতে লাগল গিলটি মিয়া।

থমকে গেল মাসুদ রানা। 'সেই ব্যাপারেই মানে! তুমি জানো আমি কি কাজে যাচ্ছি?'

'জানি, স্যার। সকালে যেকেনে গিয়েচিলেন, সেকেনেই যাচ্ছেন আবার। কাগজগুনো কে পেটিয়েচে ওদের ঠিকানায়, তা···'

সিধে হয়ে গেছে রানা আগেই। তাজ্জব হয়ে চেয়ে আছে গিলটি মিয়ার দিকে। 'তুমি কি করে জানো ওগুলোর কথা?'

'লে হালুয়া! জানব না কেন, স্যার। আমিই তো পেটিয়েছি ওগুনো।'

'কি!' চোখ কপালে উঠল মাসুদ রানার।

'তবে আর বলচি কি! ভেবেচিলুম কেউ কিচু টের পাবে না। কিন্তুক

আপনাকে এই ঝামেলায় এঁটকে…জ্বি?'

'এদিকে এসো। বোসো আমার সামনে।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল গিলটি মিয়া। মাটি থেকে চার ইঞ্চি ওপরে ঝুলছে ওর পা জোড়া। স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ চেয়ারে বসলে এই অবস্থাই হয় লোকটার। রানাকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে খানিকটা ভড়কে গেছে যেন।

'খুলে বলো পুরো ঘটনা। একটিও বাড়তি কথা নয়। '

'জ্বি,' একান্ত বাধ্যগতের মত মাথা দোলাল সে।

'নাও, শুরু করো।'

শুরু করল গিলটি মিয়া। অভ্যেসবশে কয়েকবারই মুখ থেকে বাড়তি বেফাঁস দুই একটা শব্দ যে বেরোয়নি, তা নয়। তবে প্রতিবারই রানার নীরব শাসানি বেলাইন থেকে খুব দ্রুত লাইনে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে তাকে। এক সময় থামল গিলটি মিয়া।

উঁচু পিঠের রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। চোখ টেবিল ল্যাম্পের গোড়ায় বসানো সুইচের ওপর। অন্যমনস্ক। 'ওকে এখনই একবার নিয়ে আসতে পারবে আমার কাছে? কোন বাসা থেকে চুরি করেছে দেখিয়ে দেবে দূর থেকে।'

'নিশ্চয় পারব। কিন্তু… ।'

'ভয়ের কোন কারণ নেই। কোন ক্ষতি হবে না তোমার সাগরেদের। শুধু বাসাটা আমাকে দেখিয়ে দিলেই চলবে।'

'ঠিক আচে,' টুপ করে নেমে পড়ল গিলটি মিয়া। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজেকে বাহবা দিল রানা হাতে নেয়ার আগেই অর্ধেক সমস্যা আপনাআপনি সুরাহা হয়ে গেল বলে। এখন কায়দা করে ডকুমেন্ট চোরের

স্বীকারোক্তিটা আদায় করা গেলেই বাকি অর্ধেক সমাধা হয়ে যাবে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিরল গিলটি মিয়া। কি বলেছে জিম প্রেসটনকে, সে-ই জানে। নিশ্চিন্ত মনে চলে এসেছে। কিন্তু রানার অফিসরুমে পা দিয়েই মুখের চেহারা বদলে গেল প্রেসটনের। আইনের লোক চিনতে ভুল হয় না তার। থেমে পড়ল সে মাসুদ রানাকে দেখে। চাপা স্বরে বলে উঠল, 'এই ছিল তোমার মনে, ওস্তাদ?'

'চুপ কর! ম্যালা ম্যালা কতা বলিস। স্যার, এই আমার সাকরেদ।'

'জিম প্রেসটন?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা। বুঝে ফেলেছে লোকটার মনোভাব।

'জ্বি, স্যার।'

'বোসো।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে ওস্তাদের দিকে তাকাল প্রেসটন। খেঁকিয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'কলাগাচের মতন ডেঁড়িয়ে আচিস যে তবু?'

এগিয়ে এসে রানার মুখোমুখি বসল প্রেসটন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। 'যে বাসা থেকে ডায়মণ্ড চুরি করেছ, সে বাসাটা আমাকে শুধু চিনিয়ে দেবে তুমি। ঘাবড়াবার কিছু নেই, তোমার কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছি না আমি।'

উত্তর দেয়ার আগে আরেকবার গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল প্রেসটন।

'ভয় পাসনে। কুনো ক্ষতি হবে না তোর। স্যার খুব দয়ালু মানুষ। শুদু বাসাটা দেকিয়ে দিয়েই তুই খালাস। বুজলি?'

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিম প্রেসটন। 'আচ্ছা।'

'আরে, রানা!' অবাক হয়ে গেলেন লংফেলো। 'তোমার না আজই চলে যাওয়ার কথা?'

'ছিল। কিন্তু পরে আরও কিছুদিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' হাসছে রানা।

'কেন?'

'ঠিক করেছি কাজটা শেষ করেই ফিরব।'

চশমাটা ঠেলে ওপর দিকে তুললেন বৃদ্ধ। আরও একটু ভাল করে তাকালেন ওর দিকে। 'কোন কাজ?'

'ন্যাটোর ডকুমেন্টস চোরকে ধরা।'

'তুমি সিরিয়াস, রানা?'

'অবশ্যই।'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল বৃদ্ধ লংফেলোর। 'গড ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড।'

ছয়

ডোরবেলের আওয়াজে রবার্ট ফিলবি নিজেই দরজা খুললেন। সামনে দাঁড়ানো প্রায় তাঁর সমান লম্বা নিষ্ঠুর চেহারার যুবকের দিকে চেয়ে থাকলেন বিমূঢ়ের মত। চেহারাটা খুবই পরিচিত মনে হলেও চিনতে পারছেন না। হাতে একটা ব্রিফকেস যুবকের।

'গুড ইভ্‌নিং,' বলল আগন্তুক।

'ইভনিং?' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়েই আছেন রবার্ট ফিলবি।

হিপ পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল যুবক, তুলে ধরল চোখের সামনে। পরমুহূর্তে চেহারা বদলে গেল ফিলবির এবং একই সঙ্গে যুবককেও চিনে ফেললেন। মনের ভেতর বেজে উঠল বিপদের ডঙ্কা। এ লোক কি চায় আমার কাছে? ভাবলেন ফিলবি। 'মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ভেতরে আসতে পারি?' গমগমে কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা। প্রথমেই লোকটার মনে ভয় এবং দ্বিধা ঢুকিয়ে দিতে চায় ও। এতে বাকিটা সহজ হয়ে যাবে।

'নিশ্চই। আসুন,' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন রবার্ট ফিলবি। তাঁর চোখের তারায় আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখল মাসুদ রানা। দরজা বন্ধ করার আগে একবার করিডরে উঁকি দিলেন তিনি। সম্ভবত ওর সঙ্গে আর কেউ আছে কি না দেখে নিলেন। ঘুরে জোর করে ফোটানো হাসি মুখে রানাকে সীটিংরূম নির্দেশ করলেন।

'লেডি ফেডোরা বাসায় নেই?' বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। ও ওর ভাইয়ের কাছে বেড়াতে গেছে। শেফিল্ডে।' ওর মুখোমুখি বসলেন ফিলবি। 'বলুন, কি উপকারে লাগতে পারি আপনার?'

সামনের দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। তারপর পুরো ঘরের ওপর। ঠিকই বলেছিল জিম প্রেস্টন। এ ঘরের ব্যাপারে তার দেয়া বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে। দেয়ালটা নিশ্চয়ই রিপেয়ার করিয়েছে লোকটা, ভাবল ও।

'মিস্টার রানা...!'

সরাসরি ফিলবির চোখে চোখ রাখল মাসুদ রানা। এমনভাবে চেয়ে থাকল যেন ঘোরের মধ্যে আছে। পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেসটা দু'হাঁটুর ওপর রেখে খুলল ও। ভেতর থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল সামনে। 'বলছি। তার আগে দয়া করে এগুলো দেখুন।'

নিলেন ওগুলো রবার্ট ফিলবি। দ্রুত চোখ বোলালেন প্রথম শীটটার ওপর। তারপর দ্বিতীয় শীট। তৃতীয় শীট। এই শীটটার মাঝামাঝি এসে থমকে গেল তাঁর দৃষ্টি। ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। 'এগুলো··· এগুলো··· ।'

'হ্যাঁ। প্লেন ডায়মণ্ডের সঙ্গে এগুলোও চুরি গিয়েছিল আপনার,' যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল মাসুদ রানা। 'কিন্তু চোর লোকটা বোঝা যায় ভালই। নষ্ট না করে দলিলগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল বিএসএসের ঠিকানায়। তাকে ট্রেস করতে পেরেছি আমরা এবং তার কাছ থেকেই পেয়েছি আপনার নাম।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বোবা-কালা বনে গেলেন রবার্ট ফিলবি। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে কেউ। অনেকক্ষণ পর গলায় স্বর ফোটাতে সমর্থ হলেন ফিলবি। 'এগুলো বিএসএসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে? কিন্তু আপনি···?'

'এ কেসের দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে, তাই।'

আবার দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন ফিলবি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ঝড়ের গতিতে কাজ করছে মাথা। 'অস্বীকার বা কথা লুকোবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, মিস্টার ফিলবি। ওর প্রতিটিতে আপনার অসংখ্য হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। আপনার ফলস কম্পার্টমেন্টওয়ালা ব্রিফকেসটাও বর্তমানে আমার হেফাজতে। অতএব বুঝতেই পারছেন, সব বলে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেক্ষেত্রে আমি হয়তো আপনার বাঁচার একটা উপায় বাত্‌লে দিতে পারব।' একগাদা মিথ্যে বলে গেল রানা।

চিন্তিত মুখে ডান জুলফির গোড়া চুলকালেন রবার্ট ফিলবি। চোখ মাটির দিকে। আমি শেষ হয়ে গেছি, ভাবছেন তিনি। সব শেষ। অর্থ-যশ, সম্মান-চাকরি, সব গেল। কি সাজা হবে তাঁর? আজকের পর এ মুখ কি করে

বাইরে দেখাবেন?

'মিস্টার ফিলবি, একটা মহল উঠেপড়ে লেগেছে আপনাকে গ্রেফতার করার জন্যে। ইন্টারোগেট করতে চায় আপনাকে। তারপর কি জুটবে আপনার ভাগ্যে জানেন? স্রেফ দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে। ক্রাউন কাউন্সিল বিন্দুমাত্র কৃপা দেখাবে না। মিডল-ক্লাস কারাগার জুটবে কপালে। বিচার হবে মিডল ক্লাস কোর্টে। সারাদেশ জানবে, দুনিয়া জানবে একজন ব্রিটিশ দেশদ্রোহীর পরিচয়, সেটা কি ভাল হবে?'

আরও একগাদা ডাঁহা মিথ্যে বলে গেল রানা গড়গড় করে। রবার্ট ফিলবিকে গ্রেফতার করলে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের আওতায় মামলা দায়ের করতে হবে। ওখানে কোন সমস্যা হবে না, হবে তার পরপরই। কোর্টে টিকবে না মামলা প্রমাণের অভাবে। মাসুদ রানা জানে, ফিলবিই হোয়াইটহল থেকে চুরি করেছে ডকুমেন্টগুলো। কিন্তু জানা আর কোর্টে তা প্রমাণ করা এক নয়। তাছাড়া কোর্টে মামলা উঠলেই জেনে যাবে প্রেস।

জানাজানি হয়ে যাবে সব। কিন্তু মাসুদ রানা তা হতে দিতে চায় না। ভয় দেখিয়ে গোপনে মুখ খোলাতে হবে রবার্ট ফিলবিকে। জানতে হবে কতদিন থেকে এ কাজ করছে সে। কাকে দিচ্ছে বা কোথায় পাঠিয়েছে চুরি করা ডকুমেন্ট, ন্যাটোর কতটা ক্ষতি এরইমধ্যে হয়ে গেছে। তারপর বিশেষ এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই বানচাল হয়ে যাবে ওর সাজানো হুক্।

'ওয়েল,' মুখ খুললেন রবার্ট ফিলবি। 'সবইতো জেনে গেছেন, আ...বলুন, আর কি জানতে চান।'

গোপনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রানা। আসন নেয়ার পরপরই কোটের ডান পকেটে রাখা মিনিয়েচার টেপ রেকর্ডারটির বোতাম টিপে দিয়েছিল ও। লোকটার স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে কিনা ভেবে এতক্ষণ খুব টেনশনে ছিল।

কেটে গেছে তা। 'কতদিন ধরে এসব গোপনীয় দলিলপত্র চুরি করছেন আপনি হোয়াইটহল থেকে?'

'এক বছরের কিছু বেশি হবে।'

'কেন করছেন। আই মীন, কাদের সরবরাহ করছেন আপনি এসব তথ্য?'

'সাউথ আফ্রিকানদের।'

'সাউথ আফ্রিকা!' আকাশ থেকে পড়ল মাসুদ রানা। 'সাউথ আফ্রিকা? ওরা কি করবে এসব দিয়ে?'

'ওদের বর্জন করে, একঘরে করে চরম বোকামি করেছে পশ্চিমা দেশগুলো। আহাম্মকের মত কাজ করেছে। চরম এক অনিশ্চয়তার মধ্যে, নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে প্রিটোরিয়াকে। ন্যাটো আর ওয়ারশ জোটের মধ্যে যদি কোনদিন বেধে যায় লড়াই, ওদের ছেড়ে কথা কইবে না কেউ, আই মীন, স্ট্র্যাটেজিক্যালি সাউথ আফ্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। আপনি নিশ্চই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ভুলে যাননি। সে যুদ্ধের মূল রণাঙ্গনই বলতে গেলে ছিল সাউথ আফ্রিকা এবং সাহারার দক্ষিণাংশ। কিন্তু আর যাতে সেরকম পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, সে জন্যে প্রিটোরিয়াও ন্যাটোর কন্টিঞ্জেন্সি প্ল্যানের অনুকরণে নিজেদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। ডকুমেন্টগুলো ওদের অনেক কাজে লাগবে বলে ওরা আমার সাহায্য চেয়েছিল।'

'এবং ওদের সাহায্য করা আপনি প্রয়োজন মনে করেছেন,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ।'

'অফিশিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

'যে উদ্দেশে আপনি ওদের সাহায্য করেছেন, ঠিক সেইমত কাজ প্রিটোরিয়া করেছে বা করছে কিনা, সে ব্যাপারে জানেন কিছু?'

'না।'

'না কেন, খোঁজ নেননি?'

'না।'

তাজ্জব হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার মুখ থেকে এসব কথা বেরোচ্ছে, কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

'বেশ। এবার বলুন, কার মাধ্যমে ওদেশে ডকুমেন্টস্ পাঠিয়ে আসছেন আপনি।'

'ডি অ্যাঙ্গাস। এখানকার সাউথ আফ্রিকান এমব্যাসির একজন ডিপ্লোম্যাট।'

'তথ্য পাচারের অনুরোধ প্রথমে কার কাছ থেকে পান আপনি, সরাসরি ওদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে, নাকি অ্যাঙ্গাসের কাছ থেকে?'

'অ্যাঙ্গাসের কাছ থেকে। সে আসলে এনআইএস রেসিডেন্ট।'

'এর সঙ্গে আপনার পরিচয় কখন কিভাবে হয়? আপনি যখন প্রিটোরিয়ায় পোস্টেড ছিলেন, তখন?'

মুখ তুললেন ফিলবি। 'আপনি জানেন কিভাবে?'

'আমাদের জানতে হয়। বলে যান, প্লীজ।' এখানে আসার আগে রবার্ট ফিলবির সার্ভিস রেকর্ড ফাইল ঘেঁটে এসেছে রানা হোয়াইটহলের রেকর্ড সেকশন চীফের সাহায্যে। ও নিজে, স্যার মারভিন লংফেলো এবং সেকশন চীফ ছাড়া আর কেউ জানে না ব্যাপারটা। ওতেই পেয়েছে রানা, প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারি হিসেবে বছর আড়াই ওদেশে ছিলেন ফিলবি।

'হ্যাঁ।'

'লোকটা সত্যিই এনআইএসের কি না, তাও নিশ্চই জানেন না আপনি, আই মীন, ফর শিওর?'

দ্বিধাগ্রস্তের মত মাথা দোলালেন তিনি। 'না, জানি না।' চেহারা দেখে মনে হলো একটু যেন থতমতও খেয়ে গেছেন। হয়তো ভাবছেন, এ প্রশ্নটা মনে জাগেনি কেন তাঁর এতদিন?

'ডি অ্যাঙ্গাসের সঙ্গে দেখা হয় প্রায়ই?' চোখ বুজে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। মাথায় অন্য লাইনের চিন্তা ঢুকেছে।

'কখনও কখনও। তবে খুব কম।'

'এই ডকুমেন্টগুলো কবে হস্তান্তর করেছেন তার কাছে?'

'মাস দুয়েক আগে।'

'ঠিক আছে। এবার মন দিয়ে শুনুন। লোকটার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখবেন আপনি আরও কিছুদিন।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ফিলবির। 'কি...?'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে সামনাসামনি হবেন না। কারণ আপনার মুখ দেখলেই সে অনুমান করে নেবে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সাবধান! খুব সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে এ ব্যাপারে। কোনমতেই যেন কিছু আঁচ করতে না পারে ডি অ্যাঙ্গাস। মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে অন্য আর যেভাবে পারেন, টেলিফোন বা আর কোন মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন, আপাতত। নিয়মিত অফিসে যাবেন। এতদিন যা যা করেছেন, ঠিক তাই করে যাবেন। এরপর আরেকটা কাজ করতে হবে আপনাকে।'

'কি কাজ?' আগ্রহের আতিশয্যে আধ ফুট এগিয়ে এলেন ফিলবি।

'সময় হলে জানবেন। মনে রাখবেন, যদি শেষ পর্যন্ত আমার কথামত চলেন, বেঁচে যাবেন আপনি। নইলে...।' কথা শেষ না করেই থেমে গেল

মাসুদ রানা। চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাগজগুলো আগেই ভরে রেখেছে ব্রিফকেসে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা। 'চললাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইলেন রবার্ট ফিলবি। কিন্তু সুযোগ দিল না ও। দেখেও না দেখার ভান করে বেরিয়ে এল দ্রুত পায়ে।

উসভো। প্রেসিডেন্টের দাচায় সমবেত হয়েছেন অ্যালবিয়ন কমিটির চার সদস্য। চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছে কমিটি। দাচার অবিশ্বাস্য রকম বড় এবং চোখ ধাঁধানো বিলাসের ছড়াছড়িতে ভরা সীটিংরুমে প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি বসেছেন সবাই। আজ আর বডিগার্ড নেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। কেবল মেজর কিরলভকে নিয়ে অত্যন্ত গোপনে মস্কো ত্যাগ করেছেন তিনি প্রয়োজন নেই বলে। দাচার গার্ড সংখ্যা প্রেসিডেন্ট মস্কো ত্যাগ করার কয়েক ঘণ্টা আগেই চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সঙ্গে ডজনখানেক ডগ হ্যাণ্ডলারও রয়েছে।

চার মণ ওজনের বিশালবপু ড. জোসেফ পাভলভ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকেই কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করেছেন অন্য তিন সদস্য। বলতে লাগলেন তিনি, 'মাননীয় কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা অত্যন্ত সুচতুর, নিশ্ছিদ্র এক নাশকতামূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছি। আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের বন্ধু, কমরেড জেনারেল মার্চেঙ্কোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে জিআরইউ পরিচালিত সর্বশেষ জনমত জরীপে দেখা গেছে, কনজারভেটিভরা লেবারদের চেয়ে প্রায় পনেরো শতাংশ এগিয়ে রয়েছে। পনেরো শতাংশ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। এর তিন শতাংশ এদিক-ওদিক হবে ধরেই নিয়েছি আমরা। ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের পড়ন্ত জনপ্রিয়তা হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে, ফলে

ব্যবধান যেরকম হবে বলে আশা করা হয়েছিল, তেমনটি হয়নি।

'সে যাই হোক, আমাদের এই পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তাহলে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, শতকরা আশিভাগ ভোট পড়বে লেবার পার্টির পক্ষে। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই পরিকল্পনার নাম দিয়েছি আমরা প্ল্যান অরোরা।'

একে একে বাকি তিনজনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল জেনারেল সেক্রেটারির নীল বাজপাখির দৃষ্টি। তারপর ড. পাভলভের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির ভঙ্গি করলেন তিনি। 'এবার তাহলে শোনা যাক আপনাদের প্ল্যান আরোরার বক্তব্য।'

'নিশ্চয়ই। কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

টাইপ করা প্ল্যান পড়তে শুরু করলেন ড. পাভলভ। এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে সাজানো হয়েছে ওতে যে ছোটখাট একটা বই-ই হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। মাঝে মাঝে চোখ তুলছেন প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না দেখার জন্যে। কিন্তু তাঁর থেকে অনেক অনেক বড় খেলার গ্র্যাণ্ড মাস্টার প্রেসিডেন্ট। বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়ার আভাসও বোঝা গেল না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা টানা বলে যাওয়ার পর থামলেন ড. পাভলভ। পড়া শেষ। অখণ্ড নীরবতা নেমে এল ঘরে। এক সময় মুখ খুললেন প্রেসিডেন্ট। 'এতে প্রচুর ঝুঁকি আছে। কি নিশ্চয়তা আছে যে আগের···অন্যান্য পরিকল্পনার মত এটাও ব্যর্থ হবে না?'

কোন পরিকল্পনার কথা বোঝাতে চাইছেন তিনি, প্রকাশ না করলেও অন্যরা বুঝে নিলেন। বছর তিনেক আগে সুইডেনে এক নাশকতামূলক প্রকল্পে হাত দিয়ে ফেঁসে গিয়েছিল কেজিবি। প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয়

সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে। প্রায় এক বছর লেগেছিল মস্কোর সে গেরো থেকে বেরতে। যদিও, এখনও মাঝেমধ্যে তা নিয়ে সুযোগ পেলেই খোঁচাতে ছাড়ে না পশ্চিমা মিডিয়া।

'উইথ অল রেসপেক্ট, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি, পুরো নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, ওটার সঙ্গে প্ল্যান অরোরার কোন তুলনাই চলে না। এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের, ব্যতিক্রমি। এর প্রতিটি বাঁকে বাঁকে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে ফল ব্যাক, কাটআউট। যে এর নির্বাহী অপারেটর হবে, তাকে হতে হবে টপ্ প্রফেশনাল। দেশের স্বার্থে বিনা প্রশ্নে নিবেদিতপ্রাণ। কোথাও কোন গণ্ডগোল যদি এত সাবধানতার পরও ঘটেই যায়, ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করতে হবে তাকে। এবং মৃত্যুর পর তাকে কেউ যেন সোভিয়েত স্পাই বলে সনাক্ত করতে না পারে, সেদিক থেকেও তাকে উপযুক্ত হতে হবে। খুঁজলে এমন লোক সংগ্রহ করা কঠিন হবে বলে আমি মনে করি না, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। যদিও,' থেমে নাক চুলকালেন ড. পাভলভ। 'প্ল্যান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে তারও মৃত্যু হবে, প্ল্যানেরই অংশ হিসেবে। অরোরায় কোন রকম লুজ এণ্ড রাখেনি অ্যালবিয়ন কমিটি।

'এর পরপরই আমাদের সাব-প্ল্যানের কাজ শুরু হবে। বিশ্ববাসীকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করানোর ব্যবস্থা করা হবে যে মস্কো নয়, এজন্যে দায়ী ওয়াশিংটন।'

মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন প্রেসিডেন্ট। দু মিনিট পর মুখ তুললেন। অন্য তিনজনের মতামত চাইলেন তিনি। 'প্ল্যান অরোরা কার্যকর করা সম্ভব?'

বিনা দ্বিধায় সম্মতি জানালেন সবাই। 'সম্ভব।'

ওঁদের সামনের গ্লাস টপ্ কফি টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে থাকা এক গাদা

ফাইল, ফোল্ডার দেখলেন প্রেসিডেন্ট। প্ল্যান আরোরার খসড়া এবং মূল পরিকল্পনা। মুখ তুলে সেদিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'প্ল্যানের সব খুঁটিনাটি এখানে আছে?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি,' বললেন জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো।

'এর বাইরে আর কিছুই নেই, টেপ রেকর্ডার বা ফেলে দেয়া কাগজ যাতে এসবের আর কোন তথ্য বা টুকিটাকি লেখা আছে, বেখেয়ালে ফেলে দিয়েছেন কেউ?'

'কিচ্ছু নেই,' জোর দিয়ে বললেন চার কমিটি সদস্য।

'সব রেখে যান আপনারা। ড. পাভলভ বাদে আর সবাই কাল থেকে যার যার স্বাভাবিক কাজে লেগে পড়ুন। ভুলে যান অ্যালবিয়ন কমিটি, প্ল্যান অরোরার কথা। গুড বাই, কমরেড্স্।'

আসন ছাড়লেন বাকি তিনজন। দরজার কাছের ক্লোক কাবার্ড থেকে যার যার গ্রেটকোট বের করে পরে নিলেন। মাথায় চাপালেন শাপকা। কেউ কারও চোখের দিকে তাকাচ্ছেন না। মিনিট তিনেক পর সামনের কোর্ট ইয়ার্ডে এক এক করে তিনটে চইকা লিমুজিন স্টার্ট নিল। নাক ঘুরিয়ে সার বেঁধে রওনা হলো বুলেভার্ডের দিকে। সামনের বার্চ আর পাইনের বন আলোকিত হয়ে উঠল তিন জোড়া শক্তিশালী হেডলাইটের আলোয়।

ভেতরে তেমনি বসে আছেন জেনারেল সেক্রেটারি। উপস্থিত আরেকজনের অস্তিত্ব ভুলে গেছেন যেন। অনেক, অনেকক্ষণ পর চোখে পলক পড়ল তাঁর দীর্ঘ সময় নিয়ে। এমন বেপরোয়া বিপজ্জনক এক প্ল্যান তৈরি করবে অ্যালবিয়ন, স্বপ্নেও কল্পনা করেননি তিনি। ঝুঁকি আছে, তেমনি সফল হওয়ার সম্ভবনাও ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেললেন তিনি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে হাত দিতে হবে। নির্বাচনের আর এক মাসও বাকি নেই।

'ড. পাভলভ, কাছে আসুন।'

রাগে কাঁপছেন স্যার মারভিন লংফেলো। 'এনআইএস?' চোখ গরম করে মাসুদ রানার দিকে চেয়ে আছেন, যেন সব দোষ ওর। 'এনআইএস ভর করেছে ফিলবির মত এক টপ্ ক্লাস অফিসারের কাঁধে?' বাঘের দৃষ্টিতে সামনে রাখা টেপ রেকর্ডারটির দিকে তাকালেন এবার লংফেলো। পরক্ষণেই করুণ হয়ে উঠল চেহারা। বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'ওহ্, মাই ল-অ-র্ড!'

এনআইএসের সঙ্গে খুব একটা অন্তরঙ্গতা নেই বিএসএসের, জানে মাসুদ রানা। যেটুকু আছে কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বার্থেই। জোহান্সবার্গে বিএসএসের একজন হেড অভ স্টেশন আছে। প্রিটোরিয়ার অনুমতি আছে তাতে। তেমনি লণ্ডনেও এনআইএসের একজন হেড অভ স্টেশন আছে, জানে বিএসএস। কিন্তু সে ডি অ্যাঙ্গাস নয়। ওটাই বৃদ্ধের রাগের কারণ। সে যদি সত্যিই এনআইএসের হয়ে থাকে, তাহলে হবে দু' নম্বর, বা তিন নম্বর, বা আল্লা মালুম কত নম্বর।

তার মানে চুক্তি ভঙ্গ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। চুক্তিতে উভয় দেশের একজন করে হেড অভ স্টেশন বিনিময়ের কথা থাকলেও তার প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে প্রিটোরিয়া। ভদ্রলোককে ঘন ঘন বুড়ো আঙুলের নখ দাঁতে খুঁটতে দেখে বলল রানা, 'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন, স্যার। মাথা গরম করে লাভ হবে না।'

'এতকিছুর পরও কি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখি, বলো?'

'ওদের চীফ, জেনারেল ডিয়েটার গেরহার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা

করুন। অ্যাঙ্গাস সত্যিই ওদের লোক কি না জানতে হবে আগে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন বৃদ্ধ। 'একটা বুদ্ধি দাও। যে-পথে এগোলে দ্রুত কাজ উদ্ধার করা যাবে।'

লণ্ডনের নির্দেশে জোহান্সবার্গের বিএসএস প্রতিনিধি পরদিন প্রিটোরিয়া গিয়ে দেখা করল জেনারেল গেরহার্ডের সঙ্গে। এবং জেনারেলের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল সেদিনই লণ্ডনে রিপোর্ট করল সে।

'জেনারেল বাইবেলের শপথ করে বলেছেন, ডি অ্যাঙ্গাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি,' বললেন লংফেলো। 'এ নামে কেউ নেই এনআইএসে। ছিলও না কোনকালে,' বলেই দুম্ করে ঘুসি মেরে বসলেন টেবিলে। 'আমি বিশ্বাস করি না! মিছে কথা বলছে লোকটা!'

'মনে হয় না,' শান্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। লোকটা যদি সত্যিই তাঁর সংস্থার হত, তাহলে বিএসএসের হাতে ধরা পড়ার আগেই তাকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতেন তিনি। অন্তত গতকাল বিএসএস প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু জেনারেল তা করেননি। এখনও বহাল তবিয়তে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডি অ্যাঙ্গাস।'

সাত

কেজিবির হেড অফিস মস্কো কেন্দ্রের দুই নম্বর দযেরঝিনস্কি স্কয়ারে হলেও এর বিভিন্ন ডিরেক্টরেট ছড়িয়ে আছে সারা শহরময়। ওখানে স্থানাভাবের কারণে। শহর বেষ্টন করা আউটার রিঙ রোড ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে, ইয়াসিনেভোয় তার এক শাখা, ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের হেড অফিস।

ভবনটি সাততলা। অ্যালুমিনিয়াম আর পুরু টিনটেড গ্লাস মোড়া ভবনটির সঙ্গে ইঁট-সিমেন্টের কোন সংশ্রব আছে দেখলে মনেই হয় না। ডিজাইন সর্বাধুনিক । ওর মাথায় শোভা পাচ্ছে বড় চকচকে এক স্টীলের বৃত্তের মাঝে তিন কোনা বিশিষ্ট নক্ষত্র। অনেকটা মার্সিডিজ গাড়ির লোগোর মত। এফসিডির প্রতীক ওই নক্ষত্র। শহরের বাইরে বলে সুবিধেই হয়েছে, এফসিডির, অন্যদের মত তাদের ওপর সারাক্ষণ নজরদারি করতে পারে না পশ্চিমা চোখ, বিশেষ করে সিআইএ।

গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেট শীর্ষে। বাইরে তো বটেই, দেশের ভেতরেও ছদ্ম পরিচয়ে থাকে এর অপারেটররা। বিদেশে যারা আছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই 'কূটনীতিক'। এফসিডির অধীনে আরেক ডিরেক্টরেট, 'এস' বা ইল্‌লিগ্যালস্ ডিরেক্টরেট। এফসিডি যদি সিক্রেট হয়, তো 'এস' টপ্ সিক্রেট। ডিরেক্টরেটের অন্য সব শাখার সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাক, ওরা নিজেরা নিজেরা পর্যন্ত মুখোমুখি হয় না কখনও।

এদের ট্রেনিঙ এবং ব্রিফিঙ হয় ওয়ান-টু-ওয়ান, কেবলমাত্র গুরু এবং শিষ্য পদ্ধতিতে। এরা অন্যদের মত নিয়মিত হাজিরা দেয় না অফিসে, কারণ তাতে মুখ চেনাচিনি হয়ে যাবে। ইল্‌লিগ্যালস্‌দের মধ্যে পুরুষ যেমন আছে, তেমনি মেয়েও আছে। এরা হাইলি ট্রেইনড্‌। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই আছে এরা 'ডীপ কাভার' এজেন্ট হিসেবে।

এত যাদের সতর্কতা, গোপনীয়তা, তাদের প্রধান কিন্তু এই ভবনে বসেন না। বসেন দুই দযেরঝিনস্কি স্কয়ারে। কারণ তাতে 'সহকর্মীদের' সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সুবিধে। পঁয়ষট্টি প্রায় ছাড়িয়ে গেছে ভদ্রলোকের বয়স। মেজর জেনারেল ভ্লাদিমির চেরনোভস্কি। জীবনের চারভাগের তিনভাগই কেটেছে তাঁর বিদেশে বিদেশে, ডীপ কাভার এজেন্ট হিসেবে।

অ্যালবিয়ন কমিটি তাদের 'প্ল্যান অরোরা' ঘোষণা করার দুদিন পরের ঘটনা। দুপুরের দিকে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন জেনারেল আয়েশ করে, অপরিচিত দুই ব্যক্তি ঢুকল ভেতরে। তাদের একজন একটা চিঠি এগিয়ে দিল। পড়লেন ওটা চেরনোভস্কি। মেজাজ খিঁচড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যদিও ভাবটা সযত্নে গোপন করে গেলেন। নিচু গলায় বললেন, 'আপনারা যেমন চাইছেন, তেমন একজনই মাত্র আছে আমার অধীনে। কিন্তু হাতের কাছে নেই সে। দূরে আছে।'

'তাহলে, কমরেড মেজর জেনারেল,' চিঠি হস্তান্তরকারী লোকটি বলল। 'আজই ওকে ডিটাচ করুন। এবং এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলুন,' সেন্ট্রাল কমিটির একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল সে 'এস' প্রধানের দিকে।

আগন্তুক দু'জন বিদেয় নিতে আরেকবার চিঠিটা পড়লেন মেজর জেনারেল। চোখ বোলালেন কার্ডটির ওপরও। তারপর মাথা দোলালেন। কিচ্ছু করার নেই। যাঁর কাছ থেকে এসেছে এই চিঠি এবং কার্ড, তাঁর

সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রশ্নই আসে না। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন চেরনোভস্কি। সেরা মানুষটিকে হাতছাড়া করতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কি আর করা, উপায় নেই। ছাড়তেই হচ্ছে।

বাঁ হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন তিনি। 'মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে বলো আমার অফিসে রিপোর্ট করতে।'

দাচার বিশাল সীটিংরুমে যখন নিয়ে আসা হলো তাকে, রীতিমত কাঁপুনি উঠে গেছে মেজর তাতায়েভের। ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে। জীবনে কখনও সামনাসামনি হয়নি সে প্রেসিডেন্টের, হবে বলে স্বপ্নেও ভাবেনি। ভয়ে ভয়ে আছে বেশ। গত তিনটে দিন বড্ডো আতঙ্কে কেটেছে তার।

স্পেশাল ডিউটি থেকে সরিয়ে এনে সেন্ট্রাল মস্কোর এক ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে তাকে এ ক'দিন। নাইনথ্ ডিরেক্টরেটের দু'জন করে গার্ড সরাক্ষণ পাহারা দিয়েছে সে ফ্ল্যাট। প্রথম প্রথম ভেবেছে তাতায়েভ, না জানি কী মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছে সে অজান্তে। কিন্তু সেটা যে কি ভেবে পায়নি প্রচুর মাথা খাটিয়েও।

তারপর, হঠাৎ করেই নির্দেশ এল গোসল-শেভ সেরে নিজের সেরা সিভিলিয়ান স্যুটটি পরে তৈরি হয়ে নেয়ার। নিচে গাড়ি অপেক্ষা করছে, দূরে কোথাও যেতে হবে। দাচার সীটিংরুমে ঢোকার সময়ই কেবল জানতে পেরেছে ভ্যালেরি তাতায়েভ, কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি শুরু হয়েছে সর্বাঙ্গে। জিভ শুকিয়ে কাঠ। নিজেকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে চালাতে ভাবল মেজর, প্রেসিডেন্টের যে কোন অভিযোগের সদুত্তর দিতে প্রস্তুত সে। কোন অন্যায় সে করেনি। কাজেই তার ভয় পাওয়ারও কিছু নেই।

কিন্তু ভেতর থেকে প্রেসিডেন্টকে বেরিয়ে আসতে দেখেই সব

সৎসাহস উবে গেল মেজরের। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন হয়ে গেল সে। নীরবে তার সামনের এক সোফায় এসে বসলেন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকলেন সুদর্শন, সুঠাম তাতায়েভের দিকে। তারপর হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন তাকে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে গুণে গুণে চার কদম এগোল মেজর মার্চ করে। দাঁড়িয়ে পড়ল।

যখন মুখ খুললেন প্রেসিডেন্ট, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না সে। 'মেজর তাতায়েভ, তুমি কোন টেইলরের ডামি নও। তাহলে কেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাছে এসো, বোসো আমার মুখোমুখি।'

প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ভ্যালেরি। প্রেসিডেন্টের সামনে কোন মেজর কোন কালে আসন গ্রহণ করেছে, বাপের জন্মেও শোনেনি সে। সামান্য দ্বিধায় ভুগল মেজর, তবে নির্দেশ পালন করতে দেরি করল না। সামনের একটা চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে পড়ল। দু হাঁটু সেঁটে থাকল পরস্পরের সঙ্গে। চোখ তুলতে পারল না সে চেষ্টা করেও।

'তোমাকে কেন ডাকিয়ে এনেছি এখানে জানো, মেজর?'

'না, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

'বলছি। শোনো। বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশন পরিচালনার দায়িত্ব তোমাকে দেব আমি ঠিক করেছি। দেশের স্বার্থে পরিচালিত হবে সে মিশন। যদি সফল হতে পারো, প্রচুর লাভ হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের। আর যদি বিফল হও, ক্ষতি হবে অকল্পনীয়। এ কাজে একমাত্র তোমাকেই আমার উপযুক্ত মনে হয়েছে, মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ।'

মাথার ভেতর সব গড়বড় হয়ে গেল তার। তোলপাড় চলছে বুকের মধ্যে। এসব কি সত্যি শুনছে সে? প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে ঠিক এই কথাগুলোই বেরিয়েছে? শুনতে ভুল হয়নি তো তাতায়েভের? কোথায়

ধরেই নিয়েছিল অজানা কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে তাকে। মাত্রা বুঝে র‍্যাঙ্ক কেড়ে নেয়া অথবা সাইবেরিয়া বা উরালের কোন 'চরিত্র সংশোধনাগারে' পাঠানো হবে, তার বদলে কি না...।

আনন্দে চোখে পানি এসে যাওয়ার জোগাড় ভ্যালেরি তাতায়েভের। মাস্কো ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট স্কলার ছিল সে। ছোটবেলা থেকে মনে গেঁথে বসেছিল দেশসেবার বাসনা। চাকরিতে ঢুকেছে আট বছর। সেই প্রথম থেকেই অপেক্ষা করে আছে সে বিদেশে সত্যিকার এক মিশন নামের এই সোনার হরিণটির সন্ধানে। যদি কান বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে, যদি এসব কমরেড প্রেসিডেন্টের কোন নির্মম রসিকতা না হয়ে থাকে, তাহলে...।

মুখ তুলল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। সরাসরি তাকাল প্রজাতন্ত্রের প্রধানের নীল চোখের দিকে। মৃদু, কাঁপা গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি।'

'অন্যরা তোমাকে মিশনের বিস্তারিত ব্রিফ করবে। সময় খুব একটা নেই হাতে। জানি তুমি সর্বোচ্চ ট্রেনিঙের চূড়ান্ত শিখর অতিক্রম করেছ সফলতার সঙ্গে। তাই তোমাকেই বেছে নিয়েছি আমি। যদি সফল হতে পারো, আমার বিশ্বাস পারবে, যে সম্মান আর প্রমোশন অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে,' মৃদু হাসি ফুটল পার্টি প্রধানের, 'তা তোমার কল্পনারও অতীত। আমি নিজে দেখব ব্যাপারটা।

'তবে, যদি কোথাও কোন ভুল হয়ে যায়, গণ্ডগোল হয়ে যায়, মানে, তোমার পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে ধরা দেয়া চলবে না। এর সঙ্গে তোমার মাতৃভূমির মান-ইজ্জত জড়িত, কথাটা মনে রেখো। ওরা যেন জীবিত মেজর তাতায়েভকে ধরতে না পারে। বুঝতে পারছ, মেজর, ঠিক কি বলতে চাইছি আমি?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। বুঝতে পারছি।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'ধরতে পারলে ওরা তোমার মুখ খোলাবে। নির্যাতন করেই হোক বা কেমিক্যাল প্রয়োগ করেই হোক, খোলাবেই। মানবদেহে এমন কোন প্রতিরোধক নেই যা কেমিক্যালের শব্দহীন নির্যাতন ঠেকাতে পারে। যদি ধরা পড়ো, সোভিয়েত ইউনিয়নের যে অকল্পনীয় ক্ষতি হবে তা কোনদিন পূরণ হবে না।'

লম্বা করে শ্বাস টানল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। 'আমি ব্যর্থ হব না,' দৃঢ় আস্থার সুর ফুটল তার কণ্ঠে, 'কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। তারপরও যদি দুর্ভাগ্যবশত তেমন সময় আসেই, ওরা আমাকে জীবিত পাবে না।'

'গুড!' বাযার টিপলেন প্রেসিডেন্ট টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে। দরজা খুলে গেল। বাইরে পাথরমুখো মেজর কিরলভ দাঁড়িয়ে।

'যাও তাহলে, ইয়াংম্যান,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এখানেই ব্রিফ করা হবে তোমাকে, এক্ষুণি। এরপর আর কোথাও দেয়া হবে ইনটেনসিভ ব্রিফিং। গুড বাই, কমরেড মেজর। উইশ ইউ ভেরি বেস্ট অভ লাক। তুমি সফল হয়ে ফিরে এলে আমাদের আবার দেখা হবে।'

তাতায়েভের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ভারি দরজা। দীর্ঘ সময় পর চোখে পলক পড়ল গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড মাস্টারের।

সকাল সাড়ে দশটায় প্রিটোরিয়ার জান স্মুটস্ এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বৃহদাকার এয়ারবাস। ভিড় খানিকটা পাতলা হতে ধীরেসুস্থে নেমে এল মাসুদ রানা। দুজন এনআইএস ফিল্ড এজেন্ট অবজার্ভেশন টাওয়ার থেকে লক্ষ রাখল রানার ওপর। তবে কাছে আসার চেষ্টা করল না। ওরা কেবল জানে মাসুদ রানা আসছে। কেন, জানে না।

ত্রিশ মিনিট ব্যয় হলো কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ব্যারিয়ার পার হতে।

তারপর ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলো রানা। আফ্রিকা সম্পর্কে যাদের তেমন পরিচয় নেই, এ দেশে এলে হোঁচট খাবে তাদের অনুমান-নির্ভর ধারণা। প্রশস্ত ছয় লেনের কুচকুচে কালো কার্পেটিঙ করা আধুনিক হাইওয়ে ধরে ছুটছে ওর ট্যাক্সি। অবাক বিস্ময়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে মাসুদ রানা। বিশ্বাস হতে চায় না, কোন আফ্রিকান দেশ এত আধুনিক হতে পারে।

সেন্ট্রাল প্রিটোরিয়ার ভ্যান ডের ওয়াল্ট স্ট্রীটের বিলাসবহুল পাঁচ তারা হোটেল বার্গারস্পার্কে স্যুইট বুক করা আছে মাসুদ রানার নামে। সময় আছে দেখে হোটেলেই উঠল ও প্রথম। শাওয়ার শেভ সেরে তখনই বেরিয়ে পড়ল আবার। ঠিক এগারোটায় এনআইএস চীফ জেনারেল ডিয়েটার গেরহার্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এগারোটা বিশে কার্ক স্ট্রাটের দীর্ঘ, তিনতলা কফি রঙা এনআইএস হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছল মাসুদ রানা।

ছোটখাট একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণমুখো ভবনটি। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলো ও। তিনতলার একদম পশ্চিম প্রান্তে জেনারেলের অফিস। নিচতলায় রিসেপশনে ওরই জন্যে অপেক্ষমাণ এক তরুণ এনআইএস এজেন্ট রিসিভ করল রানাকে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে। দু'-চার কথায় শুভেচ্ছা বিনিময় করল দু'জন, লিফটে করে উঠে এল তিনতলায়।

জেনারেল গেরহার্ড বিশালদেহী। প্রায় সাড়ে ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা। বয়স ষাটের মত। শক্তপোক্ত গড়ন। উঠে এসে হাত মেলালেন তিনি রানার সঙ্গে। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম, মেজর মাসুদ রানা।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।' অফিস রুমটা বেশ বড়, তবে অনাড়ম্বর। দেয়ালে ঝুলছে অনেকগুলো ম্যাপ, অপারেশনাল। ঘরের এক প্রান্তে দরজার দিকে মুখ করা বিশাল এক গ্লাস টপ্ সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এপাশে কোন

চেয়ার নেই ওটার। আরেক মাথায়, জানালার কাছে একটা নিচু টেবিল। চারটে ক্লাব চেয়ার রয়েছে ওটা ঘিরে। ওখানেই বসালেন জেনারেল মাসুদ রানাকে।

'আপনি পৌঁছার খানিক আগেই কথা হয়েছে আমার রাহাতের সঙ্গে,' হাসি মুখে ওর দিকে চেয়ে আছেন গেরহার্ড। 'আপনি জানেন, রাহাত আর আমি এক সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম? জেনারেল রোমেলের প্যান্জার ডিভিশনের বিরুদ্ধে তবরুক ফ্রন্টে লড়েছিলাম আমরা। ও আর আমি দু'জনেই মেজর ছিলাম তখন, একই ইউনিটের।'

'জ্বি, স্যার। শুনেছি।'

'রাহাতের মত দুর্দান্ত সাহসী আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি। ওর যোগ্য পরিচালনার ফলেই বিসিআইয়ের এত সুনাম আজ। অবশ্য, তার পিছনে আপনার ভূমিকাও কম নয়।'

'আপনি বাড়িয়ে বলছেন, জেনারেল।'

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরহার্ড। 'মোটেই না, মোটেই না।'

আরও মিনিট পাঁচেক হালকা আলোচনা চলল দু'জনের। বেশিরভাগ কথা জেনারেলই বলছেন। রানা বুঝল, মানুষটি গল্পবাজ, বেশি সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। কাজেই সময় বুঝে আলতো করে ওর আসার কারণ সম্পর্কে সামান্য আভাস দিল রানা। ব্যস্, ওতেই কাজ হলো। মুহূর্তে কাজের মানুষ বনে গেলেন জেনারেল।

'তো, মেজর মাসুদ রানা, কাল টেলিফোনে আমাদের আলোচনার সময় আপনি বলেছেন, ডি অ্যাঙ্গাস কার বা কাদের হয়ে কাজ করে জানতে চান আপনি, ঠিক?'

'রাইট, জেনারেল।'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলালেন তিনি কয়েকবার। 'লংফেলো এবং আপনাকে তো বটেই, রাহাতকেও আমি কথা দিয়েছি এ জন্যে যতদূর

আমার পক্ষে সম্ভব, করব। তবে ও আমাদের লোক নয়। ছিলও না কোনদিন। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'আমার একজন পার্সোন্যাল স্টাফ অফিসারকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, যে-কোন কাজেই ও আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। ফাইল পরীক্ষা করা, ইন্টারপ্রিট করা, এসবে আপনার ওকে লাগবে। আমাদের ভাষা জানেন?'

'না, জেনারেল।'

'অসুবিধে নেই। ছেলেটা বেশ চটপটে, ওকে দিয়েই দোভাষীর কাজ চালিয়ে নেবেন।'

ইন্টারকমে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিলেন ডিয়েটার গেরহার্ড। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল রানারই বয়সী এক যুবক। আদা রঙের চুল। গোঁফও একই রঙের। মুখটা লম্বাটে। রানার উদ্দেশে সামান্য নড করল সে।

'পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। অ্যানডি, ইনি মেজর মাসুদ রানা। যার কথা তোমাকে কাল বলেছি। এখন থেকে এঁর সঙ্গে থাকবে তুমি। যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়।'

হাত মেলাল রানা আর অ্যানড্রিয়াস। সম্ভবত পরীক্ষা করার জন্যেই প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটাতে গেল আফ্রিকান, কিন্তু রানার পাল্টা চাপ খেয়ে ঢিল দিল মুঠোয়।

'আপনার সুবিধের জন্যে এই ফ্লোরেই একটা রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে বসে শুরু করুন কাজ,' বললেন গেরহার্ড।

জেনারেলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা দুজন। দীর্ঘ করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় রানার নির্ধারিত রুম। ভেতরটা বেশ

সাজানো-গোছানো। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। 'বলুন, মেজর, ঠিক কোনখান থেকে শুরু করতে চান কাজ।'

'ডি অ্যাঙ্গাসের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে, ক্যাপ্টেন।'

'ঠিক।' ড্রয়ার থেকে একটা প্যাকেট মোড়া পুরু ফাইল বের করল পিয়েনার। 'বসের নির্দেশে আজই ফরেন মিনিস্ট্রির পার্সোন্যাল রেজিস্ট্রি থেকে এটা নিয়ে এসেছি আমি।' মাসুদ রানার সামনে রাখল সে ফাইলটা প্যাকেট থেকে বের করে। 'পুরো ফাইলটা পড়েছি আমি। সংক্ষেপে বলতে পারি, যদি তাতে আপনার কিছুটা সাহায্য হয়।'

'প্লীজ, ক্যাপ্টেন।'

'১৯৪৬ সালে কেপটাউনে সাউথ আফ্রিকান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন ডি অ্যাঙ্গাস। চল্লিশ বছরের কিছু বেশি হয়েছে তাঁর চাকরির বয়স, আগামী ডিসেম্বরে রিটায়ার করার কথা। ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ নেই, ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডেও কোন খুঁত নেই। পা'ফেক্ট সাউথ আফ্রিকানার।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অ্যানড্রিয়াসকেও অফার করল। তারপর মোড়ক ওল্টাল ফাইলটার। প্রথমেই ইংরেজিতে হাতে লেখা কয়েকটা শীট।

'ডি অ্যাঙ্গাসের নিজহাতে লেখা অটোবায়োগ্রাফি ওটা। ফরেন সার্ভিসের সবাইকেই সাবমিট করতে হয় নিজের পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত। জান স্মুটের ইউনাইটেড পার্টি ছিল তখন ক্ষমতায়, আফ্রিকান ভাষার বদলে সে সময় লেখালেখির ব্যাপারে ইংরেজি ব্যবহার হত অফিস-আদালতে। এখন অবশ্য হয় না।'

'ভালই,' বলল মাসুদ রানা। 'সুবিধেই হলো আমার। আমি পড়ে দেখি এগুলো, এই ফাঁকে আপনি দয়া করে লোকটির দেশ-বিদেশে পোস্টিং আর অবস্থানের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈরি করে ফেলুন। ওকে?'

'অল রাইট।' অটোবায়োগ্রাফিটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফাইল আর কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলের অন্য মাথায় বসে পড়ল ক্যাপ্টেন পিয়েনার। 'দেখা যাক্, ওর ভেতর থেকে সাপ-ব্যাঙ কিছু বেরোয় কিনা। আমার মনে হয়, লোকটা যদি সত্যিই মচকে গিয়ে থাকে, তো বিদেশেই কোথাও ঘটেছে ব্যাপারটা। দেশে নয়।'

ক্যাপ্টেনের 'যদি' শুনে মনে হলো, কোন আফ্রিকান বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, সে তা মনে করে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অ্যাঙ্গাসের জীবনীর দিকে মন দিল মাসুদ রানা।

"উত্তর ট্রান্সভালের ডুয়েলস্‌ক্‌লুফ্‌ শহরে ১৯২৫ সালের ৮ আগস্ট আমার জন্ম। আমার বাবা, ভ্যান অ্যাঙ্গাস ছিলেন কৃষিজীবী। খাঁটি আফ্রিকানার। কিন্তু আমার মা ছিলেন অ্যাঙলো। তখনকার দিনে এ ধরনের অসম বিয়ে বিরল ঘটনা ছিল। তবে এর ফলে আমি বেশ উপকৃত হই, ছোটবেলা থেকেই পিতৃভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার ওপরও সমান দক্ষতা অর্জন করি আমি। আমি ছিলাম বাবা-মার একমাত্র সন্তান।

আমার বাবা আর মার বয়সের ব্যবধান ছিল বিস্তর। আমার জন্মের সময় বাবার বয়স ছিল চৌষট্টি, আর মার মাত্র ছাব্বিশ, দ্বিগুণ থেকেও অনেক বেশি। আমার দশ বছর বয়সের সময় টাইফয়েডে মৃত্যু হয় মার। সে সময় ওই অঞ্চলে কিছুদিন পর পরই এই বিশেষ রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা দিত।"

পড়ে যেতে থাকল মাসুদ রানা…"১৯৩৯ সালে বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বাবা ছিলেন ইউনাইটেড পার্টির কড়া সমর্থক। সেই সূত্রে মিত্রজোট তথা ব্রিটেনের সমর্থক। যুদ্ধের খবর শোনার জন্যে সারাক্ষণই একটা ট্র্যানজিস্টর সঙ্গে থাকত তাঁর। মা মারা গেছেন। বাবা ছাড়া আর

কেউ ছিল না আমার, তাই আমি সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। বিবিসি, ভোয়া, রেডিও অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদির খবর শুনতাম আর বাবার মত উদ্দীপ্ত হতাম।

"সে সময়ই যুদ্ধে যোগ দেয়ার ইচ্ছে জাগল মনে। কিন্তু বয়স অল্প বলে বাবা সায় দিলেন না। পরে ১৯৪৩ সালের ১০ আগস্ট, আমার আঠারোতম জন্মদিনের দু'দিন পর, বাবার প্রচণ্ড আপত্তি অগ্রাহ্য করে পিটার্সবার্গের উদ্দেশে ডুয়েলস্ক্লুফ ত্যাগ করি আমি। বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হয় আমার পিটার্সবার্গ রেল স্টেশনে। আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে না পেরে আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন বাবা ওই পর্যন্ত। ওখান থেকে অন্য ট্রেনে চেপে প্রিটোরিয়া রওনা হই আমি।

"শেষ দেখার সেই বিশেষ সময়টি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মনে থাকবে আমার। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, বাবা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাত নাড়ছেন। চোখে টলটল করছে পানি। প্রিটোরিয়া পৌঁছে পরদিন সকালে উপস্থিত হই প্রতিরক্ষা সদর দফতরে এবং আর্মিতে নাম লেখাই। একদিন পর আরও অনেক নতুন রিক্রুটের সঙ্গে রবার্টস হেইটস্ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। ওখানেই যুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয় আমার।"

মুখ তুলল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরাল। 'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, মেজর মাসুদ রানা,' বলে উঠল ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস। 'চলুন, আমাদের ক্যান্টিনে যাই।'

পড়ায় ডুবে যেতে যেতে বলল রানা, 'এখানেই কিছু আনিয়ে খেয়ে নেয়া যায় না? স্যাণ্ডউইচ আর কফি?'

'শিওর। ফোন করে আনিয়ে নিচ্ছি আমি।'

কানে গেল না রানার। ছেড়ে ছেড়ে দ্রুত পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক

জায়গায় এনকেভিডি, পরবর্তীতে কেজিবি, লেখা দেখে সতর্ক হয়ে উঠল ও। বাক্যটা ছিল ঃ "আমাকে এনকেভিডির হাতে তুলে দেয়া হয়"। কেন? কয়েক প্যারা পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা। একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে পড়তে শুরু করল আবার।

"আমরা তখন সাইলেসিয়ান প্লেইনে। হঠাৎ করেই সামনের দিক থেকে আমাদের ট্রাকের ওপর শুরু হলো জার্মানদের গুলি বৃষ্টি। চোখের সামনে সঙ্গীদের টপাটপ্ মরতে দেখে ভয়ে হাত পা অসাড় হয়ে এল আমার। ভাগ্য ভাল, ট্রাকের একেবারে পিছনদিকে ছিলাম আমি। তাই তখনও গুলিবিদ্ধ হইনি। থেমে পড়ল ট্রাক, কারণ ড্রাইভার মারা গেছে।

"আমার পাশেই ছিল আরেক অপরিচিত আফ্রিকানার। বেশ সাহসী ছিল সে, অন্তত আমার থেকে। হাত ধরে টেইলবোর্ডের দিকে টানল সে আমাকে। বলল, 'চলো, পালাই'। আরও অনেকে থাকতে আমাকেই কেন ধরল সে জানি না। সে যাই হোক, ভাবলাম, এখানে বসে থাকলে মরতেই হবে। কারণ শত্রুর অ্যামবুশের একেবারে মাঝখানে পড়ে গেছি আমরা। কেবল পিছন বাদে অন্য তিন দিক থেকেই সমানে গুলি চলছে তখন। কাজেই বসে না থেকে একবার চেষ্টা করেই দেখি বাঁচা যায় কি না।

"পরের ঘটনা, কেবল মনে আছে, সেই ছেলেটা আর আমি প্রাণভয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢোকার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। পালাবার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করিনি বলেই বেঁচে গেলাম সে যাত্রা। কিন্তু পরে টের পেলাম, আসলে ফুটন্ত কড়াই থেকে পড়েছি আমরা জ্বলন্ত চুলোয়। রাতে সাইলেসিয়ান প্লেইনের তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে। সে যে কী অমানুষিক কষ্ট, বলে বোঝানো অসম্ভব।

"প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে গেল আমার প্রাণ রক্ষাকারী সঙ্গীর। ওই পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম আমি তার সেবা শুশ্রূষা করার,

কিন্তু কাজ হলো না। মাত্র দু'দিন ভুগেই মারা গেল ছেলেটা। ...এর সম্ভবত তিন দিন পর রুশ সৈন্যরা জঙ্গল থেকে পাকড়াও করে আমাকে। জার্মান স্পাই সন্দেহ করে তুলে দেয় এনকেভিডির হাতে।

"আমি জার্মান স্পাই, কথাটা আমার মুখ থেকে বের করার জন্যে দীর্ঘ পাঁচ মাস প্রচণ্ড নির্যাতন চালায় ওরা আমার ওপর। কিন্তু আমি স্বীকার করিনি। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ততদিনে, অথচ আমি জানি না। যা হোক, ১৯৪৫ সালের আগস্টে জার্মানির পটস্ড্যামে ব্রিটিশ আর্মির কাছে আমাকে হস্তান্তর করে এনকেভিডি। আমি তখন মৃতপ্রায়। কিছুদিন বেলিফেল্ড হাসপাতালে রাখা হয় আমাকে, তারপর ওখান থেকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওখানে আরও তিন মাস গ্লাসগোর কিলার্ন ইএমএস হসপিটালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয় আমাকে।

"ডিসেম্বরে সাউদাম্পটন থেকে ইলি ডি ফ্রান্স নামের জাহাজে চড়ে কেপ টাউন রওনা হই আমি। এবং সেখানে পৌঁছে জানতে পাই আমার একমাত্র আত্মীয়, পৃথিবীর একমাত্র বন্ধন, আমার বাবা মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি। ভর্তি হই কেপ টাউনের ওয়েনবার্গ মিলিটারি হসপিটালে। ওখানে দু'মাস চিকিৎসাধীন রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয় আমাকে। আমি, ডি অ্যাঙ্গাস, এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বিধায় সাউথ আফ্রিকান ফরেন সার্ভিসে চাকরির আবেদন করছি।"

মুখ তুলল মাসুদ রানা। 'পড়া শেষ?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ। আপনার কাজ?'

'শেষ'। কোথাও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। একদম ঝরঝরে ক্যারিয়ার। বলছি, শুনুন। মোট আটটি দেশে কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করেছেন ডি অ্যাঙ্গাস, প্রতিটি প্রো-ওয়েস্টার্ন দেশ। বিয়ে করেননি, ব্যাচেলর।' রানার কপালের কুঞ্চন কমছে না দেখে প্রশ্ন করল পিয়েনার,

'আপনি কি এখনও ভাবছেন ভদ্রলোকের মধ্যে সত্যিই কোন গড়বড় আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'এই লাইফ স্টোরি, এর মধ্যে কোথাও যেন গণ্ডগোল আছে। ধরতে পারছি না, ক্যাপ্টেন।'

'অল রাইট,'একটু যেন বিরক্তি প্রকাশ পেল পিয়েনারের কণ্ঠে। 'বলুন, এরপর কি। আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্যেই আছি। কোত্থেকে শুরু করতে চান?'

'একদম শুরু থেকে,' অ্যাঙ্গাসের জীবন বৃত্তান্তের ওপর 'ঠক্' 'ঠক্' করে টোকা দিল রানা। 'এই গ্রাম, ডুয়েলস্ক্লুফ থেকে। কতদূর জায়গাটা?'

'চার ঘণ্টার ড্রাইভ। যেতে চান?'

'ইয়েস, প্লীজ।'

'আজই?'

'না, কাল খুব সকালে। ধরুন ছটায় স্টার্ট করতে চাই।'

'কোন অসুবিধে নেই। ঠিক সময়ে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাব আমি আপনার হোটেলে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। আজই যেতাম, কিন্তু ফাইলটা আরও খানিক পরীক্ষা করা প্রয়োজন।'

মস্কো। মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে ডিটাচ করার পরদিন সোভিয়েত আর্মড ফোর্সেসের আরও দু'জনকে স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে বদলি করা হলো তাড়াহুড়ো করে।

মস্কোর একশো মাইল পশ্চিমে, মস্কো-মিনস্ক হাইওয়ের পাশে পাইনের বিশাল এক বন। ওর মাঝে, লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়ালে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম বৃহৎ লিসেনিঙ কমপ্লেক্স। বহির্বিশ্ব থেকে পাঠানো ওয়ারশ প্যাক্টের রেডিও সিগন্যাল ধারণ করা হয় এখানে আকাশ-

ছোঁয়া অজস্র রেডিও ডিশ এরিয়েলের সাহায্যে।

কেবল তাই নয়, সোভিয়েত সীমান্তের ওপারে, আরও বহু বহুদূরের সিগন্যালও ধারণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এই পোস্ট। এর একটা বড় অংশ পুরোপুরি আলাদা অন্য অংশ থেকে, শুধুমাত্র কেজিবির ব্যবহারের জন্যে। এখান থেকেই বদলি করা হলো একজনকে—ওয়ারেন্ট অফিসার রেডিও অপারেটর সে।

'লোকটা ছিল আমার পোস্টের সেরা অপারেটর,' কমপ্লেক্সের কম্যাণ্ডিং কর্নেল তাঁর ডেপুটির উদ্দেশে আক্ষেপ করে বললেন। তাকে ডিটাচ করার সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশ পৌঁছে দিয়ে খানিক আগে বিদেয় নিয়েছে সেই দুই ব্যক্তি, আগেরদিন যারা মেজর জেনারেল ভ্লাদিমির চেরনোভস্কির অফিসে গিয়েছিল।

'খুব ভাল ছিল?'

'ভাল মানে?' ডেপুটির প্রশ্নে রেগে উঠলেন কর্নেল। 'আমি তো বলি আমাদের সেরা রেডিও অফিসার ছিল ও। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট পেলে ক্যালিফোর্নিয়ার কোথায় কোন্ তেলাপোকা পিঠ আঁচড়াচ্ছে, পরিষ্কার ট্রেস করতে পারে ও।'

অন্যজন আর্মির এক কর্নেল। আর্টিলারির। আসলে কর্নেল যতটা না সৈনিক, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞানী। কাজ করে রিসার্চ ডিভিশনের অর্ডন্যান্স ডিরেক্টরেটে।

মেজর কিরলভকে অনুসরণ করে দাচার চোখ ঝলসানো গেস্ট উইঙে এসে পৌঁছল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। মনে হচ্ছে, অসহ্য উচ্ছ্বাস আর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দে বুকটা যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে তার। ইংরেজিতে তুখোড় ভ্যালেরির জানা আছে সেই ফ্রেজ, 'টু ডাই ফর গড, কিং অ্যাণ্ড কান্ট্রি'।

তার গড নেই, তবে কিং আছে, আছে কান্ট্রি—মাদার রাশিয়া। তার জন্যে যে কোন মুহূর্তে মরণকে বরণ করতে সে প্রস্তুত। একটা বন্ধ দরজার সামনে থামল মেজর কিরলভ। নক করল। তারপর আস্তে করে মেলে ধরল। সরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করল তাতায়েভকে ভেতরে ঢুকতে।

পা বাড়াল সে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আরেকজন আছেন ভেতরে। বিশালবপু ড. পাভলভ। 'মেজর ভ্যালেরি?' এগিয়ে এলেন তিনি। বাড়িয়ে ধরলেন ডান হাত।

বিস্মিত হলো মেজর। এ মুখ তার খুব চেনা, যদিও পরিচয় নেই। সে জানে, এ লোক কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দাবার গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'ইয়েস, কমরেড পাভলভ।' হ্যাণ্ডশেক করল সে তাঁর সঙ্গে।

'বসুন, মেজর।'

'ধন্যবাদ।'

কয়েক মুহূর্ত মেজরের দিকে চেয়ে থাকলেন পাভলভ অপলক। এর জীবনী প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর। উচ্চতা ছয় ফুট দুই, বয়স আটাশ। দশ বছরের একাগ্র সাধনার ফলে একজন লিমির মতই ঝরঝরে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে সে, তাতে রুশ অ্যাকসেন্টের সামান্যতম আভাসও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু চোস্ত ইংরেজিই নয়, ওয়েলস এবং আইরিশেও সমান ওস্তাদ ভ্যালেরি।

এর আগে দু' দফা ব্রিটেনে থেকে এসেছে ভ্যালেরি ছয় মাস করে, ডীপ কভার এজেন্ট হিসেবে। এ ধরনের ট্রিপকে 'ফ্যামিলিয়ারাইজেশন' বলে ডিরেকটরেট 'এস'। পরে কাজে লাগে এর অভিজ্ঞতা। ওদেশে গিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এখন তেমন অসুবিধে হবে না তাতায়েভের। বহিরাগত মনে হবে না নিজেকে সারাক্ষণ।

অবশ্য শুধু ঘুরতেই পাঠায় না এদের 'এস'। সঙ্গে কিছু কাজও করতে

হয়। যে দেশেই পাঠানো হোক, প্রথমেই নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় সেখানে এজেন্টকে। জানতে হয় ড্রাইভিং লাইসেন্স করার পদ্ধতি। ট্রেন, ট্রাম, বাস, আণ্ডার গ্রাউণ্ড রুট ভাল করে চিনে নিতে হয়। শিখতে হয় নতুন নতুন জনপ্রিয় বচন, গালাগাল।

'ওয়েল, জেন্টলম্যান,' ইংরেজিতেই শুরু করলেন জোসেফ পাভলভ। একসময় মস্কো ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির ছাত্র ছিলেন তিনিও। দু'ঘণ্টা ধরে প্ল্যান অরোরার নাড়ি নক্ষত্র ব্যাখ্যা করলেন ডক্টর। 'এগুলো সব গেঁথে নিন মনের ভেতর। ওদেশে যাওয়ার সময় সঙ্গে থাকবে আপনার শুধু একটা ওয়ান-টাইম প্যাড, আর কিছুই নয়।'

বলার প্রয়োজন ছিল না, এতক্ষণ যা যা শুনেছে তাতায়েভ, তৎক্ষণাৎ তা হজম করে ফেলেছে। একটা কমা ফুলস্টপও ভুল হবে না তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়। 'ইয়েস, কমরেড পাভলভ। সময় মত অন্য সব সাপ্লাই পৌঁছলে আর কিছুই প্রয়োজন হবে না আমার।'

'গুড। এবার আপনাকে মস্কোয় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে আরও একবার ইনটেনসিভ সেশনে বসতে হবে কয়েকজন এক্সপার্টের সঙ্গে। দেশত্যাগ করার আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন আপনি।'

মাথা দোলাল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ।

বাযার টিপলেন জোসেফ পাভলভ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোরগোড়ায় উদয় হলো কিরলভ। 'ওয়েল,কমরেড,' বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'আনটিল উই মিট আগেইন, গুড লাক। অ্যাণ্ড গুড বাই।'

আট

চওড়া মোটরওয়ে ধরে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের দিকে ছুটছে রানা আর পিয়েনার। এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা এরমধ্যে। নাইলস্ট্রম আর পটজিয়েটারস্‌রাস পিছনে ফেলে পিটার্সবার্গের দিকে চলেছে এখন। দুপাশে ধু-ধু আফ্রিকার বিশাল বিস্তৃতি। তারও ওপাশে, উত্তরে, যেখানে মাটি ছুঁয়েছে আকাশ, জিম্বাবুয়ের দক্ষিণ সীমান্ত।

হঠাৎ করেই রেবেকা সাউলের মুখটা ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায়। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও। ভালবেসে ফেলেছিল মেয়েটি দুর্দান্ত বেপরোয়া বাঙালি যুবক মাসুদ রানাকে। আজও ভুলতে পারেনি ও রেবেকার স্মৃতি। ভুলতে পারেনি সবিতা আর অনিতার স্মৃতিও। পারবেও না কোনদিন। থেকে থেকেই স্মৃতির আরশিতে উদয় হয় ওরা, বুকের কোথায় কোন গভীর গহনে অব্যক্ত এক বেদনা অনুভব করে মাসুদ রানা।

নড়েচড়ে বসল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডি অ্যাঙ্গাসের মধ্যে ডুবে গেল। ঠিক নয়টা পঞ্চাশে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফ পৌঁছল ওরা। গতি কমিয়ে খুদে শহরটির প্রধান রাস্তা বোথা অ্যাভিনিউতে গাড়ি ঢোকাল পিয়েনার। 'কোথায় যেতে চান প্রথমে?'

'লইয়ারের অফিসে,' বলল রানা। গতকাল কথায় কথায় জেনারেল গেরহার্ডের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে ও, এ দেশের ছোট ছোট মফস্বল

শহরে সরকার নিয়োজিত একজন করে লইয়ার থাকে। সব ধরনের দলিল তার অফিসেই সম্পাদিত হয়।

একটা কাফের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস। 'এদের কাছ থেকে লইয়ারের ঠিকানা জানতে হবে। চলুন, এই ফাঁকে এক কাপ কফিও পান করা যাক।'

কফি সার্ভ করার আগেই ম্যানেজারকে প্রশ্ন করে ঠিকানা বের করে ফেলল ক্যাপ্টেন। 'লোকটা অ্যাংলো,' ফিরে এসে বলল সে। 'নাম জনসন। কাছেই অফিস, রাস্তার ওপারে।'

অ্যানড্রিয়াসের ওয়ালেটে চোখ বুলিয়েই তড়াক করে আসন ছাড়ল জনসনের সেক্রেটারি। ভেতরের অফিসে গিয়ে ঢুকল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বলল, 'আসুন, প্লীজ।'

জনসন মাঝবয়সী, সম্ভবত পঞ্চাশের কাছাকাছি, অনুমান করল মাসুদ রানা। আমুদে স্বভাবের, বেশি কথা বলার মানুষ। মাসুদ রানাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অ্যানড্রিয়াস। 'লণ্ডন থেকে এসেছেন। কিছু তথ্য জানতে চান আপনার কাছে।'

ওদের বসতে ইশারা করল জনসন। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি।'

'আপনার সঠিক বয়স কত, বলবেন দয়া করে?' ভূমিকা বাদ দিয়ে সরাসরি জানতে চাইল রানা।

বিস্ময় চেপে পাল্টা প্রশ্ন করল লইয়ার, 'লণ্ডন থেকে এতদূর এসেছেন আপনি আমার বয়স জানতে?' পরক্ষণেই হাসল সে। 'সরি। আমার তেপ্পান্ন চলছে।'

'তার মানে ১৯৪৬ সালে আপনি বারো বছরের ছিলেন?'

একটু চিন্তা করে মাথা দোলাল লোকটা। 'হ্যাঁ।'

'ওই বছর এখানকার লইয়ার কে ছিলেন, বলতে পারেন?'

'নিশ্চই। আমার বাবা, হ্যারি জনসন।'

'উনি বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে। আশি ছাড়িয়ে গেছে বাবার বয়স। হলে হবে কি, এখনও প্রায় আমার মতই কর্মঠ। পনেরো বছর আগে রিটায়ার করেছেন তিনি।'

'তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব?'

'এক মিনিট,' রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল পুত্র জনসন। এক মিনিট লাগল না, আধ মিনিট পর রিসিভার রেখে রানার দিকে ফিরল। 'সম্ভব। উনি আসছেন। একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

'শিওর। এই ফাঁকে আপনাকেও একটু কষ্ট করতে হবে। পুরানো ফাইল ঘেঁটে চেক করে দেখুন, ওই বছর এখানকারই এক কৃষিজীবী, নাম ভ্যান অ্যাঙ্গাস, কোন উইল সম্পাদন করেছিলেন কিনা।'

'নিশ্চই, দেখছি,' আসন ছাড়ল জনসন। 'একটু সময় লাগতে পারে, অনেক দিন আগের কথা তো! এক্সকিউজ মি।' বেরিয়ে গেল সে অফিস ছেড়ে।

মিনিট দশেক পর বাপ-বেটা এক সঙ্গে অফিসে ঢুকল। ছেলের হাতে ধুলোমাখা একটা কার্ডবোর্ড বক্স। মাথার চুল ধপধপে সাদা হ্যারি জনসনের। বয়সের ভারে সামান্য নুয়ে পড়েছে দেহ সামনের দিকে। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, এখনও যথেষ্ট শক্তি ধরেন। রানাকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ছেলে। ঘুরে ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসলেন বৃদ্ধ ছেলের আসনে। আরেকটা চেয়ার টেনে বাপের পাশে বসল সে।

'হ্যাঁ,' বললেন প্রাক্তন লইয়ার। 'ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। সম্পত্তির উইল করিয়েছিল সে মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে। আমিই করেছি সে উইল।' বক্স খুলে ভেতর থেকে ধূসর কভারের

একটা ফাইল বের করলেন বৃদ্ধ। সোনালি ফ্রেমের একটা চশমা নাকে লটকে চোখ বোলাতে আরম্ভ করলেন ওটার ভেতরে। 'হ্যাঁ, এই তো। সব আছে এখানে। বিপত্নীক ছিল ভ্যান অ্যাঙ্গাস। মৃত্যুর সময় কেউ ছিল না কাছে। একটিই সন্তান তার, ডি অ্যাঙ্গাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে সে। যুদ্ধ শেষে ডি অ্যাঙ্গাস যখন দেশে ফিরে আসে, ঠিক তখনই মৃত্যু হয় ভ্যানের। ছেলেকে রিসিভ করতে কেপ টাউন যাওয়ার পথে,' থেমে মাথা দোলালেন বুড়ো জনসন। 'খুবই দুঃখজনক।'

'সম্পত্তি কাকে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'ছেলেকেই। যাবতীয় কিছু। অনেক বড় কৃষি খামার ছিল ভ্যানের। খামার, বাড়ি, কৃষি যন্ত্রপাতি সব দিয়ে গেছে ছেলেকে।'

'আর কাউকে কিছুই দেননি তিনি?'

চোখ নামিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টালেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, একটা আইভরির দাবা সেট দিয়ে গিয়েছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। অবসর সময়ে তার সঙ্গেই দাবা খেলত ভ্যান ওই সেট দিয়ে।'

'এই খামার আর অন্যান্য সম্পত্তি এখন কি অবস্থায় আছে, মিস্টার জনসন?'

'অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।'

'আপনার উপস্থিতিতে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। তবে বিক্রি করেছে আসলে অকশনিয়ার। আমি উপস্থিত ছিলাম উইলের এক্সিকিউটর হিসেবে।'

'ওসবের মধ্যে ভ্যান অ্যাঙ্গাসের এমন কোন ব্যক্তিগত কিছু কি ছিল, যা বিক্রি হয়নি? আই মীন আপনার জানামতে?'

ভুরু কুঁচকে ভাবলেন বৃদ্ধ। 'না, তেমন কিছু ছিল না। সবই বিক্রি···হ্যাঁ, ছিল, মনে পড়েছে। একটা পারিবারিক ফটো অ্যালবাম ছিল

ভ্যানের। কমার্শিয়াল মূল্য নেই বলে ওটা বিক্রি হয়নি।'

উৎসাহিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। মনে মনে এ ধরনেরই কিছু একটা চাইছিল ও। 'ওটা আছে আপনার কাছে?'

'না, দুঃখিত। ভ্যানের সেই বন্ধুই ওটা চেয়ে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে।'

'তিনি কে?'

'নাম ভ্যান বার্গ,' বলল ছেলে, 'আমার স্কুল শিক্ষক ছিলেন ভদ্রলোক।'

'বেঁচে আছেন?'

'না। প্রায় দশ বছর আগে মারা গেছেন,' বললেন বুড়ো জনসন।

'তাঁর এক মেয়ে আছে, সিসি। আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল,' আবার নাক ঢোকাল ছোট জনসন।

'কোথায় আছে সে, জানেন?'

'হ্যাঁ, এই শহরেই আছে। যানিন রোডে বাসা।'

বৃদ্ধের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'ভ্যান অ্যাঙ্গাসের সম্পত্তি কেন বিক্রি করা হয়েছিল? কার কথায়?'

'তার ছেলের কথায়, অবশ্যই। সে সময় ছেলেটা কেপ টাউনের ওয়েনবার্গ মিলিটারি হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিল। টেলিগ্রামে সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল সে আমাকে। টেলিগ্রাম পেয়ে তার সত্যতা যাচাই করার জন্যে আমি ডি অ্যাঙ্গাসের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠাই। নিজে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তখনকার দিনে ট্রেন ছাড়া যোগাযোগের আর কোন পথ ছিল না। অতদূর আসা-যাওয়ায় প্রায় আট-দশদিন লেগে যেত। তাই, মানে, ব্যবসার কথা চিন্তা করে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারিনি। অ্যাঙ্গাসের কর্তৃপক্ষ তার পরিচয় সম্পর্কে আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে চিঠি পাঠায়। তারপর ওগুলো বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং

টাকাগুলো অ্যাঙ্গাসের অনুরোধে ওই হাসপাতালের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই।'

'পিতার শেষকৃত্যে আসেনি সে?'

'না। এলেও পেত না। জানুয়ারি আমাদের এখানে পুরো গরমের সময়। মর্গের সুবিধে সেকালে তেমন ছিল না; তাই তাড়াতাড়ি সমাধিস্থ করা হয় ভ্যান অ্যাঙ্গাসকে। আর সুযোগ থাকলেই যে আসত সে, আমি মনে করি না। শেষ সম্বল বাপই যখন নেই, এতদূর ছুটে এসে কি লাভ হতো তার?'

মন্তব্যটা যেন মনে ধরেছে ক্যাপ্টেন পিয়েনারের। এই প্রথম মুখ খুলল সে এতক্ষণে। 'ঠিক।'

'ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কবরটা কোথায়?'

'পাহাড়ের ওপর। কবরস্থানে।'

জনসন জুনিয়রের কাছ থেকে স্কুল শিক্ষকের মেয়ে সিসির ঠিকানা নিয়ে বাপ-বেটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সিসির স্বামীর করাত কলের ব্যবসা আছে। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না অফিসে। এক কর্মচারী কারখানার পিছনে মালিকের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল রানা আর পিয়েনারকে। স্থানীয় ভাষায় সিসিকে ওদের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করল সে।

সব শুনে নেতিবাচক মাথা দোলাল মহিলা। 'দাবার কথা মনে আছে। কিন্তু অ্যালবাম…নাহ্! মনে পড়ছে না।'

'আপনার বাবার মৃত্যুর পর তার জিনিসপত্র আপনিই তো পেয়েছেন?'

'না। ওসব বাবার বাড়িতেই আছে। তার অনেক আগেই বিয়ে হয় আমার। তারপর আর ওসব দিকে নজর দেয়ার খুব একটা সুযোগ পাইনি। বাবার বিধবা এক বোন আছেন ও বাড়িতে। তিনিই বর্তমানে ওগুলোর মালিক।'

ঠিকানা নিয়ে আবার পথে নামল ওরা দুজন। ভাইয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই

চোখে পানি এসে গেল বৃদ্ধার। উঠে গিয়ে আলমারির ভেতর থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স বের করে নিয়ে এল। 'বেচারা! সারাদিন এই দাবা নিয়েই পড়ে থাকত। এটাই তো খুঁজছেন আপনারা?'

'না, এটা নয়। আরেকটা জিনিস। একটা অ্যালবাম।'

'অ্যালবাম!' কিছু ভাবল বৃদ্ধা। 'দাঁড়ান, দেখি। আছে মনে হয়। একবার দেখেছিলাম।' ভেতরে চলে গেল সে।

ফিরে এল পুরো দশ মিনিট পর। হাতে একটা চামড়া বাঁধানো অ্যালবাম। 'এই যে, পেয়েছি।'

নিল ওটা মাসুদ রানা। পুরু কভার তুলে ভেতরে তাকাল। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ভ্যান অ্যাঙ্গাসের পারিবারিক অ্যালবাম। সেই ১৯২০ সাল থেকে তোলা নানা উপলক্ষের ছবি। ডি অ্যাঙ্গাসের অ্যাংলো মায়ের বিয়ের পোশাক পরা লাজুক হাস্যিমাখা একটা ছবি দেখল রানা কিছুক্ষণ। '২০ সালে, বিয়ের সময় তোলা। অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন মহিলা। '২৫ সালে জন্ম হয় তার একমাত্র সন্তানের। বিয়ের পাঁচ বছর পর। '৩০ সালে তোলা তাঁর আরেকটা ছবির ওপর নজর পড়ল। শিশু অ্যাঙ্গাসকে কোলে নিয়ে হাসিমুখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাগজ লাল হয়ে এলেও ছবিগুলো এখনও বেশ স্পষ্ট। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আবার থামল রানা। জীবনে প্রথম টাট্টু ঘোড়ার পিঠে ওঠার কসরৎ করছে কিশোর অ্যাঙ্গাস। দূরে দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন ভ্যান অ্যাঙ্গাস। চোখেমুখে তাঁর ফুটে আছে পিতৃত্বের অহঙ্কার। পায়ের সামনে এক দল খরগোশ হুটোপুটি করছে।

সবার শেষের ছবিটার ওপর আবার দৃষ্টি থমকাল রানার। সতেরো বছরের তরুণ, স্মার্ট ডি অ্যাঙ্গাস। পরনে ক্রিকেট ফ্ল্যানেল। উইকেটের দিকে ছুটে আসছে বল করতে। ছবির নিচে ক্যাপশন ঃ ডি অ্যাঙ্গাস,

ক্যাপ্টেন অভ ক্রিকেট, মেরেনস্কি হাই স্কুল, ১৯৪৩। ওটাই শেষ ছবি। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল রানা ছবিটার দিকে। ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে চেহারা।

'আমরা অ্যালবামটা নিয়ে যেতে পারি?' রানার মনের ভাব টের পেয়ে আগেভাগে নিজে থেকেই বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন অ্যান্ড্রিয়াস।

'হ্যাঁ।'

'আপনার ভাই কখনও মিস্টার ভ্যান অ্যাঙ্গাসের গল্প করেছেন আপনার সঙ্গে?'

'করবে না কেন! অনেকবার। কতদিনের পুরানো বন্ধুত্ব ছিল ওদের।'

'কিভাবে অ্যাঙ্গাস মারা যান, শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। কেন, আপনাদের বলেনি বুড়ো জনসন? আসলে বুড়োর স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যাঙ্গাস মারা গেছে একটা হিট্-অ্যাণ্ড রান অ্যাকসিডেন্টে।' কথাটা কানে যাওয়ামাত্র শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'ছেলেকে রিসিভ করতে কেপ টাউন যাচ্ছিল সে। পথের মাঝে গাড়ির ফুটো হয়ে যাওয়া টায়ার বদল করার সময় একটা দ্রুতগামী ট্রাক চাপা দেয় বেচারা অ্যাঙ্গাসকে। প্রথমে ধারণা করা হয়, ট্রাক চালক মাতাল ছিল। কিন্তু...।' আচমকা থেমে গেল বৃদ্ধা, চেপে ধরল নিজের মুখ। আড়চোখে মাসুদ রানার কঠিন মুখের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন এক পলক।

'দুঃখিত। এসব নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না আমার। সে যাই হোক, সেই চালকটির খোঁজ আর কোনদিন পাওয়া যায়নি।'

গাড়িতে এসে উঠল রানা আর পিয়েনার। রানা গম্ভীর। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টোকা মারছে অনবরত অ্যালবামের শক্ত চামড়ার ওপর।

'এবার?' বলল ক্যাপ্টেন।

'পাহাড়ে। কবরস্থানে।'

ভুরু কুঁচকে গাড়ি স্টার্ট দিল পিয়েনার। ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের মাইল দুয়েক

উত্তরে, ছোটখাট এক পাহাড়ের ওপর জায়গাটা। কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত, সমাহিত। ঠিক কবরের মতই। অনেক নিচে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফ। ছবির মত। বিশাল এক মাওয়াটাবা গাছের নিচে ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কবর। ওর মাথার কাছে পাথরের স্মৃতি ফলকে বসে অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠে গান গাইছে ছোট একটা নাম না জানা পাখি। যেমন সুন্দর সুর, তেমনি পাখির চেহারা।

রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে গান থামিয়ে গলা টান করে উড়ি উড়ি ভাব নিয়ে বসে থাকল পাখিটা। কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা। চোখ বোলাল ফলকে। গ্র্যানিট পাথরে খোদাই করে লেখা ঃ ভ্যান অ্যাঙ্গাস, জন্ম ১৮৭৯, মৃত্যু ১৯৪৬, অলওয়েজ উইথ গড। অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে চেয়ে থাকল ও।

পায়ের কাছে একটা জংলা গাছের লম্বা ডালওয়ালা ফুল ছেঁড়ার জন্যে ঝুঁকল ও। বিপদ ভেবে সুড়ুৎ করে উড়াল দিল পাখি। ফুলটা নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে কবরের মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। আলতো করে রেখে দিল ওটা ভ্যান অ্যাঙ্গাসের বুক সোজা। তাজ্জব হয়ে ওর কার্যকলাপ দেখছে পিয়েনার দূর থেকে।

একটু পর রওনা হলো ওরা ফিরতি পথে। পিছন ফিরে পাহাড়টার দিকে তাকাল রানা শেষবারের মত। গাঢ় মেঘ জমেছে ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের আকাশে। এখনই নামবে হয়তো বৃষ্টি। সে বৃষ্টিতে সব পাপ-পঙ্কিলতা হয়তো ধুয়েমুছে যাবে, যাবে না কেবল একটি সত্য, গোপন করে যাওয়া চরম এক সত্য। যা আবিষ্কার করেছে হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসা অনুসন্ধিৎসু এক বাঙালি যুবক, মাত্র কিছুক্ষণ আগে।

কবরে ফুল দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করবে বলে মুখ ঘোরাল অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। কিন্তু চোখ বুজে রানাকে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে করল না।

*

মস্কো। ইয়াসিনেভোর সাততলা ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের চারতলায়, নিজের বিশাল অফিস রূমে চিন্তিত মুখে বসে আছেন এর প্রধান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ। ছয় ফুটের মত লম্বা ভদ্রলোক। বয়স বাষট্টি। গোল থালার মত বড়সড় মুখটা টকটকে লাল। বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় নীল চোখ। সোনালি চুল, এলোমেলো। জানালা দিয়ে সড়কের দু' পাশে বরফের টুপি পরে দণ্ডায়মান সারি সারি পাইনের দিকে চেয়ে আছেন তিনি।

আজ রোববার। সরকারি ছুটির দিন। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী সবাই পেরেদেলকিনোয় তাঁর দাচায় অবসর কাটাতে গেছে। যেতে পারেননি কেবল জেনারেল বরিসভ। এ ধরনের উঁচু পদে থাকলে যা হয়; বিনা নোটিসে ঘাড়ে এসে চাপে ঝামেলা, আজও তাই হয়েছে। কোপেনহেগেন থেকে জরুরি এক বার্তা আসার কথা, তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বসে আছেন তিনি প্রায় জনমানবহীন এফসিডি বিল্ডিঙে।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠলেন বরিসভ। রিসিভার তুললেন।
'ইয়েস?'

'কমরেড মেজর জেনারেল ভ্লাদিমির চেরনোভস্কি লাইনে অপেক্ষা করছেন, কমরেড জেনারেল।'

'লাইন দাও,' কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে উঠল তাঁর। 'ভ্লাদিমির, কি ব্যাপার? এমন অসময়ে?'

'হ্যাঁ, দুঃখিত। বাসায় না পেয়ে দাচায় চেষ্টা করেছিলাম। লুদমিলা বলল কি কাজে অফিসেই রয়েছ তুমি।'

'হ্যাঁ। জরুরি একটা কাজ পড়ে গেছে। সে যাক, বলো, কি খবর?'

'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। খুব জরুরি, বরিসভ।'

'বেশ তো, চলে এসো। নাকি চাইছ, আমি আসি?'

'এলে খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, কাল আসা যাবে।'

'কাল নয়, বরিসভ। আজই।'

'আজই!' কপালও কুঁচকে উঠল এবার জেনারেলের। 'ভ্লাদিমির, ব্যাপার কি? কোন অসুবিধে?'

'সামনা-সামনি বলব।'

ঠিক, নিশ্চয়ই কোথাও কোন ঝামেলা হয়েছে। চেরনোভস্কি তাঁর স্কুল জীবনের বন্ধু। খুব সহজে উতলা হওয়ার মানুষ তিনি নন। খুব সম্ভব জটিল কিছু হবে। 'অল রাইট, স্টারেট। কোথায় আসতে হবে?'

'আমার বাসায় চলে এসো।'

'কখন?'

'সন্ধেয়। ধরো, ছ'টায়?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন বরিসভ। যাও বা একটু আশা ছিল বিকেলে দাচায় যাওয়ার, দিল ব্যাটা নষ্ট করে। তবে তা নিয়ে মনে আক্ষেপ নেই তাঁর। ভ্লাদিমির যখন এত জরুরিভাবে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই মারাত্মক কিছু না হয়ে যায় না। ক্ষতিটা পুষিয়ে যাওয়ার চান্স আছে। 'ঠিক আছে। ঠিক ছ'টায় পৌঁছে যাব আমি।'

'ধন্যবাদ,' চেপে রাখা দম ছাড়লেন চেরনোভস্কি। 'তোমার জন্যে স্পেশাল ভদকা রেডি থাকবে।'

রিসিভার রেখে দিলেন জেনারেল বরিসভ। বেশিরভাগ রুশ থেকে উল্টো তিনি, মদ খুব একটা পছন্দ করেন না। যখন করেন, হয় আমেরিকান ব্র্যাণ্ডি, নয়ত স্কচ। ওগুলো তাঁর জন্যে লণ্ডন থেকে আসে। বহু বছর ওদেশে কাটিয়ে এসেছেন জেনারেল। তখনই রুচির পরিবর্তন ঘটে তাঁর। ভদকা

তেমন রোচে না। তবুও, খেতেই হয় মাঝেমধ্যে, নানান সরকারি পার্টিতে-ফাংশানে। তা-ও বড়জোর ভদকা। ভদকা? নাক কোঁচকালেন জেনারেল, অসহ্য!

ঠিক ছ'টায় মেজর জেনারেলের স্পাসকায়া প্রসপেক্টের ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন বরিসভ। সাইবেরিয়ান শার্ট, কর্ড ট্রাউজারস আর নরম সোলের জুতো পরা চেরনোভস্কি নিজেই দরজা খুললেন। ভদ্রলোক পার্মানেন্ট ব্যাচেলর। আধ গ্লাস করে কড়া ভদকা নিয়ে মুখোমুখি বসলেন দুই বন্ধু। টুকটাক মামুলি দুয়েকটা বাক্য বিনিময়ের পর বরিসভই প্রথম প্রসঙ্গ তুললেন। 'তারপর, স্টারেট, বলো কি সমস্যা।'

চেরনোভস্কি তার তিন-চার বছরের বড়। তাবে সার্ভিসে এক র‍্যাঙ্ক নিচে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাশভারি মানুষ। চেহারা অনেকটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের মত। সহকর্মীরা প্রায় সবাই তাঁকে পছন্দ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে। তারাই মেজর জেনারেলের নাম দিয়েছে স্টারেট। অর্থাৎ, দ্য ওল্ড ম্যান বা বন্ধু।

বরিসভের চোখে চোখ রাখলেন চেরনোভস্কি। 'আমাদের বন্ধুত্ব কত বছরের ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ?'

বিস্মিত হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। 'এটা আবার কেমন প্রশ্ন?'

'বলোই না।'

'বহু বছরের। সত্যি কথা বলতে, স্মরণাতীত কালের।'

'এর মধ্যে আমি কি তোমার কোন অসুবিধে করেছি? কখনও?'

'তোমার হয়েছে কি, চেরনোভস্কি?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'তুমি আমার বন্ধু, তুমি কেন আমার অসুবিধে করতে যাবে?'

'আবারও ঘুরিয়ে বলছ?'

'আচ্ছা বাবা, না। করোনি। হলো?' হয়েছে কি আজ ওর? ভাবলেন

তিনি।

'তাহলে তুমি কেন এই শেষ বয়সে আমার ডিপার্টমেন্টের পিছনে লেগেছ?'

প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে বসলেন বরিসভ। এ অভিযোগ কেন আমার বিরুদ্ধে?

'কি ঘটেছে তোমার ডিপার্টমেন্টে, খুলে বলছ না কেন, ভ্লাদিমির?'

'কি আর ঘটবে!' তীব্র হতাশা আর আক্ষেপ প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠে। 'বরবাদ করে দেয়া হয়েছে আমার সব। বারোটা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে এস-এর। হয় তুমি রয়েছ এর পিছনে, নয়ত জানো কী চলছে ভেতরে ভেতরে। কি করে কাজ চালাব আমি, যেখানে আমার সেরা মানুষগুলোকে, সেরা ডকুমেন্টস, ফ্যাসিলিটিজ সব বিনা নোটিসে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে? আমার এত বছরের সাধনা…সব এক নিমেষে তছনছ করে দেয়া হয়েছে!'

সম্ভবত এই প্রথম ভ্লাদিমির চেরনোভস্কিকে রাগতে দেখলেন এফসিডি চীফ। অথচ সবাই জানে এঁর মত ঠাণ্ডা মানুষ খুব কমই হয়। মনের ভেতর সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল লেফটেন্যান্ট জেনারেলের। যা-ই ঘটে থাকুক, ঘটেছে। অথচ তিনি জানেন না বিন্দু বিসর্গ। কেন? তিনি ডিরেক্টরেট চীফ, তাঁকে না জানিয়ে 'এস'-এঁর ওপর হাত দেয়ার ক্ষমতা নেই কারও। অন্তত তা তাঁর নলেজে থাকতে হবে। ব্যাপার যত গোপনীয়ই হোক। সামনে ঝুঁকে বসলেন জেনারেল বরিসভ। 'স্টারেট, তুমি বিশ্বাস করো আর না-ই করো, আমাদের বন্ধুত্বের শপথ করে বলছি, এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। কিচ্ছু জানি না। সত্যি বলছি। এবার দয়া করে খুলে বলো কি হয়েছে।'

এবার চেরনোভস্কি বিস্মিত হলেন। কারণ তাঁরও জানা আছে, চীফকে না জানিয়ে তারই অঙ্গ সংগঠনে হাত দেয়ার কারও উপায় নেই। কয়েক মুহূর্ত আহাম্মকের মত চেয়ে থাকলেন জেনারেল বন্ধুর দিকে। 'বেশ,

শোনো। প্রথম দিন দুই হারামজাদা এল আমার অফিসে, সেন্ট্রাল কমিটির অনুমোদন নিয়েই। বলল, আমার সেরা ইল্‌লিগ্যালটিকে তাদের চাই। ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও কমিটির নির্দেশ, কি করব, দিয়ে দিলাম। ভেবে দেখো, যাকে আমি নিজে বছরের পর বছর ট্রেনিঙ দিয়েছি ভবিষ্যতে বড় কোন কাজে লাগানোর আশায়, এক কথায় দিয়ে দিতে হলো তাকে।'

'তারপর?'

'ভাবলাম, আপদ বিদেয় হয়েছে। কিন্তু দুদিন পর আবার হাজির ওরা।'

'কারণ?'

'আমার সেরা "লিজেণ্ড" ওদের চাই,' টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিলেন মেজর জেনারেল। 'দশ বছরেরও বেশি লেগেছে আমার ওই কভার স্টোরি ফুলপ্রুফ করতে, জানো?'

কোনটা কি, জানা আছে ভ্যাসেলিয়েভিচ বরিসভের। এক সময় তিনিও ছিলেন 'এস.'-এর প্রধান পদে। এসব তখন তাঁকেও করতে হয়েছে। ধীরস্থির গলায় জানতে চাইলেন, 'কাকে দিয়েছ ওদের?'

'কাকে আবার, মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে! মনে আছে তোমার ওর কথা?'

নীরবে মাথা দোলালেন বরিসভ, আছে। বেশিদিন নয়, মাত্র বছর দুয়েক তিনি 'এস'-এর প্রধান ছিলেন। তবু, এখনও ভ্যালেরিকে মনে আছে তাঁর। অন্যদের কথাও। 'ইনডেন্টগুলোর অথরিটি কে ছিল?'

'টেকনিক্যালি সেন্ট্রাল কমিটি। তবে রেটিং…।' ডান হাতের তর্জনি তুললেন তিনি সিলিঙের দিকে।

কি বোঝাতে চাইছেন বন্ধু, বুঝে নিলেন বরিসভ পলকে। 'ঈশ্বর?'

'কাছাকাছি,' মুখ বিকৃত করলেন চেরনোভস্কি। 'আমাদের প্রিয় জেনারেল সেক্রেটারি। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'হুঁম! আর কিছু?'

'অনেক কিছু। আবারও এসেছিল ওরা।'

'কি চাইল সেবার?'

'চার বছর আগে তুমি ব্রিটেনে যে গোপন ট্রান্সমিটারগুলো স্থাপন করে রেখে এসেছিলে, তার একটা রিসিভার ক্রিস্ট্যাল। এই কারণেই আমি ভেবেছি তুমি এর পিছনে না থেকে পারো না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল জেনারেল বরিসভের। যখন ইল্লিগ্যালস-এর প্রধান ছিলেন তিনি, ন্যাটো তখন ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে পার্সিং টু এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বাড়িয়েই চলেছে আশঙ্কাজনক হারে। এ নিয়ে পলিট ব্যুরোর দুশ্চিন্তা দিন দিন বেড়ে চলছে, ঘন ঘন মীটিঙে বসছে ব্যুরোর সদস্যরা।

এরপর এক সময় তাদের নির্দেশ এল, পশ্চিম ইউরোপে নাশকতামূলক অপারেশন চালানোর জন্যে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রস্তুত করতে হবে অপারেশনের ক্ষেত্র। কন্টিঞ্জেন্সি প্ল্যান তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে যাতে সংক্ষিপ্ততম সময়ের নোটিসে পুরো পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র যুগপৎ কার্যকর করা যায় প্ল্যানগুলো।

ওই নির্দেশের ভিত্তিতেই সে অঞ্চলে অনেকগুলো ক্ল্যানডেস্টাইন রেডিও ট্রান্সমিটার স্থাপন করেছিলেন জেনারেল বরিসভ। ওর মধ্যে তিনটে বসানো হয় ব্রিটেনে। মস্কো থেকে পাঠানো যে কোন বার্তা গ্রহণ করতে সক্ষম অত্যাধুনিক সেট ওগুলো। ওদের মাধ্যমে পাঠানো বার্তার বক্তব্য ধারেকাছে অবস্থানরত কেজিবির কোন এজেন্টকে উদ্ধার করতে হলে বিশেষভাবে তৈরি ক্রিস্ট্যাল রিসিভার ব্যবহার করতে হবে। কোডেড বার্তা ডি-কোড করে দিয়ে তার সময় ও পরিশ্রম, দুটোই বাঁচিয়ে দেয় এই রিসিভার। অবশ্যই তাকে 'প্রোগ্রামড্' ক্রিস্ট্যাল হতে হবে। এগুলো সব

সময় 'এস'-এর স্টোরে, কড়া নিরাপত্তার মাঝে রাখা হয়।

ট্র্যান্সমিটারগুলোর প্রহরার দায়িত্বে ইউরোপে রয়েছে যে সব কেজিবি এজেন্ট. তারা সবাই 'স্লীপার'। জেগে জেগে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম তখনই ভাঙবে, যখন আর কোন এজেন্ট তাদের সামনে সঠিক আইডেন্টিফিকেশন কোডটি উচ্চারণ করবে।

'রিসিভার কোনটা নিয়ে গেছে,' যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি, এমনভাবে জানতে চাইলেন বরিসভ।

'যেটার নাম তুমি দিয়েছিলে পপলার।'

মাথা দোলালেন এফসিডি প্রধান। নিজ হাতে ব্রিটেনেরগুলো স্থাপন করেছিলেন তিনি। কোথায় কোনটা আছে, কোনটার কোড নেম কি, ওগুলোর পাহারায় যারা রয়েছে, তাদের কার কি নাম, কি কোড নেম, কোড নম্বর, সব আজও পরিষ্কার মনে আছে তাঁর। তিনটেই লণ্ডন ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বসানো আছে। অন্য দুটোর নাম হ্যাকনি এবং সোরেডিচ্। 'আরও কিছু, স্টারেট?'

'হ্যাঁ। মেজর ক্রিপচেঙ্কোকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ডিপার্টমেন্ট 'ভি' বা এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনে ছিল মেজর এক সময়। এখন কিসে আছে জানেন না জেনারেল। 'এর স্পেশালিটি কি?'

'ক্ল্যানডেস্টাইন প্যাকেজ এদেশ ওদেশ আনা-নেয়া করা।'

'মানে স্মাগলিঙ?'

'হ্যাঁ। পশ্চিম ইউরোপের সবগুলো বর্ডার পয়েন্ট তার নিজ হাতের তালুর মতই পরিচিত। জানে কি করে কাস্টমস্ আর ইমিগ্রেশনকে পাশ কাটানো সম্ভব।'

'তোমাকে প্রথমেই বলেছি, স্টারেট, আমি এর কিছুই জানি না। এ আমার অপারেশন নয়, বিশ্বাস করো। কোন সন্দেহ নেই; এটা অনেক

ওপরের মহলের কাজ। তোমার-আমার ধরাছোঁয়ার বাইরের। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা বিপদ ডেকে আনতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করো, লোকসানের কথা ভুলে যাও। আমি খোঁজ-খবর কিছু বের করতে পারি কি না, দেখব। তুমি একদম চেপে যাও সব। ডু নাথিং, সে নাথিং।'

'ঠিক আছে।'

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন এফসিডি চীফ। একেবারে আচমকা চিন্তাটা ঢুকল তাঁর মাথায়। গত প্রায় দুই সপ্তাহ দেখা নেই জিআরইউ প্রধান জেনারেল মার্চেঙ্কোর। কেন? কোথায় তিনি? এর সঙ্গে তাঁর কি কোন যোগসাজশ আছে? জানালার কাঁচ ইঞ্চি খানেক নামিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগালেন জেনারেল কিছুক্ষণ। প্রশ্নটা মাথা গরম করে তুলেছে।

কালই এ ব্যাপারে পুরোপুরি খোঁজ নেবেন তিনি গোপনে। তাঁকে না জানিয়ে কোথায় কি ঘটতে চলেছে, জানার পুরো অধিকার রয়েছে কেজিবির 'ইল্লিগ্যালস তথা এস' ডিরেক্টরেট প্রধানের।

নয়

সুইডিশ পাসপোর্ট নিয়ে একেবারে নির্বিবাদে ইংল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। অ্যারোফ্লোটে প্রথমে জুরিখ পৌঁছল সে মস্কো থেকে। কাস্টমস ঝামেলা চুকিয়ে চলে এল কনকোর্সে। তারপর সুইডিশ পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি একটা খামে পুরে স্থানীয় কেজিবির

এক সেফ হাউসের ঠিকানায় পোস্ট করে দিল।

এয়ারপোর্টেই বেনামে ভাড়া করা কেজিবির এক পোস্ট বক্সে আগে থেকে রাখা ছিল তাতায়েভের নতুন পরিচয় পত্র, বের করে নিল সে ওটা। সুইস কম্পিউটর এঞ্জিনিয়ারের পরিচয় আছে ওতে। ঘণ্টাখানেক পর কানেকটিং ফ্লাইটে ডাবলিনের উদ্দেশে উড়াল দিল তাতায়েভ। একই বিমানে রয়েছে তার এসকর্ট। সে অবশ্য জানে না কাকে এসকর্ট করছে সে। খুব কাছাকাছিই রয়েছে দুজনে, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। ছক যে ভাবে বাঁধা, তাতে চেনারও অবশ্য প্রয়োজন পড়ে না।

ডাবলিন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হোটেলের এক রুমে মিলিত হলো তারা নির্ধারিত সময়। কোন কথা হলো না দুজনের মধ্যে। নীরবে পরনের ইউরোপিয়ান কাপড়-চোপড়, জুতো-মোজা মায় জাঙ্গিয়া পর্যন্ত সব খুলে ফেলল তাতায়েভ। ওগুলো নিজের হাতব্যাগে ভরল এসকর্ট। তার আগেই ওর ভেতর থেকে মেজরের জন্যে নিয়ে আসা ব্রিটিশ পোশাক, জুতো ইত্যাদি বের করে রেখেছে সে।

এরপর বড়সড় একটা লেদার স্যুটকেস এগিয়ে দিল লোকটা মেজরের দিকে। ওর মধ্যে রয়েছে নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ এটা-ওটা। হোটেল রুমে আসার আগে, এয়ারপোর্টের মেসেজ বোর্ডে পিন দিয়ে গেঁথে রাখা একটা খাম সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে সে। কল্পিত এক নাম লেখা ছিল খামের ওপরে। ভেতরে আগের রাতের এলবানা থিয়েটারের একটা টিকেটের দর্শকের অংশ, নিউ জুরি'স হোটেলে রাত কাটানোর রিসিট এবং এয়ের-লিঙ্গাসের লণ্ডন-ডাবলিন-লণ্ডন রুটের একটা টিকেট ছিল, যার 'আপ' ব্যবহার করা হয়েছে, ডাউন বহাল।

এবং ভ্যালেরি তাতায়েভের নতুন পাসপোর্ট। বিশাল ল্যাভেটরির ভেতরের এক সিঙ্কের তলায় স্কচ্ টেপ দিয়ে আটকানো ছিল, ওটাও সংগ্রহ

করে নিয়ে এসেছে এসকর্ট। তৈরি হয়ে যখন কনকোর্সে ফিরে গেল তাতায়েভ, কেউ ভাল করে তাকালই না তার দিকে। ডাবলিনে একদিনের বিজনেস ট্রিপ সেরে লণ্ডন ফিরে চলা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের দলে ভিড়ে মিলেমিশে গেছে সে।

ডাবলিন-লণ্ডন রুটে পাসপোর্ট চেকিঙের ঝামেলা নেই, লণ্ডন পৌঁছে যাত্রীকে কেবল বোর্ডিং পাস বা টিকেটের অবশিষ্টাংশ দেখালেই মামলা খতম। হিথ্রোর এক্সিটওয়েয়ের দু' পাশে স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুজন দাঁড়িয়ে আছে উদাস ভঙ্গিতে। দেখলে মনে হবে কিছুই দেখছে না। আসলে প্রায় কোনকিছুই তাদের চোখ এড়ায় না।

নিশ্চিন্ত মনে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এল ভ্যালেরি তাতায়েভ। এই প্রথম ভ্যালেরিকে দেখছে তারা, তবু কিছু জিজ্ঞেস করল না। করলে দেখতে পেত মার্টিন ফ্ল্যানারি একজন খাঁটি ইংলিশম্যান। অন্তত তার পাসপোর্টে সেরকমই বলত। এবং ওটা মোটেই জাল নয়, খোদ লণ্ডন পাসপোর্ট অফিস থেকে ইস্যু করা। কাস্টমস পেরিয়ে এল মেজর বিনা চেকিঙে। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল কিংস ক্রস স্টেশনের দিকে। ওখানকার লেফট-লাগেজ লকারে তার জন্যে রাখা আছে একটা সীলড্ প্যাকেট। দু'দিন আগে মস্কো থেকে এসেছে ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে, লণ্ডনের রুশ দূতাবাসে।

দূতাবাসের কেজিবির এক অপারেটর প্যাকেটটা রেখে গেছে লকারে। বেনামে ভাড়া নিয়ে রাখা কেজিবির এরকম অসংখ্য লকার, পোস্ট বক্স আছে এদেশে। প্রতিটির ডজন খানেক করে চাবি রয়েছে, নকল করে বানিয়ে নিয়েছে নিজেরা। ওর একটা ভ্যালেরির কাছেও আছে। প্যাকেটটা হ্যাণ্ডগ্রিপে ভরে ফেলল ভ্যালেরি। ভেতরে কি আছে দেখার তাড়া নেই। সে জানে কি আছে ওতে। কাজেই পরে দেখলেও চলবে।

ওখান থেকে আরেকটা ট্যাক্সি চেপে লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে এল সে।

টিকেট কেটে উঠে পড়ল সাফোক কাউন্টির ইপসুইচগামী ট্রেনে। সন্ধে ঠিক সাতটায় সেখানকার গ্রেট হোয়াইট হর্স হোটেলে চেক ইন করল ভ্যালেরি তাতায়েভ। ট্রেনে যদি কোন পুলিস চেক করতে চাইত তার হ্যাণ্ডগ্রিপ, নিঃসন্দেহে চোখ কপালে উঠত তার।

লকার থেকে সংগ্রহ করা প্যাকেটের ভেতর নিরীহ বেড়ালছানার মত শুয়ে রয়েছে একটা ফিনিশ সাকো অটোমেটিক পিস্তল। সঙ্গে পুরো একটা ম্যাগাজিন। প্রতিটি বুলেটের সূঁচোল অগ্রভাগ খুব সতর্কতার সঙ্গে ইংরেজি X এর মত করে কাটা। কাটা অংশটুকু ভরাট করা আছে সিরিশ আঠা ও পটাশিয়াম সায়ানায়িডের মিকশ্চার দিয়ে। কেবল আহতই করবে না ওই বুলেট। যার দেহে বিঁধবে, মিকশ্চারের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু তার অবধারিত। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এছাড়া একটা কভার স্টোরি বা লিজেণ্ডও আছে গ্রিপের ভেতর। মার্টিন ফ্ল্যানারির 'লিজেণ্ড'। যে ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই নেই, তার জীবন বৃত্তান্তকে বলা হয় 'লিজেণ্ড'। যা প্রস্তুত করা প্রচুর ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের ব্যাপার। অস্তিত্বহীন ব্যক্তিটির প্রতিটি বানানো কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে প্রয়োজন হয় হাজারো খুঁটিনাটি, বর্ণনা, সাপোর্টিং ডকুমেন্টস ইত্যাদি।

আসলে এই 'অস্তিত্বহীন' ব্যক্তিটির অস্তিত্ব কোন একসময় ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে, পরিবেশে, মৃত্যু ঘটেছে তার সবার অজান্তে। পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে সে নীরবে, নিভৃতে। ঠিক এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে দুনিয়ার সব বড় বড় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। মরা মানুষটিকে বাঁচিয়ে তোলে ওরা। প্রয়োজনে কাজে লাগাবার উদ্দেশে।

আসল মার্টিন ফ্ল্যানারির মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই, ১৯৭৬ সালে।

জাম্বেজি নদীর দক্ষিণ তীরের গভীর জঙ্গলে পড়ে আছে তার মৃতদেহ অথবা কঙ্কাল যাই হোক। স্কটল্যাণ্ডের কিলব্রাইডে ১৯৫০ সালে জন্ম হয়েছিল মার্টিন ফ্ল্যানারির। বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের অপর্যাপ্ত রেশনিং সিস্টেমের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার বাবা, মারিয়াস ফ্ল্যানারি এবং মা জুলিয়ান ফ্ল্যানারি একমাত্র সন্তান মার্টিনকে নিয়ে তৎকালীন দক্ষিণ রোডেশিয়ায় অভিবাসন গ্রহণ করেন, ১৯৫১ সালে।

মারিয়াস ফ্ল্যানারি ছিলেন কৃষি প্রকৌশলি। একটা চাকরি সেখানে জুটিয়ে নিতে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। নয় বছর চাকরি করার পর, ১৯৬০ সালে ব্যবসা শুরু করেন ভদ্রলোক। মোটামুটি ভালই চলছিল। ১৯৭১ সাল। ছেলে ততদিনে স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। পড়ছে নামকরা মাইকেলহাউস কলেজে। দেশে তখন তুমুল রাজনৈতিক অসন্তোষ। রোডেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আয়ান স্মিথকে গদিচ্যুত করতে জশুয়া নকোমোর 'যিপ্রা' (জেড আই পি আর এ) এবং রবার্ট মুগাবের 'যানলা' (জেডএএনএলএ), এই দুই গেরিলা বাহিনী বদ্ধপরিকর। চারদিক থেকে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে তারা। তাদের বেপরোয়া অগ্রাভিযান দেখে সরকারী বাহিনী দিশেহারা।

আইন করা হলো দেশের প্রতিটি সক্ষম যুবককে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। বাধ্য হয়ে কলেজ ত্যাগ করতে হলো মার্টিনকে। রোডেশিয়ান লাইট ইনফ্যান্ট্রিতে নাম লেখাল সে। এর কয়েক বছর পর ১৯৭৬ সালে, জাম্বেজির দক্ষিণ তীরে যিপ্রা বাহিনীর অ্যামবুশের মাঝে পড়ে যায় মার্টিন এবং নিহত হয়।

মারা যাওয়ার সময় মার্টিনের সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র ছিল না। ছিল তার মেয়ে বান্ধবীর পাঠানো একটা চিঠি। কমব্যাট জ্যাকেটের পকেটে ছিল চিঠিটা। পরে জাম্বিয়া নিয়ে আসা হয় চিঠিটা আরএলআই হেডকোয়ার্টার্সে

জমা দেয়ার জন্যে। একদিন সেটা গায়েব হয়ে যায় এবং কেজিবির হাতে পড়ে।

সে সময় লুসাকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ছিল কেজিবির সিনিয়র এক অফিসার, ভ্যাসিলি সলোদভনিকভ। আফ্রিকার দক্ষিণাংশের দেশগুলোতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করত সে। চিঠিটা মার্টিনের বান্ধবী লিখেছিল তার শহরের ঠিকানায়, মারিয়াস ফ্ল্যানারির কেয়ারে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাপ-ছেলে জন্মগতভাবে ব্রিটিশ।

ব্যাপারটাকে বোনাস হিসেবে ধরে নিল সলোদভনিকভ। রোডেশিয়ায় থাকলেও তাদের দুজনেরই ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে। ওগুলো সমর্পণ করেনি মারিয়াস বা মার্টিন। অতএব 'লিজেণ্ড' তৈরির কাজে লেগে পড়ল সে, বেঁচে উঠতে হলো মার্টিন ফ্ল্যানারিকে।

স্বাধীনতা পেয়ে রোডেশিয়া হলো জিম্বাবুয়ে। মনের দুঃখে মারিয়াস এবং জুলিয়ান সে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু ছেলে, মার্টিন, 'ব্রিটেনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল'। অদৃশ্য এক হাত লণ্ডনের সমারসেট হাউসে সংরক্ষিত মার্টিনের বার্থ সার্টিফিকেটটা সরিয়ে ফেলল। অন্য আরেক হাত তার নাম ঠিকানার ওপর ভিত্তি করে নতুন একটা পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত পাঠাল ডাক মারফত। দরখাস্ত পরীক্ষা করে দেখা হলো, এরপর মার্টিন ফ্ল্যানারির পাসপোর্ট পেতে দেরি হলো না বিশেষ।

নিখুঁত, ফুলপ্রুফ লিজেণ্ড প্রস্তুতের কাজে প্রয়োজন হয় 'অতি বিশেষ' যত্নের। প্রচুর সাহায্যকারী এবং অর্থের। সেই সঙ্গে সময়। প্রথম দুটোর অভাব কেজিবির কখনও ছিল না, ছিল না ধৈর্যের অভাবও। একেকটা লিজেণ্ডকে নিখুঁত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে কখনও কখনও অবিশ্বাস্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কেজিবি। যেমন করেছে মার্টিন ফ্ল্যানারির ব্যাপারে—এতে লেগেছে প্রায় দশ বছর।

'দেশে ফিরে এসে' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে ফ্ল্যানারি। সময় শেষ

হওয়ার আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স রিনিউ করিয়েছে নিয়মিত। বেশ কয়েকটা গাড়ি তার নামে কেনাবেচা হয়েছে যাতে ভেহিকেল লাইসেন্সিং সেন্টার কম্পিউটর চেক করলেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। কেজিবির এক দঙ্গল জুনিয়র স্টাফ নিষ্ঠার সাথে ফ্ল্যানারিকে বাঁচিয়ে রেখেছে লণ্ডনের কাগজে-কলমে।

আরও আছে। লিজেণ্ডারি চরিত্রটির অতীত জানতে লেগে পড়ে আরেক দল। তার ডাকনাম কি ছিল? শিশুকালে বাপ-মা আদর করে তাকে কি বলে ডাকত? কোন প্রিপারেটরিতে প্রথম ভর্তি হয়েছে সে, তারপর কোন স্কুল, কলেজ? স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষককে পিছন থেকে কি বলে খেপাত সে? তার কুকুরের কি নাম ছিল? কবে বাথরুমে আছাড় খেয়ে তার থুতনি কি আর কোথাও কেটে গিয়েছিল?

ঠিক এমনি এক সন্দেহাতীত লিজেণ্ড বহন করছে ভ্যালেরি তাতায়েভ তার মাথায় এবং হ্যাণ্ডগ্রিপে। সে-ই মার্টিন ফ্ল্যানারি, প্রমাণ করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না। ডরসেটের ডরচেস্টার থেকে এসেছে সে, একটি সুইস বেজড্ কর্পোরেশন মার্কেটিং কম্পিউটর সফটওয়্যার কোম্পানির নতুন শাখা খুলতে। ডরচেস্টারের বারক্লেজ ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা আছে মার্টিন ফ্ল্যানারির। দুয়েক দিনের মধ্যেই টাকাটা কলচেস্টারে ট্র্যান্সফার করতে যাচ্ছে সে।

ব্রিটেন এমনই এক দেশ, যে দেশে কোন ইংলিশম্যানের পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে ঘোরার প্রয়োজন পড়ে না। ড্রাইভিঙ লাইসেন্স, নিদেন তাকে উদ্দেশ করে লেখা কোন চিঠি, যথেষ্ট। অতএব, এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই, গ্রেট হোয়াইট হর্স হোটেলে রাজকীয় ডিনার সেরে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ভাবল মেজর ভ্যালেরি আলেক্সেইভিচ তাতায়েভ। রিসেপশন ডেস্ক থেকে ইয়েলো পেজ ডাইরেক্টরিটা রুমে আনিয়ে নিল সে।

খুঁজে বের করল এস্টেট এজেন্ট সেকশন।

*

'এবার?' প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। 'কোত্থেকে আরম্ভ করতে চান নতুন করে, মেজর?'

'এখান থেকে,' ডি অ্যাঙ্গাসের জীবন বৃত্তান্তের এক জায়গায় দুটো টোকা দিল মাসুদ রানা। 'ওরা দুজন ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ার পর থেকে। দ্বিতীয় সৈনিকটির ব্যাপারে কিছু তথ্য চাই।'

'দ্বিতীয় সৈনিক?'

'যে অ্যাঙ্গাসকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়েছিল ট্রাক থেকে।'

'কিন্তু সে তো মৃত!'

'জানি,' অন্যমনস্কের মত বলল রানা। 'কেবল 'সঙ্গী' বলে তার উল্লেখ করেছে অ্যাঙ্গাস এখানে, নাম কি ছিল, লেখেনি। কেন?'

'হতে পারে প্রয়োজন মনে করেনি।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হতে পারে।'

'অথবা হয়তো জানিয়েছিল কাউকে।'

'সৈনিকটির পরিচয় জানতে হবে,' যেন শুনতে পায়নি ক্যাপ্টেনের বক্তব্য, এমন ভাবে বলল রানা।

'তা কি করে সম্ভব, মেজর? মাইণ্ড ইট, কয়েক দশক আগে মারা গেছে লোকটা। কোন পোলিশ ফরেস্টে পুঁতে ফেলা হয়েছে তার লাশ। এত বছর পর সেই স্থানটিই বা লোকেট করব কিভাবে?'

'অ্যাঙ্গাসের মতে ১৯৪৪ সালের বড়দিনের ঠিক দু'দিন আগে জার্মান অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছিল তার ইউনিট, স্টালাগ থ্রী ফোর ফোর। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'এই স্টালাগের কেউই কি বেঁচে নেই? নিশ্চয়ই আছে।'

'পেয়েছি,' মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন পিয়েনারের।

'যুদ্ধফেরত প্রাক্তন সৈনিকদের একটা সংগঠন আছে, 'অর্ডার অভ টিন হ্যাটস' । এর সদস্যদের বলা হয় মথ । গোটা ছয়েক শাখা আছে এর । ওদের কাছে খোঁজ নেয়া যেতে পারে ।'

খুব উৎসাহ নিয়ে টেলিফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পিয়েনার । কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই সব উৎসাহ-উদ্দীপনা তার উবে গেল কর্পূরের মত । 'নাহ, হলো না । কেউ কোন সঠিক তথ্য দিতে পারছে না, উল্টোপাল্টা বলে । দেখি, সবাইকে ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছি । অনুরোধ করেছি খোঁজ-খবর নিয়ে সম্ভব হলে জানাতে । দেখি কি হয় ।'

'প্রিটোরিয়ায় ক'টা টিন হ্যাটস্ আছে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা ।

'দুটো ।'

আসন ছাড়ল ও । 'চলুন, ঘুরে আসি ওদের ওখান থেকে ।'

'যাবেন? চলুন ।'

দরজা খুলেছে রানা বেরিয়ে পড়ার জন্যে, এমন সময় ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোন । থেমে পড়ল ও, রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করেছে পিয়েনার । দুর্বোধ্য ভাষায় গড় গড় করে কী সব বলছে । বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনকে । ভুরু কুঁচকে দোড়গোড়ায় অপেক্ষা করছে রানা ।

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ঘুরে তাকাল অ্যানড্রিয়াস । 'কেপ টাউন থেকে ফোন করেছে এক লোক । বলছে, স্টালাগ থ্রী ফোর ফোরে ছিল সে ।'

দ্রুত ডেস্কের কাছে ফিরে এল মাসুদ রানা । 'ইংরেজি জানে?'

'হ্যাঁ । লোকটা অ্যাংলো,' রিসিভার ধরিয়ে দিল সে ওর হাতে ।

'হ্যালো! মিস্টার হেণ্ডারসন? হ্যাঁ, আমার নাম মাসুদ রানা । আপনাদের স্টালাগ থ্রী ফোর ফোর নিয়ে রিসার্চ করছি আমি...ধন্যবাদ, অনেক দয়া আপনার...হ্যাঁ । ওয়েল, ১৯৪৪ সালের বড়দিনের কথা মনে আছে আপনার, মিস্টার হেণ্ডারসন? জার্মান অ্যামবুশের ভেতর পড়ে দুই

আফ্রিকান সৈনিক ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে···আঁ্যা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের কথাই বলছি। ওদের নাম মনে আছে আপনার? নেই, না? ওয়েল, আপনাদের ইউনিটের সিনিয়র সাউথ আফ্রিকান এনসিও কে ছিলেন বলতে পারেন? আই সী. ওয়ারেন্ট অফিসার অ্যান্থনি!···ওয়ালি অ্যান্থনি? ঠিক মনে আছে আপনার? অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

রিসিভার রেখে দিল রানা। ওয়ারেন্ট অফিসার ওয়ালি অ্যান্থনি, ভাবল ও, সম্ভবত ওয়াল্টার অ্যান্থনি। 'আপনাদের মিলিটারি আর্কাইভে যেতে চাই।'

টোয়েন্টি ভিসাজি স্ট্রীটে কফি রঙের চারতলা এক ভবন, সাউথ আফ্রিকান মিলিটারি আর্কাইভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও অনেক বছর ইংরেজির চল ছিল এদেশের সরকারি কাজকর্মে। পুরো তালিকা ইংরেজিতে লেখা। ওতে একশোরও বেশি অ্যান্থনি আছে। প্রথম অক্ষর ডব্লিউ পাওয়া গেল তার মাত্র উনিশ জনের। মেলে না।

খানিকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে বুঝল রানা, এভাবে হবে না। এ. থেকে ক্রমানুসারে চেক করতে শুরু করল ও ভেবেচিন্তে। ঝাড়া এক ঘণ্টা লাগল নামটা বের করতে। জেমস ওয়াল্টার অ্যান্থনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ওয়ারেন্ট অফিসার ছিলেন। উত্তর আফ্রিকার তবরুক ফ্রন্টে ধরা পড়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের বাকি সময় ইটালি এবং জার্মানিতে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে।

১৯৭২ সালে অবসর নেয়ার আগে কর্নেল পর্যন্ত পদোন্নতি হয় অ্যান্থনির।

'প্রার্থনা করুন মানুষটা যেন বেঁচে থাকে,' বলল পিয়েনার।

'এর ঠিকানা সম্ভবত আপনাদের পেনশন ডিপার্টমেন্ট দিতে পারবে।'

হ্যাঁ, জানা গেল নিয়মিত পেনশনের টাকা তুলছেন কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) জেমস ওয়াল্টার অ্যান্থনি। জোহান্সবার্গের একশো মাইল দক্ষিণে অরেঞ্জভিল নামে ছোট এক শহরে সস্ত্রীক থাকেন তিনি। খুশি মনে

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা আর অ্যাড্রিয়াস পিয়েনার। রাত নেমেছে একটু আগে। সিদ্ধান্ত নিল রানা, কাল ভোরে রওনা হবে অরেঞ্জভিল।

চারদিক লেক আর ঘন গাছ-গাছালি ঘেরা ছিমছাম শহর। কর্নেলের বাড়ি ছোট এক টিলার ওপর, দূর থেকে ছবির মত লাগে। দরজা খুললেন মিসেস অ্যান্থনি। ক্যাপ্টেন পিয়েনারের পরিচয়পত্রের ওপর নজর বোলালেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে। তারপর বললেন, 'ওদিকে,' হাত তুলে পশ্চিম দিক নির্দেশ করলেন বৃদ্ধা। 'লেকের পাড়ে পাবেন তাকে। মাছ ধরছে।'

কর্নেলও বেশ অনেকক্ষণ ধরে উল্টেপাল্টে পরখ করে দেখলেন কার্ডটা। তারপর ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'কি জানতে চান।'

ছিয়াত্তর বছর বয়স কর্নেলের। কিন্তু দেহের শক্ত বাঁধুনি এখনও বহাল। পরনে টুইড, কড়া পালিশ দেয়া ঝকঝকে কালো শু। 'হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে আছে সব।'

'ওদের দুজনের নাম মনে আছে আপনার, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই। একদিনের পরিচিতের নামও মনে করতে ভুল হয় না আমার কখনও। দুজনেই অল্পবয়সী ছিল ওরা, আফ্রিকানার। একজন ডি অ্যাঙ্গাস। অন্যজন কর্পোরাল ফ্রিক্কি। ফ্রিক্কি ব্রান্ট।'

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রিটোরিয়া ফিরে এল ওরা। আবার এল মিলিটারি আর্কাইভে। ফ্রিক্কি অর্থাৎ ফ্রেডারিখ। এর সঙ্গে যে ব্রান্ট, তার শেষে একটা টি আছে বাড়তি। একটা খুব কমন ডাচ নাম। সুদীর্ঘ সাধনার পর আর্কাইভের এক কর্মচারীর সহায়তায় ছয়জন কর্পোরাল ফ্রেডারিখ ব্রান্টের নাম পাওয়া গেল। তাদের কেউই বেঁচে নেই আজ।

ফাইলগুলো এক এক করে চেক করতে লাগল মাসুদ রানা। দু'জন মারা গেছে উত্তর আফ্রিকা রণাঙ্গণে। দু'জন ইটালিতে। বাকি দু'জনের একজন

ল্যাণ্ডিং ক্র্যাফটের সঙ্গে আটলান্টিকে ডুবে, অন্যজন…। ষষ্ঠ ফাইলের মোড়ক উল্টে স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা।

'একি!' বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে পিয়েনার ফাইলটার দিকে। 'কে করল এ কাজ?'

'কে জানে।' শূন্য দৃষ্টিতে ফাইল দেখছে রানা। 'যে-ই হোক, বহু বছর আগেই ঘটেছে হাত সাফাইটা।'

ভেতরটা শূন্য। কিচ্ছু নেই ফাইলে।

'দুঃখিত। মনে হচ্ছে এখানেই পথের শেষ।'

কোন উত্তর দিল না মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে বেরিয়ে এল আর্কাইভ থেকে। হোটেলে ফিরে কর্নেল (অব:) জেমস অ্যান্থনির নাম্বারে টেলিফোন করল।

'আপনাকে আবার বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত, কর্নেল।'

'দ্যাটস অল রাইট, ইয়াংম্যান। বলুন, কি সাহায্য করতে পারি।'

'কর্পোরাল ফ্রিক্কি ব্রান্টের কোন মেট বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল কি না, মনে করতে পারেন, কর্নেল? আর্মিতে আমার নিজ অভিজ্ঞতায় জানি, প্রত্যেকেরই একজন ক্লোজ মেট থাকে।'

'ঠিকই বলেছেন। থাকে। কিন্তু দুঃখিত, এই মুহূর্তে খেয়াল পড়ছে না। এ নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম আমি, মেজর। মনে পড়লেই জানাব আপনাকে। সে, কাল সকালে?'

'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ, কর্নেল। নামটা পেলে খুব সুবিধে হয় আমার।'

'চিন্তা করবেন না। পেয়ে যাবেন।'

সকাল আটটায় এল বহু কাঙ্ক্ষিত টেলিফোন। 'মনে পড়েছে, মেজর। আরেক কর্পোরাল ছিল ওর মেট। হ্যারিসন, জেমস হ্যারিসন। আর ডিএলআই।'

'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'রয়্যাল ডারবান লাইট ইনফ্যানট্রি।'

ফোন করে অ্যানড্রিয়াসকে আর্কাইভে আসতে বলে ছুটল রানা ট্যাক্সি চেপে। এবার মাত্র পনেরো মিনিট সময় ব্যয় হলো। ফাইল পড়ে জানা গেল হ্যারিসনের জন্ম ডারবানে। যুদ্ধের পর চাকরি ছেড়ে দেয় কর্পোরাল, কাজেই পেনশন পায় না সে। ঠিকানাও নেই।

ডারবানের টেলিফোন ডিরেক্টরি নিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। ক্যাপ্টেন পিয়েনার ওখানকার পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে হ্যারিসনের ঠিকানা বের করার অনুরোধ জানাল। উত্তরের আশায় বসে থাকল ফোনের পাশে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর জেমস হ্যারিসনের নামে ইস্যু করা দুটো পার্কিং টিকেট উদ্ধার করল ডারবান পুলিস। ওতে তার ঠিকানা ফোন নাম্বার আছে, জানিয়ে দিল তারা পিয়েনারকে।

'পরিষ্কার মনে আছে ফ্রিক্কির কথা,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জবাব দিল হ্যারিসন। '...হ্যাঁ, হ্যাঁ। জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। না, আর কখনও দেখা হয়নি তার সঙ্গে।'

'সার্ভিসে কোত্থেকে এসেছিল ফ্রিক্কি, জানেন?' প্রশ্ন করল পিয়েনার।

'ইস্ট লণ্ডন।'

'তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'তেমন কিছু না,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল হ্যারিসন। 'পরিবারের ব্যাপারে খুব একটা কিছু বলত না ও। তবে একবার যেন...মনে পড়েছে! একবার শুনেছিলাম, ওর বাবা ওখানকার রেলওয়ে ইয়ার্ডের শান্টার ছিল। এইটুকুই।'

'ধন্যবাদ।'

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময় ওদের জোহান্সবার্গ-ইস্ট লণ্ডন ফ্লাইট অবতরণ করল বেন স্কোয়েমেন এয়ারপোর্টে। টার্মিন্যাল ভবনটি ছোটখাট।

নীল এবং সাদা রঙে অপূর্ব দেখতে। ইস্ট লণ্ডন দক্ষিণ আফ্রিকার চার নম্বর বাণিজ্যিক কেন্দ্র। সামনের কার পার্কে ইনসিগনিয়া বিহীন একটা পুলিস কার অপেক্ষায় ছিল। ফোর্ড সেলুন। কনকোর্স থেকে ওদের পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এল ওটার চালক।

'কোনদিকে যেতে হবে, ক্যাপ্টেন?' পিয়েনারকে প্রশ্ন করল সে।

নীরবে পাশে বসা মাসুদ রানার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্স। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং,' বলল রানা।

মাথা দুলিয়ে গাড়ি ছাড়ল চালক। এখানকার রেলওয়ে স্টেশন ফ্লীট স্ট্রীটে। বেশ আধুনিক কমপ্লেক্স। বড় রাস্তার পাশে একসার সবুজ ও ক্রীম রঙের একতলা ভবন—প্রশাসনিক দফতর। ভেতরে পিয়েনারের 'চিচিং ফাঁক' মার্কা পরিচয়পত্র দেখে প্রায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কর্মচারীদের মধ্যে। অবিলম্বে ফিনান্স ডিরেক্টরের কক্ষে ডাক পড়ল ওদের। আগ্রহ নিয়ে রানার বক্তব্য শুনলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন কর্মকর্তা। 'প্রতিটি অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীকেই ভাতা দিয়ে থাকি আমরা। আপনার এই লোকের নাম কি যেন বললেন?'

'বলিনি এখনও। তার নাম ব্রান্ট। তবে প্রথম নাম বলতে পারব না, দুঃখিত। লোকটা শান্টার লোকো চালক ছিল অনেক বছর আগে।'

একজন সহকারীকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলেন ডিরেক্টর। বেরিয়ে গেল লোকটা। পনেরো মিনিট পর ফিরে এল একটা পেনশন স্লিপ নিয়ে। ধরিয়ে দিল সেটা বসের হাতে।

'হ্যাঁ। এই যে, পাওয়া গেছে,' বললেন তিনি। 'এই একজনই ব্রান্ট আছে আমাদের তালিকায়। তিন বছর আগে অবসর নিয়েছে। অটো ব্রান্ট।'

'বয়স কত হতে পারে অটো ব্রান্টের?'

চোখ নামিয়ে স্লিপটা দেখলেন ডিরেক্টর। 'তেষট্টি।'

মাথা নাড়ল রানা আপন মনে। ডি অ্যাঙ্গাস আর ফ্রিক্‌কির বয়স যদি একরকম হয়ে থাকে বা তার কাছাকাছি, এবং বাপ-ছেলের বয়সের ব্যবধান ধরা যায় ত্রিশ বছর, তাহলে এ লোকের বয়স নব্বইয়ের ওপরে হতে হবে। বা ওইরকম। ব্যাপারটা জানাল ও ডিরেক্টরকে। কিন্তু তিনি আর সহকারী নিশ্চিত, তালিকায় আর কোন ব্রান্ট নেই।

'সেক্ষেত্রে দয়া করে, সবচে' বেশি বয়সী তিনজন পেনশনিয়ারের নাম-ঠিকানা দিন আমাকে। যারা এখনও বেঁচে আছে।'

মাথা দোলালেন তিনি। 'সম্ভব নয়। এখানে বয়স নয়, অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে লিস্ট সংরক্ষণ করি আমরা।'

হাত ধরে রুমের এক কোণে টেনে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন ডিরেক্টরকে। নিচু কণ্ঠে গড়গড় করে বলতে লাগল কী সব। হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা ডেস্কে ফিরে এসে। সহকারীর উদ্দেশে বলল, 'খুঁজতে শুরু করো পুরো তালিকা। যত লোক পাও লাগিয়ে দাও সবাইকে। ভদ্রলোকের চাহিদা পূরণ না করে উপায় নেই।'

তিন ঘণ্টা পর তিনটে পেনশন স্লিপ নিয়ে ঘরে ঢুকল লোকটা। 'নব্বই বছর বয়সী একজন পেনশনিয়ারকে পাওয়া গেছে। কিন্তু লোকটা টার্মিন্যাল পোর্টার ছিল। আরেকজনের বয়স আশি। ক্লিনার ছিল। শেষের এই লোক মার্শালিঙ ইয়ার্ডের শান্টার ছিল। বয়স একাশি। নাম কৃজ। ফ্রেডরিখ কৃজ। কুইগনির কোথাও বাসা তার,' জানালেন কর্মকর্তা।।

শহরের নিম্ন মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা কুইগনি, মূর স্ট্রীটে। বাসাটা খুঁজে পেতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হলো। কিন্তু পাওয়া গেল না ফ্রেডরিখ কৃজকে। বাসায় নেই সে। মাঝবয়সী এক লোক জানাল, ইনস্টিটিউটে পাওয়া যাবে তাকে। রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবে।

'ফ্রেডরিখ?' পিয়েনারের প্রশ্ন শুনে বলল ক্লাবের বারম্যান। 'শিওর। ওই যে, ওখানে বসে আছে।'

উদাস ভঙ্গিতে দূরের একসার পাহাড় দেখছে বৃদ্ধ। হাতে বিয়ারের ক্যান। খোলা ব্যালকনিতে বড় একটা রঙচঙে ছাতার নিচে বসা। মাথা দুলিয়ে সায় দেয়ার আগে অ্যানড্রিয়াস পিয়েনারের দিকে চেয়ে থাকল বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত। 'খুব মনে আছে ব্রান্টের কথা। কিন্তু সে তো কবেই মারা গেছে।'

'তার এক ছেলে ছিল ফ্রিক্‌কি। ফ্রিক্‌কি ব্রান্ট।'

'ঠিক। গুড হেভেনস্, ম্যান। প্রায় ভুলে যাওয়া অতীত মনে করিয়ে দিলেন আপনি। হ্যাঁ, ফ্রিক্‌কি। খুব ভাল ছেলে ছিল। স্কুল ছুটির পর মাঝেমধ্যে আসত ইয়ার্ডে। ওর বাবা জো ব্রান্ট ছেলেকে শান্টিং লোকোয় চড়িয়ে ঘোরাত।'

'কতদিন আগের কথা? ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি?'

'হ্যাঁ, হবে হয়তো। জো পরিবার নিয়ে এখানে আসার পরপরই।'

'১৯৪৩ সালের দিকে যুদ্ধে যোগ দিতে যায় ফ্রিক্‌কি, তাই না?'

আবার উদাস হয়ে গেল বৃদ্ধ। যেন কয়েক দশক পিছনে ফেলে আসা অতীত দেখার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ। আর ফিরল না ছেলেটা। যুদ্ধে পোল্যাণ্ডের কোথায় নাকি মৃত্যু হয়েছে তার। খবর পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল জো। ছেলেই ছিল তার সব। তাকে নিয়ে অনেক আশা-ভরসা ছিল। তারপর...টেলিগ্রামে ফ্রিক্‌কির মৃত্যু-সংবাদ শোনার অল্প কয়েক বছর পর জো'রও মৃত্যু হলো। পঞ্চাশ সালে। লোকটার দুঃখের কথা মনে পড়লে এখনও কষ্ট হয়। এরপর তার বউটাও মরল।'

'একটু আগে আপনি বললেন, ''জো পরিবার নিয়ে এখানে আসার পরপরই''। কোত্থেকে এসেছিলেন জো? দক্ষিণ আফ্রিকার কোন অংশ থেকে?' মাসুদ রানা প্রশ্ন করল। অনুবাদ করে দিল পিয়েনার।

মুখ দেখে মনে হলো যেন অবাক হলো ফ্রেডরিখ কুজ। 'দক্ষিণ আফ্রিকা!'

'তারা তো আফ্রিকানার ছিল, তাই না?' মৃদু কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন।

আরও অবাক হলো বৃদ্ধ। 'কে বলেছে আপনাদের?'

'আমরা তো তাই জানি। তাছাড়া আর্মির রেকর্ডেও সেরকমই লেখা।'

'ও, বুঝেছি,' হাসল লোকটা। 'ফ্রিক্‌কি চালাকি করেছে। আফ্রিকানার বলে চালিয়ে দিয়েছে নিজেকে আর্মিতে।'

'তাহলে ওরা...?' প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না হতভম্ব পিয়েনার।

'জার্মান ছিল।'

'জার্মান!'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন। ইমিগ্রান্টস্।'

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল রানা, 'বহিরাগতদের রেকর্ডস কারা সংরক্ষণ করে আপনার দেশে?'

'প্রিটোরিয়ার ইউনিয়ন বিল্ডিং।'

হাতঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'জেনারেল গেরহার্ডকে একটা টেলিফোন করতে চাই।'

'শিওর। পুলিস স্টেশনে চলুন।'

ওটাও ফ্লীট স্ট্রীটেই। দোতলা, হলুদ ইঁটে তৈরি। রানার অনুরোধের উত্তরে বললেন জেনারেল, 'নিশ্চয়ই। অপেক্ষা করুন। চেক করছি আমি।'

ভাগ্যই বলতে হবে, ইউনিয়ন বিল্ডিঙের প্রায় সব কিছুই কম্পিউটর নিয়ন্ত্রিত। দু'মিনিটে ফাইল নম্বর বের করে ফেলল ওরা জেনারেল গেরহার্ডের নির্দেশে। ফাইলটা বের করে টেলেক্স মেশিনের সামনে বসল রেকর্ড কীপার স্বয়ং।

ইস্ট লণ্ডন পুলিস স্টেশনে কফি পান করার ফাঁকে মেসেজটার ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। তারপর নির্বিকার মুখে তুলে দিল ওটা অ্যানড্রিয়াসের হাতে।

দীর্ঘ মেসেজটা পড়া শেষ করে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল সে, 'গুড গড! কে

ভেবেছিল?'

'এখানে ইহুদিদের কোন উপাসনালয় আছে?' এক পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে, পার্ক অ্যাভিনিউতে। মাত্র দু'মিনিটের পথ।'

ধপধপে সাদা রঙ করা, ওপরে কালো গম্বুজ। গম্বুজের শীর্ষে স্টীলের দণ্ড, ডেভিডের নক্ষত্র ধরে রেখেছে ওটা। প্রায় ফাঁকা সিনাগগ। একজন কেয়ারটেকার আছে কেবল। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে বয়স। মাথায় উলের কালো বনেট। মাসুদ রানার প্রশ্নের উত্তরে সিনাগগের বর্তমান র‍্যাবির ঠিকানা বলল লোকটা। বলল, 'তাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।'

কেয়ারটেকার সমবয়সীই হবে র‍্যাবি। তবে বেশ স্বাস্থ্যবান। গাল ভরা কাঁচাপাকা দাড়ি। আয়রন গ্রে চুল। এক নজর দেখেই বুঝে নিল মাসুদ রানা, একে খুঁজছে না ও। খুঁজছে আরও অনেক বয়স্ক একজনকে।

'আপনার আগে কে র‍্যাবি ছিলেন এখানে, বলতে পারেন?' প্রশ্ন করল ও।

'আমার চাচা। র‍্যাবি শ্যাপিরো।'

'বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় পেতে পারি তাঁকে?'

'ভেতরে আসুন।'

অন্দর মহলের দিকে রানাকে নিয়ে চলল র‍্যাবি। লম্বা করিডরের একেবারে শেষ মাথায় বন্ধ একটা দরজা। দু'বার মৃদু নক করে দরজা খুলল সে।

'আঙ্কেল শ্যাপিরো, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে।'

ঘর অন্ধকার বলে এতক্ষণ কিছু দেখতে পায়নি মাসুদ রানা। চোখ সয়ে

আসতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই ভেতরে চোখ বোলাল ও। আসবাবপত্র প্রায় কিছুই নেই ঘরে। চল্টা ওঠা কার্পেটের ওপর জড় পদার্থের মত বসে আছে থু রে এক বুড়ো। ছানি পড়া চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘন ঘন ওপর-নিচ করছে মুখটা। বোঝা গেল দেখতে পায় না।

ভেতরে ঢুকল রানা। ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে আনেনি এবার। গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছে। দীর্ঘ সময় পর বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল ও।

'এয়ারপোর্ট।'

দশ

একটা কিছু চলছে ভেতরে ভেতরে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাতে জেনারেল বরিসভের। কোন গোপন অপারেশন চালানো হবে হয়ত ব্রিটেনে। মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভের বিশেষত্ব জানা আছে তাঁর। প্রয়োজন পড়লে একজন ইংলিশম্যান, মার্টিন ফ্ল্যানারি হিসেবে সে দেশে পুশ ইন করানোর জন্যে বছরের পর বছর ধরে ঘষেমেজে তৈরি করা হয়েছে তাকে। চেরনোভস্কির কাছ থেকে নিয়ে যাওয়াও হয়েছে। ওরই জন্যে প্রস্তুত সেই লিজেণ্ড।

পপলার ট্রান্সমিটার, ভাবছেন এফসিডি চীফ, উত্তর মিডল্যাণ্ডের কোন এক জায়গায় স্থাপন করেছিলেন তিনি ওটা নিজ হাতে। মেজর ক্রিপচেঙ্কোকে যদি 'প্যাকেজ' চোরাচালানের জন্যে বদলি করা হয়ে থাকে, তাহলে আরও কয়েকজনকেও করা হয়েছে নিঃসন্দেহে। বিভিন্ন ডিরেক্টরেট

থেকে। সে যাই হোক, সব এক সুতোয় বাঁধা। ব্রিটেনেই পাঠানো হচ্ছে মেজর তাতায়েভকে, অথবা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এরই মধ্যে।

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তাঁকে পর্যন্ত জানানো হলো না ব্যাপারটা, এ কেমন কথা? তাঁর কষ্টে লাগানো গাছের ফল খেয়ে আসবে গিয়ে আরেকজন, তাও তাঁকে না জানিয়ে? চেরনোভস্কির ধারণাই ঠিক, জেনারেল সেক্রেটারি নিজেই কোন উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন। কেজিবিকে বাদ দিয়ে।

বিপদের গন্ধ পেলেন ভাদিম ভ্লাদিমিরোভিচ বরিসভ। জি. এস. কোন অভিজ্ঞ ইন্টেলিজেন্স অফিসার নন। তার ওপর অসুস্থ, হার্টের রোগী। মাথারও হয়তো ঠিক নেই। কে জানে কোন্ মহাকেলেঙ্কারিতে ফাঁসিয়ে দেবেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে। যতই জোর গলা করে চেঁচানো হোক না কেন, এদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোর ওপর বিশ্ববাসীর আস্থা একেবারেই নেই বলা চলে। কিছু যদি সত্যিই বেতাল হয়ে যায়, বারোটা বেজে যাবে।

আজ সকালে অফিসে এসেই লোক লাগিয়ে দিয়েছেন জেনারেল গোপনে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে। প্রথমে জিআরইউ প্রধানের সন্ধান বের করবে তারা। সত্যিই তিনি অসুস্থ, না আর কিছু? সেই সঙ্গে আরও কেউ কাজে অনুপস্থিত আছেন কিনা। থাকলে কে কে, কতদিন থেকে, জানতে চান তিনি। খবর আসতে পারে, তাই লাঞ্চ করতে বেরোননি বরিসভ রোজকার মত, সেরে নিয়েছেন অফিসেই।

ঘড়ি দেখলেন তিনি। দুটোর বেশি বাজে, এখনও কারও পাত্তা নেই। গেল কোথায় ব্যাটারা? ভাবতে ভাবতেই ইন্টারকম বেজে উঠল। 'কমরেড জেনারেল! কমরেড "এ" দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'পাঠিয়ে দাও,' হুঙ্কার ছাড়লেন বরিসভ।

ভেতরে ঢুকল রোগা-পাতলা এক যুবক। পিঠটা সামান্য সামনের দিকে বাঁকা। লোকটার পেট আছে কিনা, শার্টের ওপর থেকে ঠাহর করা যায় না।

দেখে মনে হয় ছয় মাস দানাপানি জোটেনি, পেট একেবারে পিঠে ঠেকেছে গিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত হালকা নীল চোখ। সোনালি চুল। চেহারা সব মিলিয়ে হাফ প্রতিভাবানের মত। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, নিচু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে রিপোর্ট করল 'এ', বা আঁদ্রেই। ভেতরের খোঁজ খবর জানার জন্যে সকালে বরিসভ যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের দলনেতা।

ওয়েল ওয়েল ওয়েল, ভাবলেন তিনি। হাড় হাভাতে, হাড়গিলে, ঘাটের মড়া ভিক্টরোভিচও? নামগুলো শোনামাত্র মাথার ভেতরের প্রাকৃতিক কম্পিউটরে 'ফিড' করে ফেলেছেন জেনারেল। ভুল হওয়ার চান্স নেই। 'ঠিক আছে, আঁদ্রেই। ওয়েল ডান। যেতে পারো এবার তুমি। দরকার হলে পরে খবর দেব।'

'ইয়েস, কমরেড জেনারেল।'

যুবক বেরিয়ে যেতে ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি আবার। মনের সুখে ধুমসে গালাগাল করছেন ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভকে। তুমি শালা কেজিবির পুরানো অভিজ্ঞ অফিসার। আর যে থাকে থাকুক, তুমি কেন এর মধ্যে? কিছু যদি উল্টোপাল্টা হয়ে যায়? কোথায় পালাবে তখন? রাখো, প্রতিজ্ঞা করলেন জেনারেল, বার করছি তোমাদের অপারেশন।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। তিন কু-পরামর্শদাতার একজন, ড. পাভলভকে ইচ্ছে করলেই ব্ল্যাকমেইল করতে পারেন বরিসভ। সে রসদ আছে তাঁর হাতে। ওগুলো ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখালে বাপ-বাপ করে পেটের সব কথা উগড়ে দেবে সে, কোন সন্দেহ নেই। তবে তার আগে আরেকটা ব্যাপার জানতে হবে। কষ্ট করে বরিসভ নিজেই জেনে নেবেন, সাহায্য নেবেন না কারও। তাতে বিপদ হতে পারে।

সন্ধের পর মস্কোর বারো মাইল পশ্চিমের এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে হাজির হলেন তিনি। অবসর নেয়ার পর থেকে এই বিল্ডিঙেই আছেন ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভ। ছ' তলায় লিফট থেকে বেরোলে সামনেই দরজা।

প্রতি ফ্লোরে একটাই ফ্ল্যাট এখানে। দরজা খুললেন মিসেস গ্রেগরিয়েভ। স্বামীর ঠিক উল্টো মহিলা। ভীষণ মোটা।

'হ্যালো!' হাসলেন বরিসভ।

কিন্তু মহিলা গম্ভীর। 'কমরেড জেনারেল?'

'কমরেড ভিক্টরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি নেই?'

'না।'

'ও-হো! কোথায় গেছেন?'

'শহরের বাইরে।'

শহরের বাইরে! ভাবলেন বরিসভ। 'আপনাকে রেখে? আয় হায়! ওনার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা, গাড়ি চালালে ক্ষতি হবে না? বিশেষ করে একবার যখন স্ট্রোক...।'

'সঙ্গে ড্রাইভার আছে,' একেঘেয়ে সুরে বলল মহিলা।

'যাক, তাও ভাল। আমি তাহলে চলি।'

'কেন এসেছিলেন, বললেন না?'

'এমনিই। এদিক দিয়েই ফিরছিলাম। ভাবলাম, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, একটু খোঁজ নিয়ে যাই। এই আর কি!'

'ও, আচ্ছা।'

শহরে ফিরে এলেন জেনারেল বরিসভ। চিন্তিত। বাসায় ফিরে কেজিবি মোটর পুলে ফোন করলেন তিনি। নিজের পরিচয় জানিয়ে অ্যাটেনডেন্টকে নির্দেশ দিলেন চীফ ক্লার্ককে ডেকে আনতে, কথা বলবেন তার সঙ্গে। কয়েক সেকেণ্ড পরই লোকটার উৎকণ্ঠিত গলা শুনতে পেলেন বরিসভ। দৌড়ে আসতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে।

'ইয়েস, কমরেড জেনারেল?'

'তুমি একটা দারুণ কাজ করেছ আমার বন্ধুর জন্যে পুলের সেরা ড্রাইভারটিকে পাঠিয়ে, বুঝলে? রিটায়ার্ড জেনারেল ভিক্টরোভিচ

গ্রেগরিয়েভের কথা বলছি। খুব প্রশংসা করলেন তিনি তোমার দেয়া ড্রাইভারের···ইয়ে, কি যেন নাম···?'

'গ্রেগরিয়েভ, কমরেড জেনারেল। ওর নামও গ্রেগরিয়েভ।'

বা বা বা, সোনায় সোহাগা! 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেগরিয়েভ। যাক, শোনো। ক'দিন পর ছুটিতে যাচ্ছে আমার ড্রাইভার। তখন আমার ওকেই চাই।'

'নিশ্চই, কমরেড জেনারেল, নিশ্চই।'

তিন দিন পর লোকটা নিজেই টেলিফোন করল জেনারেলকে। 'কমরেড জেনারেল, সেদিন বলেছিলেন আপনার ড্রাইভার ছুটিতে যাবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'গ্রেগরিয়েভ ফিরে এসেছে, কমরেড জেনারেল। যদি বলেন···'

'কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো ওকে। ঠিক আছে?'

'জ্বি।'

'ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, তোমার প্রমোশনের জন্যে সুপারিশ করব আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল। অনেক ধন্যবাদ।'

নিজের নিয়মিত ড্রাইভারকে ডেকে দু'দিনের জন্যে ছুটি দিয়ে দিলেন জেনারেল। বউ-বাচ্চা নিয়ে বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসার পরামর্শও দিলেন তাকে। কেন যেন খুব রাগ হচ্ছে তাঁর। আমার সঙ্গে বিটলামি? ভাবছেন তিনি, দাঁড়াও। দেখাচ্ছি মজা!

পরদিন অফিস থেকে ফেরার পথে গ্রেগরিয়েভকে কথার জালে একটু একটু করে জড়িয়ে ফেললেন বরিসভ। সে ব্যাটাও তেমনি। একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল তার ব্যাপারে পুলে খোঁজ-খবর নিয়েছেন ফোনে, যা তা কথা! তার ওপর অন্য অসংখ্য ড্রাইভার থাকতেও বেছে নিয়েছেন তাকেই। কাজেই গ্রেগরিয়েভও জেনারেলকে সন্তুষ্ট করতে উদগ্রীব।

'কেমন লাগছে আমার গাড়ি চালাতে, গ্রেগরিয়েভ?'

'খুব ভাল লাগছে, কমরেড জেনারেল।' এত বড় এক অফিসার সাধারণ ড্রাইভারের অনুভূতি জানতে চাইছেন, ব্যাপারটা কল্পনারও বাইরে। গলে গেল লোকটা। 'খুব ভাল লাগছে।

'তোমার খুব প্রশংসা শুনেছি রিটায়ার্ড জেনারেল ভিক্টরের কাছে। ভিক্টরোভিচ গ্রেগরিয়েভের কাছে। আমার খুব বন্ধু মানুষ।'

মুখের কৃতার্থ মার্কা হাসি জমাট বেঁধে গেল ড্রাইভারের, ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন বরিসভ ভিউ মিররের সাহায্যে। তার মানে এ বিষয়ে মুখ খুলতে বারণ আছে তার। 'জানতাম ও নিজেই ড্রাইভ করে,' যেন কথার কথা, গুরুত্বহীন, শুনলে শুনতে পারো, না শুনলে নেই, এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

'জ্বি, আমিও তাই শুনেছি, কমরেড।'

'তারপর? কোথায় কোথায় গিয়েছ ওকে নিয়ে?'

দীর্ঘ নীরবতা। লোকটা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন জেনারেল। 'মস্কোর আশেপাশেই, কমরেড।'

'নির্দিষ্ট কোন জায়গা, গ্রেগ?'

'জ্বি না।'

'ড্রাইভার, গাড়ি থামাও,' এইবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন তিনি।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। তাড়াতাড়ি চইকা লেন ছেড়ে ঢুকে পড়ল দক্ষিণমুখি ট্রাফিকের মিছিলে। কিছুদূর এগিয়ে বাঁ হাতি একটা বাই লেন দেখে সেঁধিয়ে দিল লিমুজিন, দাঁড় করিয়ে ফেলল।

সামনে ঝুঁকে বসলেন বরিসভ। তেমনি কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি জানো আমি কে?'

কুঁকড়ে গেল গ্রেগরিয়েভ। 'জানি, কমরেড জেনারেল।'

'কেজিবিতে কোন পদে আছি জানো?'

দ্রুত মাথা দোলাল লোকটা। 'জানি।'

'এদিকে তাকাও! ঘোরো!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল সে। পরক্ষণেই কলজের পানি বরফ হয়ে গেল জেনারেলের রক্তচক্ষু দেখে। 'সোজা সত্যি কথা বলো, কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে ভিক্টরকে।'

দীর্ঘ সময় নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল ড্রাইভার লোকটা। অভিজ্ঞ লোক, পরিস্থিতি বুঝে নিল। মুখ খোলার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ ছিল মেজর কিরলভের। কিন্তু সে মেজর। আর ইনি...একজন জেনারেল জেনারেলই। 'প্রতিদিন একই জায়গায় নিয়ে গিয়েছি তাঁকে, কমরেড জেনারেল।'

'কোথায়?'

'উসভোয়। কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির দাচায়।'

হুঁম! হিসেবে তাহলে ঠিকই আছে আমার। 'কেন?'

'জানি না। রোজ ভোর অন্ধকার থাকতে নিয়ে গেছি। আবার মস্কো ফিরিয়ে এনেছি গভীর রাতে।'

'কতদিন চলেছে এই আসা-যাওয়া?'

'আঠারো দিন, কমরেড জেনারেল।'

'আর কাকে কাকে দেখেছ সেখানে, বিগ শট!'

'চারজন ছিলেন। তবে একজনকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না। '৮৫ সালে আফগানিস্তানের কান্দাহারে ছিলাম আমি, কমরেড। সে সময় গ্রু মোটর পুলে চাকরি করতাম, ওদের একজন কর্নেলের গাড়ি চালাতাম।'

'জেনারেল মার্চেঙ্কো?'

'রাইট, কমরেড জেনারেল।' ভুরু কুঁচকে গেল গ্রেগরিয়েভের। বরিসভ জানলেন কি করে সে কথা বুঝে উঠতে পারছে না।

'বেশ। এবার বলো, তোমাকে মুখ খুলতে নিষেধ করে দিয়েছিল কে, মেজর কিরলভ?'

ভেতরে ভেতরে আস্ত একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেও তার মুখ দেখে

কিছুই বোঝা গেল না। ‘জ্বি।’

‘ওকে, গ্রেগ। চলো, ফিরে চলো। ঘাবড়িয়ো না, এসব কথা গোপনই থাকবে।’

চমৎকার সুট পরা দীর্ঘদেহী যুবককে মৃদু হাসি উপহার দিল যুবতী রিসেপশনিস্ট। ‘কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে, স্যার?’

‘আমি এখানে নতুন এসেছি। একটা বাড়ি ভাড়া নিতে চাই।’

‘এক মিনিট। আপনাকে মিস্টার স্মিথের সঙ্গে কথা বলতে হবে। হাউজিঙের ব্যাপারটা উনিই দেখেন,’ ফোনের রিসিভার তুলল মেয়েটি। ‘কি বলব তাঁকে, স্যার?’

মিষ্টি করে হাসল যুবক। ‘ফ্ল্যানারি। মার্টিন ফ্ল্যানারি।’ অফিসটা পুরানো ধাঁচের। ভাবল তাতায়েভ। ইন্টারকম নেই।

দু’মিনিট পর স্মিথের কক্ষে ডাক পড়ল তার। ‘আমি এ অঞ্চলে নতুন। ব্যবসার খোঁজে ডরসেট থেকে এসেছি। ফ্যামিলি আনতে পারিনি বাসার কারণে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ভাল বাসা চাই, মিস্টার স্মিথ।’

‘আপনি কি বাড়ি কেনার কথা মীন করছেন, স্যার?’

‘না, এখনই নয়। পরে ভালমত দেখেশুনে কিনব। এখন চাই ভাড়া বাড়ি। দুই-এক মাসের জন্যে। মানে হেড অফিস যতদিন থাকতে বলে আর কি! এর পরও যদি থাকতে হয়, তাহলে ঠিক করেছি কিনেই ফেলব একটা।’

‘বুঝেছি, শর্ট লীজ।’

‘ঠিক তাই,’ বলল ভ্যালেরি তাতায়েভ।

‘আনফার্নিশড্ নাকি ফার্নিশড্, স্যার?’

‘ফার্নিশড্, যদি সম্ভব হয়।’

‘নিশ্চই হবে, স্যার।’ কতগুলো বাছাই করা ফোল্ডার বের করল

লোকটা ড্রয়ার থেকে। 'এগুলো দেখুন। চারটে আছে। অল আর ফার্নিশড্।'

সব শেষেরটি পছন্দ হলো মেজর তাতায়েভের। একেবারে যেমনটি সে চাইছিল মনে মনে। দোতলা বাড়ি। ছোট, ছিমছাম বাংলো। 'এটাই চাই আমার।'

'অল রাইট। বাড়ির মালিক এঞ্জিনিয়ার, সৌদি আরবে চাকরি করেন। ছ' মাস পর দেশে ফিরে আসার কথা। প্রয়োজনে ওই পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন আপনি।'

'চমৎকার। বাসাটা দেখতে চাই একবার।'

'একশোবার, স্যার।'

এলাকাটা 'দ্য হে'জ' নামে পরিচিত। ভ্যালেরির পছন্দের বাড়ির নাম্বার টুয়েলভ, চেরিহে'জ ক্লোজ। অন্য বাড়িগুলোর কোনটা ব্যাকেনহে'জ, কোনটা গরসহে'জ, অ্যালমণ্ডহে'জ, হিদারহে'জ ইত্যাদি ইত্যাদি। বারো ফুট পাকা রাস্তা থেকে ছয় ফুট তফাতে চেরিহে'জ। কোনদিকেই সীমানা দেয়াল নেই। এক পাশে ছোট একটা গ্যারাজও আছে বাড়িটার। যেটা পরে বিশেষ কাজে লাগবে ভ্যালেরির। পিছনে ছোট্ট ফুলের বাগান। এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল নেট দিয়ে ঘেরা। কিচেন থেকে বাগানে যাওয়ার পথ আছে।

ওপরে তিন বেড তিন বাথ; নিচে বেশ বড় হলরুম-কাম-ডাইনিং, কিচেন ইত্যাদি। প্রতিটি আসবাব, যেখানে যেটা প্রয়োজন, মজুত আছে। ভেতরের সব দরজা কাঠের হলেও মূল দরজা পুরু কাঁচের, স্লাইডিঙ।

'খুব পছন্দ হয়েছে আমার বাড়িটা। এটাই চাই।'

অফিসে ফিরে ভাড়া গ্রহণের শর্তাদির ব্যাপারে জানাল তাকে স্মিথ। সঙ্গে দু'মাসের ভাড়া অগ্রীম। রেফারেন্স হিসেবে নিজ কোম্পানির জেনেভা হেড অফিসের ঠিকানা দিল তাতায়েভ এবং ডরসেটের বারক্লেজ ব্যাংকের ওপর একটা অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করল।

তাকে নিশ্চয়তা দিল স্মিথ, এ দুটোর ব্যাপারে যদি কোন আপত্তি না আসে, তো দু'দিন পর, সোমবার বাড়ি হস্তান্তর করা হবে। গভীর আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল মার্টিন ফ্ল্যানারি ওরফে ভ্যালেরি আলেক্সেইভিচ তাতায়েভ। ভাল করেই জানে কোন আপত্তি আসবে না। সোমবার সকালে কোলচেস্টারের এক কার রেন্টাল এজেন্সি থেকে চমৎকার লেটেস্ট মডেলের একটা ফ্যামিলি সেলুন ভাড়া নিল সে। ওদের জানাল তাতায়েভ যে ডরচেস্টার থেকে এসেছে সে অফিসের কাজে। এসেক্স এবং সাফোকে হাউস-হান্টিঙে আছে।

নিজের গাড়ি স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের ব্যবহারের জন্যে ডরসেটে রেখে এসেছে। ক'দিন এখানে থাকতে হবে ঠিক নেই, তাই এখনই গাড়ি কেনার ব্যাপারে চিন্তা করছে না। তবে কম করেও দিন পনেরো থাকবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তাতায়েভের ড্রাইভিং লাইসেন্সে কোন খুঁত নেই। ওতে তার ডরচেস্টারের ডরসেটের ঠিকানাও আছে। তার ওপর ওটা ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স। নগদে এক সপ্তাহের ভাড়া এবং ইনশিওরেন্সের টাকা পরিশোধ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভ্যালেরি।

এবার একজন ইনশিওরেন্সের দালাল খুঁজে বের করল সে। তার কাছে ব্যাখ্যা করল নিজের সমস্যা। অনেক বছর বিদেশে চাকরি করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছে মার্টিন ফ্ল্যানারি। বিদেশে যাওয়ার আগে নিজের গাড়িই চালাত। বিদেশে চাকরির মেয়াদ শেষ, এখানেই আবার স্থায়ী হতে চায় সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটা ভেহিকেল কিনবে। সেজন্যে ইনশিওরেন্স কভার প্রয়োজন, লোকটা কি পারবে সে ব্যবস্থা করে দিতে?

কি ধরনের ভেহিকেল কেনার ইচ্ছে মিস্টার ফ্ল্যানারির? মোটর সাইকেল? হ্যাঁ, ভাল সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তিনি। রাস্তাঘাটে গাড়ির যা ভিড়, ছোটখাট জিনিসই ভাল। ফাৎরা পোলাপান হলে হয়তো ঝামেলা হত, কিন্তু মিস্টার ফ্ল্যানারি একজন দায়িত্বশীল পূর্ণবয়স্ক, কাজেই, তাছাড়া

যখন ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, ও হয়ে যাবে। অসুবিধে হবে না করাতে।

ঠিকানা? ও, হাউস-হান্টিং? খুব স্বাভাবিক। ইপসউইচের গ্রেট হোয়াইট হল হোটেল? সে তো আরও ভাল হলো। নিশ্চিন্তমনে মোটর সাইকেল কিনে ফেলতে পারেন মিস্টার ফ্ল্যানারি। পরে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কেবল তাকে জানালেই চলবে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনতে চান? সে জন্যে অবশ্য থার্ড পার্টি ইনশিওরেন্স কভার প্রয়োজন হবে। ঠিক আছে, সব কাজ সেরে রাখবে সে। আর…হোটেল ছেড়ে যদি এরমধ্যে ভাড়া বাসায় উঠে যান তিনি তো সে ঠিকানাটাও দরকার হবে।

সন্ধে নাগাদ ইপসউইচ ফিরে এল তাতায়েভ। মোটামুটি একটা ব্যস্ত দিন গেল আজ। কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না করেই প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলা গেছে। কোন ট্রেইলও রেখে আসেনি সে। হোটেল এবং কার রেন্টাল এজেন্সিতে নিজের ডরসেটের যে ঠিকানা দিয়েছে তাতায়েভ, তার কোন অস্তিত্বই নেই। এস্টেট এজেন্ট আর ইনশিওরেন্স ব্রোকার জানে তার হোটেলের অস্থায়ী ঠিকানা। বারক্লেস ব্যাঙ্কও তার হোটেলের ঠিকানাই জানে। জানে মিস্টার মার্টিন ফ্ল্যানারি 'হাউস হান্টিং' অ্যাট দ্য মোমেন্ট।

ব্রোকার লোকটা তার কাজ করে দিলেই হোটেল ছেড়ে দেবে তাতায়েভ। একমাত্র এস্টেট এজেন্ট ছাড়া কেউ জানবে না কোথায় আছে সে। এ সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

পরদিন অ্যাসেক্স-এর স্টো মার্কেটে পেয়ে গেল তাতায়েভ মনে মনে যা খুঁজছিল। একটা বিএমডব্লিউ শ্যাফট ড্রাইভ কে-হাণ্ড্রেড মোটর সাইকেল। নতুন নয়, তবে কণ্ডিশন চমৎকার। বড়, শক্তিশালী এঞ্জিন। তিন বছর ব্যবহার করেছে আগের মালিক, চলেছে মাত্র বাইশ হাজার মাইল। দামের বিশ পার্সেন্ট নগদ দিয়ে কিনে ফেলল ওটা তাতায়েভ। তবে এখনই নিয়ে

যেতে পারছে না। বাকি দাম শোধ করে নিতে হবে।

ওই দোকান থেকেই প্রয়োজীয় আউটফিট কিনল সে। কালো লেদার ট্রাউজারস এবং জ্যাকেট। গন্টলেটস, জিপ-সাইডেড জ্যাকবুট। এবং গাঢ় রঙের স্লাইড-ডাউন ভাইজরওয়ালা একটা ক্র্যাশ হেলমেট। এরপর দোকানিকে অনুরোধ করল বাইকটার রিয়ার হুইলের সঙ্গে বড় একটা প্যানিয়ার সেট করে দিতে, তালাচাবি ওয়ালা একটা ফাইবার গ্লাস বক্সসহ। দু'দিনের মধ্যে গাড়িটা তাতায়েভের ফরমায়েশ অনুযায়ী ডেলিভারি দেয়ার নিশ্চয়তা দিল দোকানি।

এবার একটা ফোন বুদ থেকে ইনশিওরেন্স ব্রোকারকে ফোনে বাইকটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার জানিয়ে দিল ও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিস্টার ফ্ল্যানারির জন্যে ত্রিশ দিনের একটা টেম্পোরারি ইনশিওরেন্স পলিসির ব্যবস্থা করে দেবে বলে আশ্বাস দিল লোকটা। ইপসউইচের হোটেলের ঠিকানায় মেইল করে দেবে সে ওটা কালই।

স্টোমার্কেট থেকে বেরিয়ে উত্তরের থেটফোর্ডের দিকে চলল ভ্যালেরি তাতায়েভ। নরফোক কাউন্টি বর্ডারের সামান্য এপাশে খুদে থেটফোর্ড। মাঝ দুপুরের খানিক পর পেয়ে গেল সে প্রার্থিত জিনিসটি। ম্যাকডালেন স্ট্রীটের স্যালভেশন আর্মি হলের কাছাকাছি এক সারিতে পাশাপাশি একত্রিশটা লক্ আপ গ্যারাজ। দুটোর বন্ধ দরজায় ঝুলছে 'টু লেট' নোটিস।

ওগুলোর মালিককে খুঁজে বের করল তাতায়েভ। গ্যারাজের কাছেই বাসা। এক মাসের ভাড়া দিয়ে ওর একটা ভাড়া নিল সে। ভেতরটা ছোট, তবে তাতায়েভের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। টাকার রশিদ চাইল না তাতায়েভ। ট্যাক্স-ফ্রি ক্যাশ পেয়ে খুশি হলো মালিক। তাকে নিজের কল্পিত নাম-ঠিকানা দিল সে। দরজার চাবি দিয়ে বিদেয় হলো লোকটা।

ভেতরে রাইডারস অ্যাকসেসরিজ রেখে তালা মেরে বেরিয়ে এল তাতায়েভ। আর মাত্র একটা কাজ বাকি। স্থানীয় মার্কেট থেকে দুটো দশ

গ্যালনি প্লাস্টিক ড্রাম কিনল সে, দুই দোকান থেকে। এরপর দুটো পাম্প থেকে পেট্রল কিনে ভরল ওদুটো। অ্যাকসেসরিজের সঙ্গে ড্রাম দুটো গ্যারাজজাত করল তাতায়েভ। তারপর সেলুন হাঁকিয়ে ফিরে চলল ইপসউইচ। সুইটে যাওয়ার আগে ক্লার্ককে জানাল সে যে কাল সকালে চেক আউট করবে সে। বিলটা যেন তৈরি করে রাখা হয়।

রাতে গভীর ঘুম হলো তার। এক ঘুমে সকাল। তৈরি হয়ে নিচে নেমে এল তাতায়েভ। তার লাগেজ বেড়ে গেছে। আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছে পেল্লায় এক সুটকেস। ভেতরে শুধু কাপড়-চোপড়, স্থানীয় মার্কেট থেকে কেনা। রিসেপশনিস্ট ক্লার্ককে জানাল ভ্যালেরি, নরফোক চলেছে সে। তার নামে কোন চিঠিপত্র এলে যেন পেণ্ডিঙ কালেকশনে রেখে দেয়া হয়।

রিসেপশন থেকেই ব্রোকার লোকটাকে ফোন করল সে। জানা গেল, তার পলিসি ঘন্টাখানেক আগেই ইস্যু করিয়ে ছেড়েছে লোকটা। ধন্যবাদ জানাল তাকে তাতায়েভ, বলল, ওটা যেন সে ডাকে না পাঠায়। নিজেই তার কাছ থেকে সংগ্রহ করবে ওটা ফ্র্যানারি। হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই তাই করল তাতায়েভ। তারপর উঠে এল টুয়েলভ চেরিহে'জ-এ।

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসা ওয়ান-টাইম প্যাডে খুবই সংক্ষিপ্ত একটা কোডেড মেসেজ প্রস্তুত করল সে খুব সতর্কতার সঙ্গে। যত সফিস্টিকেটেড কোড ব্রেকিং কম্পিউটরই হোক না কেন, ওয়ান-টাইম প্যাডের কোড ব্রেক করার ক্ষমতা তার নেই। জানা আছে ভ্যালেরি তাতায়েভের। কোড ব্রেকিং কৌশল নির্ভর করে মূলত মেসেজের প্যাটার্ন আর রিপিটেশনের ওপর।

কিন্তু ওয়ান-টাইম প্যাড ব্যবহারে সে ভয় একেবারেই নেই। ওর একেক পাতায় লেখা হয় একটা করে শব্দ। কোন প্যাটার্ন থাকে না, রিপিটেশনের তো প্রশ্নই আসে না। পরদিন আবার থেটফোর্ড এল

তাতায়েভ। সেলুনটা গ্যারাজে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল স্টোমার্কেট। আসার সময় তার ক্যানভাস গ্রিপে করে সেদিনের কেনা লেদার জ্যাকেট-ট্রাউজার, বুট আর হেলমেটটা নিয়ে এসেছে।

বিএমডব্লিউর বাকি টাকা শোধ করল তাতায়েভ একটা সার্টিফাইড চেকের মাধ্যমে। তারপর গ্রিপটা প্যানিয়ারের ফাইবারগ্লাস বক্সে ভরে বেরিয়ে এল বাইক নিয়ে। হাইওয়ে ধরে দক্ষিণে এগোল তাতায়েভ। মাইল দশেক এগোবার পর পছন্দমত একটা জায়গা পেয়ে বিরতি দিল। জায়গাটা প্রায় নির্জন, দু'পাশে ঘন বন। সামনে পিছনে যতদূর চোখ যায় ভাল করে দেখে নিল সে। গাড়ি ঘোড়া নেই। চট্ করে মোটর সাইকেল নিয়ে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল সে।

দ্রুত হাতে পরনের সাধারণ ট্রাউজার-জ্যাকেট বদলে পরে নিল লেদারেরগুলো। জুতোও বদল করল সে। আগেরগুলো প্রথমে গ্রিপ, পরে প্যানিয়ারে আশ্রয় পেল। হেলমেট আগে থেকেই পরা ছিল। বেরিয়ে আসাটা আগেরবারের মত সহজ হলো না। রাস্তা ফাঁকা হওয়ার জন্যে প্রায় বিশ মিনিট ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হলো তাতায়েভকে। তারপর ভোঁ করে বেরিয়ে এল সে পথে। যথাসম্ভব দ্রুত ছুটল যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে। গন্তব্য অনেক দূরে।

রাত এগারোটায় থেটফোর্ড ফিরে এল ভ্যালেরি তাতায়েভ। গ্যারাজে মিনিট পাঁচেক অবস্থান করল সে। কাপড় পাল্টাল। মোটর সাইকেল ভেতরে রেখে বের করল কারটা। তারপর গ্যারাজে তালা মেরে ইপসউইচের চেরিহে'জ ক্লোজের উদ্দেশে রওনা হলো। প্রায় সারাদিন গাড়ি চালিয়েও এতটুকু ক্লান্ত হয়নি সে।

আপনমনে শিস বাজাতে বাজাতে ড্রাইভ করছে তাতায়েভ।

এগারো

কমসোমলস্কি প্রসপেক্টের এক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের টপ্ ফ্লোরে থাকেন ড. জোসেফ পাভলভ। এর জানালা দিয়ে মস্কো ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ দিক এবং মস্কভা নদীর অনেকটা দেখা যায়। সন্ধে ছ'টায় ডোরবেলের আওয়াজ উঠল। তিনি নিজেই এসে দরজা খুললেন। আগন্তুকের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকলেন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। চিনতে পারলেন না। লোকটির হাতে একটা পোর্ট ফোলিও।

'কমরেড প্রফেসর পাভলভ?'

'হ্যাঁ!'

'আমি জেনারেল বরিসভ। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ। জরুরি একটা বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।'

জেনারেলের বাড়িয়ে ধরা পরিচয়পত্রটা ভাল করে লক্ষ করলেন প্রফেসর। মাত্র এক নজরই যথেষ্ট। ওটা ফিরিয়ে দিয়ে জেনারেলকে ভেতরে ঢোকার আহবান জানালেন তিনি। এনে বসালেন দামী আসবাবে সাজানো সীটিংরুমে। মানুষটি কে, জেনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত নন প্রফেসর। যেখানে দেশের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাঁর বন্ধু, সেখানে এসব জেনারেল-ফেনারেলকে দেখে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই তাঁর। সে যে জন্যেই এসে থাকুক।

'ওয়েল, জেনারেল,' বরিসভের মুখোমুখি বসলেন তিনি। 'অধমের প্রতি এই অযাচিত সম্মান দেখানোর কারণ?'

কথাগুলো পছন্দ হলো না জেনারেলের। ইচ্ছে হলো ব্যাটার ফোলা গালে কষে একটা চড় লাগিয়ে দিতে। কিন্তু লোকটা পার্টির খুব উঁচু পদে আসীন, সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য, তাই ওটা সম্ভব নয়। তোমার দাঁত কেলানো বার করছি, দাঁড়াও। 'কমরেড প্রফেসর, এখানে এসেছি আমি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের স্বার্থে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ তো।'

'আপনি এবং আরও তিনজন, গত প্রায় তিন সপ্তা উসভোয় কী কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কমরেড?'

আক্ষরিক অর্থেই প্রচণ্ড এক চড় খেলেন যেন প্রফেসর। এবং মনে মনে যেটা আশা করছিলেন বরিসভ, দাঁত কেলানোও বন্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত লাগল তাঁর নিজেকে চরম বিস্ময়ের ঘূর্ণি থেকে উদ্ধার করতে। প্রকাণ্ড মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল রাগে।

'জেনারেল বরিসভ!' ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছাড়লেন পাভলভ। 'আপনি আপনার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন।

নিরীহ কণ্ঠে বললেন জেনারেল, 'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।' প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে তাঁকে।

'কিসের কথা বলছেন? আমি বুঝতে পারছি না!'

'আমার বিশ্বাস, পারছেন। এবং এ-ও বিশ্বাস করি আপনি আমাকে জানাবেন, ওখানে কেন প্রতিদিন যেতেন আপনারা। কেন মেজর তাতায়েভ, মেজর ক্রিপচেঙ্কোকে ডিটাচ করা হয়েছে তাদের ইউনিট

থেকে।'

হাত প্রসারিত করলেন প্রফেসর। 'আপনার অথরিটি, প্লীজ।'

'আমার র‍্যাঙ্ক আর সার্ভিসই এ-জন্যে যথেষ্ট।'

'কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির স্বাক্ষর করা কোন অথরাইজড্ লেটার যদি সঙ্গে না এনে থাকেন, তো ওই অথরিটি আমি মানি না,' শীতল কণ্ঠে বললেন জোসেফ পাভলভ। উঠে ফোনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'আপনার বিষয়টা কমরেড জেনারেল সেক্রেটারিকে রিপোর্ট না করে পারছি না, জেনারেল।'

'কাজটা বোকার মত হয়ে যাবে, প্রফেসর,' তাঁর চেয়েও শীতল গলায় বললেন জেনারেল বরিসভ।

ডায়ালের ওপর হাত থেমে গেল প্রফেসরের। হিসেব উল্টে গেছে তাঁর, মনে করেছিলেন ফোন করার হুমকি দেখালেই চুপসে যাবে লোকটা। হয়তো কাকুতি-মিনতি শুরু করে দেবে ও-কাজ না করতে, পালাবার পথ খুঁজবে। কিন্তু গ্যাঁট হয়ে বসে তো আছেই, আবার ভয় দেখাবারও চেষ্টা করছে।

প্রফেসরের মনে দ্বিধা ঢুকিয়ে দেয়া গেছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন বরিসভ। 'মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন, কমরেড প্রফেসর। আমার কথাগুলো আগে শুনুন। ফোন তো পালিয়ে যাচ্ছে না। পরেও করতে পারবেন।'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় দুললেন কিছুক্ষণ ড. পাভলভ। কি এমন কথা থাকতে পারে লোকটার তাঁর সঙ্গে? কি করে এত নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে সে? ইতস্তত পায়ে ফিরে এলেন প্রফেসর। বসলেন। 'ঠিক আছে, বলুন, কি বলতে চান। তবে শুনে রাখুন, যে বিষয় আপনি জানতে চাইছেন, তা নিয়ে আপনি কেন, কারও সঙ্গেই কথা বলব না আমি।'

'এত তাড়াতাড়িই প্রতিজ্ঞা করে বসবেন না। আমি জানি, আমার

পুরো বক্তব্য শুনলে আপনি সেধেই সব জানাতে চাইবেন। বাদ দিন। কমরেড প্রফেসর, আপনার তো একটিই ছেলে, তাই না? গ্রোমিকো?'

হঠাৎ করেই যেন আগ্রহী হয়ে উঠলেন জোসেফ পাভলভ। 'হ্যাঁ। কেন?'

'মাস দুয়েক আগে কানাডা ঘুরে এসেছে গ্রোমিকো আমাদের এক ট্রেড ডেলিগেশনের ইন্টারপ্রিটার হিসেবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তাতে কি?'

'ওখানে এক সুন্দরী কানাডিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয় আপনার ছেলের। কয়েকদিনের মধ্যেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওরা দু'জন। এ সময়...'

'এতবড় আস্পর্ধা আপনার!' প্রায় ফেটে পড়লেন প্রফেসর রাগে। 'আমার ছেলে কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে, তার ভয় দেখিয়ে অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের একজন সদস্যকে ব্লাকমেইল করতে এসেছেন আপনি! অল রাইট, কালই পার্টিকে জানাব আমি সব কথা। দেখে নেব আপনাকে! কেজিবির যত বড় অফিসারই হন, আমি ছাড়ব না আপনাকে।'

'ঠিক আছে। সে কালকের কথা কাল দেখা যাবে। আগে আমাকে বক্তব্য শেষ করতে দিন। আমার কাছে প্রমাণ আছে মেয়েটি সিআইয়ের এজেন্ট।'

'হোয়াট!' তুলে আছাড় মেরেছে যেন কেউ প্রফেসরকে। চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেছে পলকে। 'কি বললেন?'

'ভুল শোনেননি আপনি, কমরেড প্রফেসর।'

'তা-তারপর?'

'মেয়েটি শিকারী ঘুঘু। ফাঁদে ফেলেছে গ্রোমিকোকে।'

'তার মানে...।'

'ঠিক ধরেছেন। নিভৃত হোটেল কক্ষে তাকে অজান্তেই এমন সব তথ্য

দিয়ে ফেলেছে আপনার ছেলে, যা কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি।'

ডাঙায় তোলা বোয়ালের মত কয়েকবার খুলল আর বন্ধ হলো প্রফেসরের প্রশস্ত চোয়াল। 'আমি···।' গলা ভেঙে গেল বলতে গিয়ে। 'আমি···আমি বিশ্বাস করি না! কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে যে সত্যিই গ্রোমিকো এ-কাজ করেছে?'

'কি প্রমাণ চান আপনি, কমরেড প্রফেসর? রেকর্ড করা ওদের যাবতীয় আলাপ? ছবি?' পোর্ট ফোলিওটা হাঁটুর ওপর রেখে খুললেন জেনারেল বরিসভ। বের করলেন বড় বড় অনেকগুলো ছবি এবং একটা মিনি টেপ রেকর্ডার।

কিন্তু ওগুলো স্পর্শ করলেন না প্রফেসর। মনে হলো সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গেছেন। 'কেন, কেন লেগেছিলেন আপনি আমার ছেলের পিছনে?'

'পার্টি লাগিয়েছে, কমরেড প্রফেসর। ইচ্ছে করে লাগিনি আমি।'

'মানে?'

'ব্যাপারটা হলো, আমাদের যেসব ডেলিগেশন অন্য দেশে যায়, তার প্রতিটি সদস্যের জন্য বুক করা হোটেল রুমে আগে থেকেই ক্যামেরা-টেপ রেকর্ডার প্ল্যান্ট করে রাখি আমরা। আই মীন, আমার ডিরেক্টরেট। সে এমনকি নিজেদের ব্লকের দেশ হলেও । এ সিস্টেম পার্টির করা, কমরেড, আমি করিনি। দুঃখিত, সন্তান আমারও আছে। আমি জানি মনের মধ্যে কেমন লাগছে আপনার। কিন্তু বোঝেনই তো, আমি হুকুমের চাকর। হুকুম মানাই আমার কাজ।' ছবিগুলো গোছাতে শুরু করলেন বরিসভ।

'কি করতে যাচ্ছেন আপনি ওগুলো নিয়ে?'

কাঁধ শ্রাগ করলেন জেনারেল। 'আমার করণীয় একটাই কাজ আছে, কমরেড। পার্টিকে রিপোর্ট করা। কালই কাজটা সেরে ফেলব ভাবছি। দেরি করে ফেলার জন্যে কৈফিয়ত দিতে না হয় আবার।'

গলার স্বর চড়ে গেল প্রফেসরের। 'জেনারেল, আপনি আইন জানেন।

এসব সেন্ট্রাল কমিটি জেনে গেলে কি হবে গ্রোমিকোর তাও বোঝেন।'

'বুঝি। দশ বছরের ক্লোজ কনফাইনমেন্ট। উরাল, সাইবেরিয়া অথবা ব্ল্যাক সী'র কাছাকাছি কোথাও। কোন রেমিশন নেই। কিন্তু তাতে কি? আপনি অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের সম্মানিত সদস্য। আপনার ছেলের ব্যাপারটা ওরা নিশ্চই বিবেচনা করবে।'

'না না, প্লীজ। বিকল্প রাস্তা বলুন।'

শালা! কর্ এখন টেলিফোন, বানচোত্! সাইক্লোনের বেগে গাল পাড়তে লাগলেন বরিসভ। ডাক তোর বাবাকে। ডেকে বল ব্ল্যাকমেইলিঙের কথা।

'প্লীজ, কমরেড জেনারেল! আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি। কিন্তু দয়া করে ও কাজটি করবেন না। আমার ছেলে সিআইএকে তথ্য দিয়েছে, আর সে অপরাধে তার সাজা হয়েছে, জানাজানি হলে গলায় দড়ি দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না আমার, জেনারেল।' ভাব দেখে মনে হলো এখুনি কেঁদে উঠবেন প্রফেসর ভেউ ভেউ করে। বরিসভের পায়ে আছড়ে পড়াও বিচিত্র নয়।

'বেশ। ঠিক আছে।'

'প্রশ্ন করুন, কি জানতে চান প্ল্যান অরোরা সম্পর্কে?'

'অরোরা? তা সে যাই হোক। পুরোটা শুনতে চাই আমি। একদম শুরু থেকে শুরু করুন।'

আরম্ভ করলেন প্রফেসর জোসেফ পাভলভ। নিচু গলায় প্ল্যান অরোরার পুরো পরিকল্পনা খুলে বলতে লাগলেন তিনি। মাঝে মধ্যে বেশ কয়েকবার থামতে হলো তাঁকে বরিসভের নানান প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে।

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেলেন ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিস বরিসভ। প্ল্যানটির ভয়ঙ্করত্ব অনুধাবন করতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ন্যাটো

জোটভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনাহীন, প্রায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন এক সময় অরোরার মত প্ল্যান যারা করেছে, এবং যে তা অনুমোদন করেছে, তারা প্রত্যেকে একেকটা বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যারা বিনা যুদ্ধে, বিনা উস্কানিতে হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষ হত্যা করার পরিকল্পনা করতে পারে, তাদের আর কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায় ভেবে পেলেন না তিনি।

নো ফোর-মিনিট ওয়ার্নিঙ? ভাবছেন তিনি, নো রাডার ডিটেকশন অভ অ্যান ইনকামিং মিজাইল, নো চান্স ফর কাউন্টার স্ট্রাইক, নো আইডেন্টিফিকেশন অভ প্রিপারেটর? জাস্ট আ মেগাটন নিউক্লিয়ার বম্ব এক্সপ্লোশন ইন আ পুশ ট্রলি?

বারো

'সো, মেজর মাসুদ রানা,' বললেন জেনারেল ডিয়েটার গেরহার্ড। নিজ অফিস রূমে ভিজিটরস্ টেবিলে মুখোমুখি বসে আছেন তিনি আর রানা। 'আমাদের ডিপ্লোম্যাট ডি অ্যাঙ্গাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন নিশ্চই?'

'হ্যাঁ, জেনারেল।'

'কি প্রমাণ হলো, গিলটি?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'অ্যাজ হেল।'

স্থির হয়ে থাকলেন জেনারেল। ডান চোখের নিচের একটা রগ তিরতির করে লাফাচ্ছে। 'আমার সার্ভিসের নাম ভাঙিয়ে কার হয়ে কাজ করে সে, জানার অধিকার আছে আমার। না কি বলেন, মেজর?'

'অবশ্যই, স্যার। তবে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে আমার।'

'বেশ তো, বলুন।'

'এখনই অ্যাঙ্গাসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে যাবেন না আপনি দয়া করে। ওর দ্বারা ন্যাটোর যে ক্ষতি হয়েছে, তার খানিকটা হলেও পুষিয়ে নিতে চাই আমি। এজন্যে সময় দরকার।'

'কি করে পূরণ করবেন ক্ষতি, ডিজইনফর্মেশন?'

'জ্বি।'

'কত সময় লাগতে পারে?'

'একটু বেশিই লেগে যাবে হয়তো। কিন্তু আপনি জানেন তাড়াহুড়ো করে এ কাজ করা যায় না। তাতে কোন লাভ হবে না। ধরুন, মাস তিনেক।'

'এর মধ্যে বিএসএস ওকে পাকড়াও করবে না গ্যারান্টি দিতে পারেন?'

'পারব। এবং স্যার লংফেলোও দেবেন। কাল লণ্ডন পৌঁছেই সে ব্যবস্থা করব আমি।'

'বেশ। সে ক্ষেত্রে আপনার অনুরোধ রক্ষা না করার কোন কারণ দেখি না।'

'ধন্যবাদ জেনারেল।'

'এবার বলুন, কোথায় ভুল করেছে অ্যাঙ্গাস! কখন পক্ষ বদল করেছে?'

'এর কোনটিই করেনি সে, জেনারেল। কোন ভুল করেনি. পক্ষ বদলও করেনি। আপনি ওর অটোবায়োগ্রাফি পড়েছেন?'

'নিশ্চই। এবং লংফেলোর টেলিফোন পাওয়ার পর যতদূর সম্ভব ওর সত্যতা যাচাইও করেছি। কিন্তু কোথাও কোন গরমিল পাইনি।'

'পাননি, কারণ ওর সাথে সত্যের কোন অমিল আসলেই নেই। অ্যাঙ্গাসের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণে বর্ণে সত্যি, জেনারেল, দাঁড়ি কমাসহ।'

হতভম্ব দেখাল জেনারেল গেরহার্ডকে। 'তার মানে সব সত্যি?'

'সব সত্যি, অন্তত অ্যাঙ্গাস এবং তার সহযোদ্ধা সাইলেসিয়া প্লেইনে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়া পর্যন্ত। পরেরটুকু ডাহা মিথ্যে। সর্বৈব মিথ্যে।'

বিস্ময় আরও বেড়ে গেল এনআইএস চীফের। কিন্তু প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলেন।

'প্রথমে আপনাকে জানতে হবে, ডি অ্যাঙ্গাসের সঙ্গে অন্য আরেকজন যে ছিল, তার ইতিহাস। ফ্রিক্‌কি বা ফ্রেডরিখ ব্রান্ট নাম ছিল তার। হিটলার জার্মানির ক্ষমতায় আসার দু'বছর পর, ১৯৩৫ সালে এক জার্মান রেলওয়ে কর্মচারী, নাম জো বা জোসেফ ব্রান্ট, বার্লিনের সাউথ আফ্রিকান লিগেশনে গিয়ে তাকে ইমিগ্রেশন ভিসা দেয়ার অনুরোধ জানায়, কমপ্যাশনেট গ্রাউণ্ডে। কারণ সে ইহুদি বলে তার এবং তার পরিবারের জানমালের নিরাপত্তা নাকি প্রচণ্ড হুমকির মুখে পড়েছে।

'ব্যাপারটা বিশ্বাস করে লিগেশন, এবং ভিসা দিয়ে দেয় জোসেফ ব্রান্টকে। সে তথ্য প্রমাণ আমার হাতে আছে। কাল আমি ইস্ট লণ্ডন থেকে টেলিফোন করার পর আপনার নির্দেশে ইউনিয়ন বিল্ডিং এ ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য টেলেক্স করে পাঠিয়েছিল আমাকে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কের মত মাথা দোলালেন জেনারেল গেরহার্ড। 'সে সময় অনেক ইহুদিকে ইমিগ্রেশন ভিসা দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রচুর ইহুদি এদেশে আসে তখন। অবশ্য কেবল ওরাই নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এসেছিল।'

'ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেমারহেভেন থেকে জাহাজে চড়ে

জোসেফ ব্রান্ট, স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান ফ্রিক্‌কিকে নিয়ে। ছয় সপ্তাহ পর ইস্ট লণ্ডন বন্দরে ভেড়ে জাহাজ। ওখানে অনেক জার্মান ছিল। তাদের মধ্যে দুই একটা পরিবার ছিল ইহুদি। ইস্ট লণ্ডনেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জোসেফ এবং ওখানকার মাশার্লিং ইয়ার্ডে চাকরি জুটিয়ে নেয়। অভিজ্ঞতা ছিল বলে এতে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাকে।

'একটা নতুন ইহুদি পরিবার এসেছে, কথাটা ছড়িয়ে গেল। একদিন স্থানীয় র‍্যাবি, ইহুদি ধর্মযাজক, জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে এল। জুইশ কমিউনিটিতে যোগ দিতে অনুরোধ করল তাকে। কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হলো সে। কষ্ট পেল র‍্যাবি মনে, ফিরে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। কিছু সন্দেহও করল না।

' '৩৮ সালে বালক ফ্রিক্‌কির বয়স হলো তেরো। ইহুদিদের এই বয়সে ধর্মমতে দীক্ষা নেয়ার সময়, যাকে 'বার-মিজবাহ্‌' বলে। যাদের একটিই সন্তান, তাদের জন্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ সময় আবার ওদের বাড়ি এল র‍্যাবি। জানতে চাইল ছেলেকে জোসেফ অফিশিয়েট করতে চায় কিনা। জবাবে র‍্যাবির গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসে লোকটা। ঘাড় ধরে বের করে দেয় তাকে বাসা থেকে। তখনই র‍্যাবির মনে জাগল সন্দেহ।'

'কি সন্দেহ?' জেনারেলকে হতবুদ্ধি মনে হলো।

'ওরা আদৌ ইহুদি নয়,' বলল মাসুদ রানা।

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। সৌভাগ্যের ব্যাপার, পঁচানব্বই বছর বয়স নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন সেই র‍্যাবি। র‍্যাবি শ্যাপিরো। কাল তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আমার। 'বার-মিজবাহ্‌'-এর মাধ্যমে র‍্যাবি ইহুদি সন্তানকে ধর্মমতে দীক্ষা দেয় এবং আশীর্বাদ করে। তবে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হয় তাকে যে ছেলেটির বাবা-মা সত্যিই ইহুদি। এটা জানতে হয় তাকে ছেলের মার কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে নয়। এবং মাকে এ সময়

'কেতুবাহ্' নামে এক ডকুমেন্ট দেখাতে হয় র‍্যাবিকে, যা প্রমাণ করে সে ইহুদি। এই 'কেতুবাহ্' দেখতে চেয়েছিল বলেই চড় খেতে হয়েছিল শ্যাপিরোকে।'

'তার মানে মিথ্যে ইহুদি সেজে এদেশে ঢোকে ওরা?'

'নিঃসন্দেহে।'

'তারপর?'

'পরের ঘটনাগুলো আমার অনুমান, প্রমাণ করতে পারব না। তবে বিচার করে দেখলে অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যাবে। জোসেফ ব্রান্ট আপনাদের পশ্চিম জার্মান লিগেশনকে এক অর্থে সত্যি কথাই বলেছে। গেস্টাপোরা তার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা ইহুদি হওয়ার অপরাধে নয়, সে একজন মিলিটান্ট, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অ্যাকটিভিস্ট, সেই অপরাধে। সে কথা বললে ভিসা পেত না জোসেফ ব্রান্ট।'

'গো অন।'

'আঠারো বছর বয়সে ফ্রিক্কি ব্রান্ট কমিউনিস্ট পিতার আদর্শের দীক্ষায় পরিপূর্ণ দীক্ষিত হয়ে ওঠে। খুব সম্ভব এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কমিনটার্নের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে সে। ১৯৪৩ সালে দুই তরুণ আফ্রিকানার যুদ্ধে যায়। একজন, ডুয়েলস্ক্লুফের ডি অ্যাঙ্গাস, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বিট্রিশ কমনওয়েলথের পক্ষে। অন্যজন, ইস্ট লণ্ডনের ফ্রেডরিখ ব্রান্ট, তার ইডিওলজিক্যাল মাদারল্যাণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে।

'স্বাভাবিকভাবে যেটা হতে পারত, বেসিক ট্রেনিঙের সময় দু'জনের পরিচয় হওয়া, অ্যাঙ্গাস বা ব্রান্টের মধ্যে ব্যাপারটা সেভাবে ঘটেনি। ঘটেছে তারা দুজন যখন একই ট্রাকে চড়ে সাইলেসিয়ার জঙ্গল অতিক্রম করছিল, তখন। অ্যাঙ্গাসের অটোবায়োগ্রাফিতেও এর স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। ইফ ইউ রিকল, প্রথমেই সে দ্বিতীয়জনকে আরেক অপরিচিত আফ্রিকানার বলে উল্লেখ করেছে।

'ব্রান্ট অ্যাঙ্গাসকে পালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। করে এই জন্যে যে তার মাথায় একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ছিল।

'জঙ্গলে কয়েকদিন কাটায় ওরা। এই সুযোগে অ্যাঙ্গাসের সঙ্গে আন্তরিকতা জন্মায় ব্রান্টের। গল্পে গল্পে তার ছোটবেলাকার এটা-ওটা খুঁটিনাটি আত্মস্থ করে নেয় সে। এরপর রুশবাহিনীর হাতে স্বেচ্ছায় অ্যাঙ্গাসকে নিয়ে ধরা দেয় ব্রান্ট। যে করেই হোক, ওদেরকে নিজ পরিকল্পনার কথা বোঝাতে সক্ষম হয় সে, এবং খুশি হয়ে দুজনকেই এনকেভিডির হাতে সমর্পণ করে রুশ বাহিনী।

'এবার মূল কাজে হাত দেয় এনকেভিডি। নির্যাতন করে ডি অ্যাঙ্গাসের পুরো ঠিকুজি-কুষ্ঠি বের করে নেয় তার পেট থেকে। যা পুরো মুখস্থ করে ফেলে ব্রান্ট। এর পর তার চেহারা পরিবর্তন করে রুশরা প্লাস্টিক সার্জারি করে, প্রায় অবিকল ডি অ্যাঙ্গাসে পরিণত করে ব্রান্টকে। এমনিতেই দু'জনের আকার-গঠন, এমনকি চুলের রঙ পর্যন্ত একই রকম ছিল। কাজেই অসুবিধের কিছু ছিল না। তার ডগ ট্যাগ পরিয়ে দেয় এর গলায়। মোটামুটি যখন নিশ্চিত হলো রুশরা যে ব্রান্টকে এখন অনায়াসে অ্যাঙ্গাস বলে চালানো যাবে, তখনই হত্যা করা হয় আসল অ্যাঙ্গাসকে। এরমধ্যে শেষ হয়ে যায় যুদ্ধ।

'এরপর নকল অ্যাঙ্গাসের কাহিনী সবাইকে বিশ্বাস করানোর জন্যে নকল অ্যাঙ্গাসের ওপর খানিকটা আর্টিফিশিয়াল টর্চারের ব্যবস্থা করে ওরা। কিছু কেমিক্যাল প্রয়োগ করে সত্যি সত্যি অসুস্থ করে তোলা হয় ওকে এবং পটস্‌ড্যামে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়। বেলিফিল্ড আর গ্ল্যাসগো হাসপাতালে কয়েক মাস চিকিৎসাধীন থেকে '৪৫ এর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হয় নকল অ্যাঙ্গাস। তার জাহাজ কেপ টাউন পৌঁছায় '৪৬ এর জানুয়ারিতে।

'কিন্তু এখানে বড় একটা সমস্যা ছিল আসল অ্যাঙ্গাসের বাবা, ভ্যান অ্যাঙ্গাস। তাঁর সামনে পড়লেই জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়

ছিল। 'আকার-গঠন-চেহারা যতই এক হোক, যতই প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়ে থাকুক, আপন সন্তানকে বাপ চিনতে পারবেন না, এ অসম্ভব। তাই কমিনটার্নের পুরানো বন্ধুদের সাহায্য কামনা করে ব্রান্ট। আবার অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করে ওয়েনবার্গ মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি হয়।

'বন্ধুরা ভ্যান অ্যাঙ্গাসকে কেব্‌ল্‌ করে জানায় সে কথা। এবং দেরি না করে তাকে কেপ টাউন চলে আসার অনুরোধ জানায়। কার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করা হয় জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, হয়তো ডিফেন্স হেডকোয়ার্টারের, অথবা হতে পারে আর কোন কল্পিত নাম দিয়ে। ওটা কোন বড় ব্যাপার ছিল না দীর্ঘদিন একমাত্র পুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল পিতার কাছে, বড় ছিল বার্তাটা।

'বার্তা পেয়েই কেপ টাউনের পথে রওনা হয়ে যান ভ্যান অ্যাঙ্গাস। এবং পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের বাইরে, মূটসেকি ভ্যালি হাইওয়েতে তাঁকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। গাড়ির ফুটো হয়ে যাওয়া চাকা পথের ওপর বদল করছিলেন বৃদ্ধ, এই সময় দ্রুতগামী এক ট্রাক পিষে দিয়ে যায় তাঁকে। হিট-অ্যাণ্ড-রান অ্যাক্সিডেন্ট। পরেরটুকু সোজা। ছেলে 'অসুস্থ', তাই পিতার শেষকৃত্যে যোগ দেয়ার জন্যে যেতে পারেনি। ডুয়েলস্‌ক্‌লুফের কেউই সন্দেহ করেনি কিছু। এরপর ওখানকার ভ্যান অ্যাঙ্গাসের লইয়ারকে ডি অ্যাঙ্গাসের তরফ থেকে তার নামে পিতার উইল করে রেখে যাওয়া যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। সেইমত কাজ করেন ভদ্রলোক, বিক্রয়লব্ধ টাকা পাঠিয়ে দেন ওয়েনবার্গ হাসপাতালের ঠিকানায়।'

থামল মাসুদ রানা। নীরবতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল। উইণ্ডো পেনে একটা মাছির মৃদু 'পোঁ পোঁ' ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই সাউণ্ড প্রুফ অফিস রুমে। থেমে থেমে মাথা দোলাতে লাগলেন জেনারেল। আনমনে উদাস চোখে চেয়ে আছেন জানালা দিয়ে বাইরে। অনেক দূরে,

একসার পাহাড়ের মাথায় পড়ন্ত বিকেলের রোদের খেলা দেখছেন।

'ইট মেকস্ সেন্স, মেজর,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন ডিয়েটার গেরহার্ড। 'আমারও মনে হয় আপনার প্রতিটি অনুমানই মোটামুটি সঠিক। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এসব অনুমান। প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মাসুদ রানা। 'ঠিক বলেছেন, জেনারেল।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন তিনি। 'মেজর, এমন কিছু কি আছে, যাতে আপনার ধারণা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে সাহায্য করবে?'

কোটের ভেতরের পকেটে হাত চালিয়ে একটা ছবি বের করল ও, এগিয়ে দিল জেনারেলের দিকে। 'ছবিটা আসল ডি অ্যাঙ্গাসের সর্বশেষ তোলা ছবি, স্যার, '৪৩ সালের। তার পারিবারিক অ্যালবাম থেকে সংগ্রহ করা। ক্যাপশন পড়লে বোঝা যায় মোটামুটি ভালই ক্রিকেট খেলত। বোলার ছিল সে। বল ছোঁড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে নেয়া হয়েছে ছবিটা। লক্ষ করলে দেখবেন, অ্যাঙ্গাসের বল ধরার কায়দাটা একজন স্পিনারের এবং বাঁ হাতে বল করছে সে।'

'সো?'

'এদেশে আসার আগে পুরো চারদিন ডি অ্যাঙ্গাসের ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রেখেছি আমি, স্যার। গাড়ি চালানো, ধূমপান, খাওয়া সব কাজ ডান হাতে করে সে। চেষ্টা করলে একজন মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবকিছুই বদলে দিতে পারবেন আপনি আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে। কিন্তু একজন বাঁ-হাতিকে ডান হাতিতে পরিণত করতে পারবেন না কোনদিনই।'

নীরব হয়ে গেলেন এনআইএস চীফ। ছবিটার ওপর ঘন ঘন স্থান বদল করছে দৃষ্টি। ভাবনার মেঘ ক্রমেই ঘন হয়ে চেপে বসছে চেহারায়।

'কমিউনিস্ট?'

ডেডিকেটেড কমিউনিস্ট জেনারেল। যে সাড়ে চার দশকেরও বেশি

সময় ধরে আছে সাউথ আফ্রিকান ফরেন সার্ভিসে। অথচ কাজ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে।'

আবার পাহাড়গুলোর দিকে তাকালেন গেরহার্ড। ডুবে গেছে সূর্য। রেশ খানিকটা এখনও আছে। 'আই উইল টিয়ার দ্যাট বাস্টার্ড অ্যাপার্ট।'

'আমাকে এবার বিদেয় নিতে হয়, জেনারেল। ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে ফ্লাইটের। আপনার সহযোগিতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ,' আসন ছেড়ে হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল মাসুদ রানা।

ডিয়েটার গেরহার্ডও উঠলেন। 'সব ধন্যবাদ সব অভিনন্দন কেবল আপনার প্রাপ্য, মেজর। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার এই তৎপরতার কথা আজীবন স্মরণ থাকবে আমার। দেখুন চেষ্টা করে, তিন মাসের মধ্যে ন্যাটোর ক্ষতি কতটা পুষিয়ে নেয়া যায়। ঠিক নব্বই দিন পর ধরব আমি ওকে।'

'অল রাইট, জেনারেল, স্যার। গুড বাই।'

'গুড বাই, মেজর। রাহাতকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন।'

রাত ন'টা। জান স্মুটস্-এর ডিপারচার লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে রানা এবং ক্যাপ্টেন অ্যানড্রিয়াস পিয়েনার। সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজের লণ্ডন ফ্লাইট প্রস্তুত। যাত্রীদের বিমানে উঠে আসন গ্রহণের শেষ আহ্বান জানাচ্ছে মহিলা অ্যানাউন্সার। টারমাকে বেরিয়ে এল ওরা, পাশাপাশি এগোচ্ছে গ্যাঙওয়ের দিকে।

'আপনাকে একটা উপাধি দিতে চাই, মেজর।'

'কি?'

'জ্যাগহণ্ড,' ঠোঁট টিপে হাসল পিয়েনার।

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন,' মৃদু নড করল মাসুদ রানা। যেন মাথা পেতে গ্রহণ করল উপাধিটা। 'কথাটার অর্থ?'

'কেপ হান্টিং ডগ। ধীরস্থির কিন্তু অনমনীয়। নাছোড়বান্দা।'

পরিবেশ ভুলে হো হো করে হেসে উঠল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' বলল ক্যাপ্টেন।

'অবশ্যই।'

'সেদিন ভ্যান অ্যাঙ্গাসের কবরে ফুল দিয়েছিলেন কেন?'

মুখ ঘুরিয়ে অপেক্ষমাণ এয়ার লাইনারের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। আনমনা হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে। অজস্র কেবিন লাইটের উজ্জ্বল আভায় ঝলমল করছে দৈত্যাকার ডিসি টেন থার্টি। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ও। 'যখন বুঝলাম ওরা তার একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, পুত্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে একাকীত্বের যন্ত্রণায় কাতর এক বৃদ্ধ পিতাকে নিজেদের পাপ ঢাকা দিতে গিয়ে কাপুরুষের মত নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তখন হতভাগ্য বিদেহী মানুষটির প্রতি সহানুভূতি জানানোর আর কোন সহজ উপায় খুঁজে পাইনি, তাই দিয়েছিলাম ফুল।'

দশ মিনিট পর রানওয়ে ত্যাগ করল বিমান। নাক উঁচু করে খাড়া তর্জনির মত আরোহণ করল অসীম শূন্যে। তারপর উত্তরে বাঁক নিয়ে ভেসে চলল ইউরোপের দিকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে মাসুদ রানা। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল প্রিটোরিয়া।

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২৩-৭-৯৪ মৃত্যুর ছায়া (প্রজাপতি) রকিব হাসান

বিষয়ঃ গভীর হলো রাত। নিঝুম নীরবতা চারদিকে। ঠিক এই সময় অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে শুরু করল।

২৩-৭-৯৪ সন্ধ্যার মেঘমালা (রোমান্টিক) খন্দকার মজহারুল করিম

বিষয়ঃ অঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে নীতার প্রথম সাক্ষাৎ সুখকর নয়। লোকটি অসম্ভব কর্তৃত্বপরায়ণ ও রূঢ়। তারপরও নীতা একদিন উপলব্ধি করল, ওই লোক ছাড়া তার জীবন অর্থহীন।

আরও আসছে

২৫-৭-৯৪	কুয়াশা (৪৩, ৪৪, ৪৫) ভলিউম ১৫ টা. ২৫/-		কাজী আনোয়ার হোসেন
২৮-৭-৯৪	রহস্যপত্রিকা টা. ১৫/-		(১০ বর্ষ ১০ সংখ্যা, আগস্ট '৯৪)
৪-৮-৯৪	ঝামেলা	(তিন গোয়েন্দা)	রকিব হাসান
৪-৮-৯৪	অশুভ পিরামিড	(প্রজাপতি))	কাজী শাহনূর হোসেন

কাজী আনোয়ার হোসেন
অন্ধ শিকারী
দ্বিতীয় খণ্ড
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অন্ধ শিকারী ২

কাজী আনোয়ার হোসেন

অবাক কাণ্ড, কেজিবির এক মানবতাবাদী
জেনারেলই ফাঁস করে দিলেন মস্কোর ষড়যন্ত্র।
লণ্ডন ছুটলেন রাহাত খান, সোহেল আহমেদ।
সব জানানো হলো মাসুদ রানাকে।
কিন্তু একা কি করবে ও? কি করার আছে?

অন্ধের মত একই জায়গায়
ঘুরপাক খাচ্ছে মাসুদ রানা!
জানে, আশেপাশেই রয়েছে সে।
কিন্তু কোথায়?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২১৮

অন্ধ শিকারী ২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মুল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মুল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মুল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা-২১৮

অন্ধ শিকারী

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

ISBN 984-16-7218-9

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর,
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-218
ANDHO SHIKARI
Part-II
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়
মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস
ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন
বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ
যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা
যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ* অন্ধ শিকারী

এক

বিপজ্জনক! অন্যমনস্কের মত মাথা দোলালেন ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ, অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলায় মেতেছেন জেনারেল সেক্রেটারি। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে অকল্পনীয় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। পুরো পৃথিবী তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, তেমন মুহূর্ত যদি উপস্থিত হয়, নিজ বলয়ের বন্ধু দেশগুলোর সহানুভূতিও পাবে না সোভিয়েত ইউনিয়ন। মুখ ঘুরিয়ে নেবে সবাই, কারণ এ কাজে হাত দেয়ার আগে তাদের জানানোই হয়নি।

তাদের কথা না হয় বাদ, ভাবছেন বরিসভ, কেজিবিকে পর্যন্ত সামান্য আভাস দেয়া হলো না, এ কী আজব কথা! গ্রু আছে, কেজিবি নেই! কেউ কখনও শুনেছে এমন ছন্নছাড়া অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কথা?

যদিও বরিসভ জানেন, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার জেনারেল সেক্রেটারির রয়েছে। গোটা বিশ্বকে যে-কোন মুহূর্তে পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখেন তিনি, বরিসভ একশোবার স্বীকার করেন। কিন্তু সে জন্যে ক্ষেত্র তো চাই! কি, না, লেবার পার্টিকে জেতাবার জন্যে দেড় মেগাটন ক্ষমতাসম্পন্ন একটা নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাতে চলেছেন তিনি ব্রিটেনের কলজের মধ্যে! পাগলামিরও তো একটা সীমা আছে।

দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভাল করে দু'চোখ রগড়ালেন জেনারেল বরিসভ। কাল সারা রাত ঘুমাতে পারেননি। দুই চোখের ধারেকাছেও আসেনি ঘুম। বিছানায় ছটফট করে কেটেছে তাঁর। প্রথমে ক্রোধ, পরে বিস্ময় এবং সবশেষে অজানা এক ভয় চেপে বসেছে ভেতরে একটু একটু করে। ডক্টর পাভলভের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকেই সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে আছেন জেনারেল কি হয় কি হয় ভেবে।

ড্রয়ার থেকে একটা মাইক্রো ক্যাসেট রেকর্ডার বের করলেন তিনি। কাল জিনিসটা পোর্ট ফোলিওর ভেতরে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ড. পাভলভের বাসায়। প্ল্যান অরোরা সম্পর্কে কায়দা করে ডক্টরের পুরো বক্তব্য রেকর্ড করে এনেছেন। কাল বাসায় ফিরে এবং আজ অফিসে এসে অসংখ্যবার বাজিয়ে শুনেছেন তাঁদের দু'জনের কথোপকথন। তবু যেন আশ মেটে না। বারবার শুনতে মন চায়।

ফিতে পুরোটা পিছিয়ে আনলেন জেনারেল, তারপর ভল্যুম ফুল করে 'প্লে' বোতাম টিপে দিলেন।

'...শুরু হয়েছে মাস দুয়েক আগে,' ড. পাভলভের গলা শোনা গেল। 'আমরা কেউ এ ব্যাপারে জানতাম না কিছুই। জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো এর হোতা। গত গ্রীষ্মে নিজের সামার রিট্রিটে ছুটি কাটানোর সময়, ব্রিটেনের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভদের পরাজিত করে লেবার পার্টিকে কী উপায়ে ক্ষমতায় আনা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত এক রিপোর্ট তৈরি করেন তিনি। এবং ছুটি শেষে মস্কো ফিরে সেটা সাবমিট করেন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির সামনে। ওতে জেনারেল দাবি করেন, ব্রিটিশ লেবার পার্টির ভেতরকার হার্ড লেফট উইঙ, অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ক্যাডারের সহযোগিতায় কাজটা প্রায় অনায়াসেই করা সম্ভব।'

'কি ভাবে?' জেনারেল বরিসভের প্রশ্ন।

'বলতে দিন।'

'শিওর।'

'জেনারেলের মত, যদিও আমরাও তাই মনে করি, নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়ী হবে এবং পার্টি প্রধান নীল কিনকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করবে। এর ঠিক পরপরই শুরু হবে জেনারেল মার্চেঙ্কোর প্রার্থিত "আসল খেলা"। জেনারেল, আপনার মনে আছে, ১৯৮১ সালের ৭ মে বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল নির্বাচনের মাত্র ষোলো ঘণ্টা পর কি ঘটেছিল?'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। 'না, কমরেড। মনে করিয়ে দিলে বাধিত হব।'

'ওয়েল। স্যার হোরেস কাটলারের নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টি ছিল তখন গ্রেটার লণ্ডন কাউন্সিল বা জিএলসি'র নেতৃত্বে। সেদিনের নির্বাচনে অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা অ্যাণ্ড্রু ম্যাকিনটোশের লেবার পার্টি জয়ী হয়। এই বিজয়ের ষোলো ঘণ্টা পর, মাইণ্ড ইট, মাস নয়, সপ্তা নয়, এমন কি একটি দিনও পুরো হওয়ার সুযোগ হয়নি, মাত্র ষোলো ঘণ্টা পর পার্টি গভর্নিং কমিটির এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সিদ্ধান্তে দলীয় প্রধানের পদটি হারাতে হয় ম্যাকিনটোশকে। সে পদে বসানো হয় কেন লিভিংস্টোন নামে এক কট্টর বামপন্থী অ্যাকটিভিস্টকে। এর আগে পাঁচ শতাংশ সাধারণ লণ্ডনবাসীও যার নাম পর্যন্ত শোনেনি জীবনে কোনদিন। অবশ্য খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে কেন লিভিংস্টোনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন ম্যাকিনটোশ। ওটা ছিল ব্রিটিশ মার্কস-লেনিনপন্থীদের শতাব্দীর সেরা বিজয়।

'রাজনীতিক হিসেবে কেন লিভিংস্টোন ছিলেন সাংঘাতিক চৌকস। জনগণ না চিনলেও দলের প্রত্যেকে খুব ভাল করেই চিনত তাঁকে। খুব অল্প বয়সে মার্কস এবং লেনিনবাদে উদ্বুদ্ধ হন তিনি। পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ

পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বড় নেতাদের নজর পড়ে তাঁর ওপর। কারণ লিভিংস্টোন সেই ধরনের রাজনীতিক, যাঁর চব্বিশ ঘণ্টার ধ্যান-জ্ঞানই ছিল রাজনীতি। লেবার পার্টির কোন সভায় লিভিংস্টোন উপস্থিত নেই বা ছিলেন না, এমন অভিযোগ তাঁর চরম শত্রুও করতে পারবে না। তা সে যতই গুরুত্বহীন বৈঠক হোক না কেন।

'সে যা-ই হোক। জিএলসি প্রধান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর লিভিংস্টোন কাউন্টি হলকে মার্কস-লেনিনপন্থীদের স্প্রিংবোর্ড হিসেবে গড়ে তোলেন। যা-তা কথা নয়, কমরেড জেনারেল। গ্রেটার লণ্ডনের জনসংখ্যা এখন এগারো মিলিয়ন। সারা দেশের জনসংখ্যার প্রায় বিশ শতাংশ। যা লিখটেনস্টেইন বা লুক্সেমবুর্গের মত মিনি স্টেটের জনসংখ্যার চাইতেও বেশি। আর লণ্ডন শহরের বাজেট? জাতিসংঘের আশিটি সদস্য দেশের মিলিত বাৎসরিক বাজেটের চাইতেও বেশি।'

'আমরা বোধহয় আসল বক্তব্য থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি, কমরেড,' জেনারেল বরিসভের কণ্ঠে ধৈর্যের অভাব ঘটার আবছা ইঙ্গিত।

'হ্যাঁ। খানিকটা। আসন্ন নির্বাচনে লেবার পার্টি কী করে বিজয়ী হবে, সে কথায় একটু পরে আসছি। আগে শুনুন পরে কি ঘটবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর অ্যাণ্ড্রু ম্যাকিনটোশের মতই পার্টি প্রধানের পদটি হারাবেন বর্তমান নেতা নিল কিনক। সেই একই উপায়ে পদচ্যুত করা হবে কিনককে। তাঁর জায়গায় বসানো হবে এক কট্টর মস্কোপন্থী, আই মীন, হার্ড লেফটিস্টকে।'

'কি নাম তার?'

'দুঃখিত। জানা নেই আমার।'

'শুনে মনে হয় জেনারেল মার্চেঙ্কোই সব করেছেন। তাহলে আপনারা তিনজন কেন এর মধ্যে?'

'কমরেড জেনারেলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যাতে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমাদের কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। তাঁর নির্দেশ ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারার, সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হয়েছে।'

'এক পাখি নিশ্চয়ই কনজারভেটিভ পার্টি?'

'হ্যাঁ।'

'অন্যটা?'

'ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে সব ধরনের মার্কিন সামরিক স্থাপনা তুলে নিতে ওয়াশিংটনকে বাধ্য করা। অবশ্যই ব্রিটিশ জনমতের চাপে।'

'কি রকম?'

'নির্বাচনের প্রচারণার শুরু থেকেই এসব স্থাপনার ক্ষতিকারক দিক এবং সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ভয় ভীতি ঢোকানোর চেষ্টা চালিয়ে আসছে লেবার পার্টির হার্ড লেফ্‌ট উইঙ। ন্যাটো নিয়ন্ত্রিত ও দেশে মার্কিন এবং ইঙ্গ-মার্কিন যতগুলো সামরিক ঘাঁটি আছে, সবগুলোতেই পারমাণবিক বোমা, মিজাইল মজুত আছে। ওগুলো নিয়েই ভয়-ভীতি ছড়ানো হচ্ছে তাদের মধ্যে। যে কোন সময় ওর যে কোন একটায় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, যা হবে চেরনোবিল দুর্ঘটনার চাইতেও ভয়ঙ্কর, তাতে হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হতে পারে, এই সমস্ত বলে আর কি! সেই সঙ্গে তাদের বোঝানো হচ্ছে, লেবার পার্টি ক্ষমতায় গেলে আমেরিকানদের সঙ্গে সব সামরিক সহযোগিতা চুক্তি বাতিল করে দেয়া হবে, ন্যাটোর সব ঘাঁটি তুলে দেয়া হবে ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে।

'ওঁদের ভীতির আগুনে ঘি ঢালার আয়োজন করা হয়েছে। নির্বাচনের সপ্তাখানেক আগে সত্যি সত্যি ছোটখাট একটা পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটবে এক মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে।'

‘এ পরামর্শটা কার?’ এই জায়গায় সিধে হয়ে গিয়েছিলেন জেনারেল বরিসভ। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিলেন ড. পাভলভের দিকে।

‘কমরেড জেনারেল মার্চেঙ্কোর।’

‘কি করে ঘটবে আপনাদের সো কল্ড্ দুর্ঘটনা?’

‘একজন টপ্ ক্লাস সোভিয়েত এজেন্ট ইনফিলট্রেট করবে ইংল্যাণ্ডে। তার হাতে বিভিন্ন দিক থেকে নয়টা নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়া হবে। ওগুলো জুড়ে বোমা তৈরি করা হবে, তারপর বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। কাজটা এমনভাবে করা হবে, যাতে সবাই পরিষ্কার বোঝে যে ওটা দুর্ঘটনাই, এবং মার্কিনীদের অসাবধানতার জন্যেই ঘটেছে। সাফোকের বেন্টওয়াটার্সে মার্কিনীদের এফ-ফাইভ স্ট্রাইক বিমান ঘাঁটিটি বেছে নেয়া হয়েছে এ জন্যে। বেশ কিছু ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার ডিভাইস মোতায়েন আছে ওখানে। সম্ভাব্য সোভিয়েত সামরিক হুমকি মোকাবেলার জন্যে।’

‘কত কিলোটন ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা ফাটানো হবে?’

‘বেশি না, দেড় কিলোটন। বড় বোমা হলে ক্ষয়ক্ষতি হবে প্রচুর, তাতে নির্বাচনই পিছিয়ে যাবে। এই দুর্ঘটনার পর লেবার এমপিদের আর ভোট চাইতে হবে না, কম করেও আশি পার্সেন্ট ভোট পাবে তারা। আরও আছে। জানা কথা, এ ব্যাপারে মার্কিন প্রতিক্রিয়া হবে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত। সরাসরি অস্বীকার করবে তারা যে এ দুর্ঘটনার জন্যে তারা দায়ী নয়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এর পরদিন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি রেডিও-টিভিতে ভাষণ দেবেন। তাতে বিশ্বাবাসীকে জানানো হবে আমেরিকানরা উন্মাদ হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে দেশ এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সোভিয়েত ফোর্সেসের জন্যে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করা ছাড়া তাঁর কোন বিকল্প নেই।

'ওই দিনই লণ্ডনের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত স্বয়ং মিস্টার নিল কিনককে মস্কো সফরে যাওয়ার আহ্বান জানাবেন। অনুরোধ করবেন তিনি যেন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ জটিলতা নিয়ে আলোচনা করেন, মানবতার স্বার্থে শান্তি প্রার্থনা করেন। ভোট নিজের পক্ষে টানতে হলে কিনকেরও কোন বিকল্প থাকবে না এ ছাড়া। আর আমাদের বিশ্বাস, ওয়ার্ল্ড প্রেসের হাজারো রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার আর টিভি ক্যামেরার সামনে তাকে মস্কো যেতে বাধা দেয়ার কথা ভুলেও চিন্তা করবে না কন্জারভেটিভরা।

'কয়েক মিনিটের মধ্যে কিনকের ভিসা তৈরি হয়ে যাবে। পরদিন সকালে অ্যারোফ্লোটের বিশেষ বিমানে মস্কো যাবেন কিনক। কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি তাঁকে রিসিভ করবেন, দু'জনে বৈঠক করবেন। তারপর ফিরে আসবেন কিনক। তাঁর বিমান হিথ্রো ল্যাণ্ড করার আগেই আবার রেডিও-টিভিতে ভাষণ দেবেন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। জানাবেন, ব্রিটিশ লেবার পার্টি প্রধানের আবেদনে সাড়া দিয়ে আর্মর্ড ফোর্সেসকে গ্রীন স্ট্যাটাসে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

'এরপর, ভোটের আগের দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন নিল কিনক। ঘোষণা করবেন, তাঁর পার্টি নির্বাচিত হলে শান্তির উদ্দেশ্য ছাড়া কোনরকম সামরিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। ওদিকে, সবার ধারণা, এই ক'দিনে ব্রিটেন আর আমেরিকার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী মৈত্রী খান খান হয়ে যাবে। বাধ্য হয়েই সমস্ত সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার করতে হবে ওয়াশিংটনকে। অন্য সব পশ্চিম ইউরোপীয় দেশেও একই দুর্গতি ঘটবে তার, মৈত্রীর বন্ধন ছিঁড়ে পালিয়ে আসার পথ পাবে না ওরা।'

'তারপর?' জেনারেল বরিসভের থমথমে কণ্ঠের প্রশ্ন।

'তারপর নির্বাচনে বিজয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পার্টির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কিনককে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। বসানো হবে এক হার্ড লেফটিস্টকে। গ্রেট ব্রিটেনের প্রথম মার্কস-লেনিনবাদী প্রধানমন্ত্রী হবে সে।'

'উদ্দেশ্য?'

'ক্রমান্বয়ে সামরিক দিক থেকে ব্রিটেনকে নির্জীব করা। তারপর একে একে আর সব পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোকেও। এসব পরিকল্পনা অনেক আগেই সেরে ফেলেছেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে, গোটা পাঁচেক পদক্ষেপ নেবে লেবার পার্টি। যার মধ্যে আছে, যত বাধ্যবাধকতাই থাকুক, সব চুক্তি বাতিল করে ইইসি থেকে ব্রিটেনের প্রত্যাহার। অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর আকার এক পঞ্চমাংশে নামিয়ে আনা, সকল পারমাণবিক বোমা ধ্বংস ও হারওয়েল আর অ্যালডারমাস্টনের অ্যাডভান্সড ওয়েপনস্ রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্টের বিলুপ্তি। ব্রিটেন থেকে সকল মার্কিন কনভেনশনাল এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্র ও পারসোনেল অপসারণ। এবং সবশেষে ন্যাটো জোট থেকেও ব্রিটেনের নিজেকে প্রত্যাহার।

'এসব পদক্ষেপ যদি নিতে সক্ষম হয় লেবার, চিরদিনের জন্যে মুখ থুবড়ে পড়বে ব্রিটেন, গুঁড়িয়ে যাবে মেরুদণ্ড। এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না কোনদিনও।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'কতটা ক্ষতি হবে এই বিস্ফোরণে?'

'বেন্টওয়াটার্স এয়ার বেস, রেনডলেসহ্যাম ফরেস্ট, তিনটে হ্যামলেট এবং পুরো একটা গ্রাম, সব বাষ্প হয়ে উবে যাবে।'

'কত লোকের মৃত্যু হবে?'

'তা…কয়েক হাজার তো বটেই।'

'কিন্তু যদি আমেরিকানরা ভেতরের ব্যাপার টের পেয়ে যায়? বা এ নিয়ে যদি কোন সন্দেহ দেখা দেয় ব্রিটেনের? যদি ধরা পড়ে যায় আমাদের এজেন্ট?'

'পড়বে না। এসব খুঁটিনাটি প্ল্যান করেছেন…'

'ভিক্টরোভিচ।'

'হ্যাঁ। লোকটিকে বলা হয়েছে, বোমার বাটন টেপার দু'ঘণ্টা পর বিস্ফোরণ ঘটবে। এই সময়ের ভেতর সে সরে যেতে পারবে নিরাপদ দূরত্বে। আসলে তা নয়। ওটার সীলড্ টাইমার ইউনিট তৈরি করা হয়েছে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের জন্যে। ধরা পড়ার প্রশ্নই আসে না তার।'

'বেচারা, মেজর ভ্যালেরি!' বরিসভের চাপা কণ্ঠ।

'কিছু বললেন, কমরেড জেনারেল?'

'অ্যাঁ? না। কিন্তু এটা যে দুর্ঘটনাই, তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করার কি ব্যবস্থা?'

'আছে। সে ব্যবস্থাও আছে। দুর্ঘটনার দিন সন্ধের পর এক ইসরায়েলি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ডক্টর নাহুম ওয়েজম্যান প্রাগে এক আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলন ডাকবেন। এ মুহূর্তে লণ্ডনে আছেন ভদ্রলোক, মার্কিন এক সামরিক স্থাপনায় কর্মরত। ভদ্রলোক কভার্ড রুশ এজেন্ট। সম্মেলনে ডক্টর জানাবেন, গত কয়েক বছর যাবত আমেরিকানদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে কাজ করছেন তিনি। ওই ঘাঁটিতে কিছু নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছিল আমেরিকানরা। কিন্তু ডক্টর নাহুম বার বার তাদের সতর্ক করে আসছিলেন যে ওয়ারহেডগুলো বিপজ্জনক।

'ব্যাপারটা হলো, বোমাগুলো আকারে বেশ বড়। ওগুলো নিয়ে উড়তে প্রচুর তেল লোড করতে হত বিমানে। এতে বিমানের গতিও পুরোপুরি

তোলা যেত না। তাই মার্কিনীরা ওগুলোর আকার ছোট করে আলট্রা স্মল ওয়ারহেডে পরিণত করার জন্যে কাজ করে চলেছে। ডক্টর ওয়েজার দাবি করবেন, ওগুলোকে ভেঙে ছোট করতে গিয়ে ওরাই এ বিপদ ডেকে এনেছে। কেউ অবিশ্বাস করবে না তাঁকে, কারণ ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্যি। এবং ডক্টর নাহুম বাস্তবিক পক্ষেই মার্কিনীদের এ গবেষণা বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। আরও কয়েকজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট এর সাক্ষী।'

ডক্টর নাহুমকে খুব ভাল করে চেনেন ভাদিম বরিসভ। বিপত্নীক ওয়েজম্যানের একমাত্র পুত্র ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ছিল এক সময়। '৮২ সালে বৈরুতে কর্মরত ছিল সে। যে রাতে ভারী অস্ত্রসজ্জিত ফালাঞ্জিস্ট বাহিনী ফিলিস্তিনী রিফিউজি ক্যাম্প শাবরা ও শাতিলায় গণহত্যা চালায় সে রাতেই তার মৃত্যু হয়।

ঘাতকদের নিরস্ত্র করার জন্যে জীপ নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল লেফটেন্যান্ট। তারাই হত্যা করে তাকে। কেজিবির ভাগ্য ভাল, লেফটেন্যান্টকে গুলি করা হয়েছিল উজি দিয়ে। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার দেহ থেকে উজির সাত সাতটি বুলেট বের করে ডাক্তাররা। সুযোগ চিনতে ভুল করেনি কেজিবি। শোকার্ত ডক্টর ওয়েজম্যানকে তারা বোঝাতে সক্ষম হয় যে ফালাঞ্জিস্ট নয়, ইসরায়েলি সৈন্যের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ছেলের। লিকুদ পার্টির নামও শুনতে পারতেন না ভদ্রলোক। চিরকাল বিরোধীদলের সমর্থক ছিলেন।

এই ঘটনার পর ঘৃণায়, ক্রোধে উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠলেন তিনি। যে সরকার তাঁর একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তার ক্ষতি করা যায় কি ভাবে, সারাক্ষণ সেই ফিকিরে থাকলেন। যখন মনে হলো সময় হয়েছে, আলগোছে এগোল কেজিবি। রাশিয়ার হয়ে আজীবন কাজ করে যাওয়ার

শপথ করলেন নাহুম ওয়েজম্যান।

সচকিত হলেন ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভ বরিসভ। হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলেন রেকর্ডার। কিন্তু আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। কাল রাত থেকেই তাড়িয়ে ফিরছে তাঁকে এ আতঙ্ক, জান্তব এক দুঃস্বপ্ন। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন জেনারেল, কিন্তু কোন পথ বের করতে পারেননি।

আসন ছাড়লেন বরিসভ। পায়চারি শুরু করলেন। মিনিট দশেক পর হঠাৎ করেই মাথায় এল আইডিয়াটা। দাঁড়িয়ে পড়লেন জেনারেল। দেখতে দেখতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। পাওয়া গেছে! মুক্তির পথ পাওয়া গেছে। তিনি একজন সরকারি চাকুরে। অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে তাঁর, যা থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

যে কারণে এ ব্যাপারে নিজে সরাসরি কিছুই করতে পারবেন না। এছাড়া পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির পিছনে লাগার পরিণতি…ভাবতেই শিউরে উঠলেন জেনারেল বরিসভ। সর্বনাশ হয়ে যাবে। জ্ঞাতি-গুষ্ঠি নিয়ে ধনে-প্রাণে মরতে হবে যদি জানাজানি হয়ে যায়। তাই বলে পিছিয়ে গেলেও চলবে না। বাধা দিতেই হবে। এর ওপরই নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইংল্যাণ্ডই নয়, এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সমগ্র মানবজাতিকে।

তা হতে দিতে পারেন না জেনারেল বরিসভ। হতে দেয়া যায় না। নিজে এর পিছনে লাগতে পারবেন না, ঠিক আছে। কিন্তু আর কাউকে সব জানিয়ে লাগিয়ে দিতে বাধা কোথায়? তাই করতে যাচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ। বুকের ওপর চেপে বসা একটা ভার যেন নেমে গেল তাঁর হঠাৎ করেই। আতঙ্কিত দিশেহারা ভাবটাও কেটে যেতে থাকল একটু একটু করে।

*

চিকস্যাণ্ডস, বেডফোর্ডশায়ার। রাত এগারোটা। ইউএস মাস্টার সার্জেন্ট গ্যারি লুইস বসে আছে ব্রিটিশ-আমেরিকান লিসনিঙ স্টেশনের মাস্টার কম্পিউটরের সামনে। সুন্দরী ব্রিটিশ বান্ধবীর কথা ভাবছে সে মনে মনে। বেডফোর্ডে থাকে লুইসের বান্ধবী। সপ্তাহে একদিন মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় লুইস মেয়েটির সঙ্গে। রোববার।

কাল সেই দিন। এ দিনটির আগমনের প্রতীক্ষায় সপ্তাহের বাকি ছয় দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সার্জেন্ট। কাজেই মনটা আজ তার বেশ প্রফুল্ল। গুন গুন করে গান গাইছে। আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছে হাঁটুতে। চোখ মাস্টার কম্পিউটরের পর্দায়।

এটি ব্রিটিশ ইলেক্ট্রোনিক মনিটরিঙ অ্যাণ্ড কোড ব্রেকিঙ কমপ্লেক্সের একটি শাখা। গ্লস্টারশায়ারের চেলটেনহ্যামে এর হেড অফিস। সংক্ষেপে গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশনস্ হেডকোয়ার্টার্স বা জিসিএইচকিউ বলা হয় একে। সারা দেশে এর অনেক শাখা রয়েছে। যার কয়েকটা যৌথভাবে পরিচালনা করে জিসিএইচকিউ এবং আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা এনএসএ। চিকস্যাণ্ডসের এ স্টেশনটিও তেমনি একটি।

অতীতের মত ইয়ারফোন কানে লাগিয়ে আত্মগোপন করে থাকা কোন শত্রু দেশের স্পাইয়ের মোর্স-কীর মাধ্যমে পাঠানো বার্তা ইথার থেকে উদ্ধার এবং তা রেকর্ড করার প্রাণান্তকর খাটুনির দিন গত হয়েছে অনেক আগেই। আজকাল সে কাজ করে কম্পিউটর। বার্তা কেবল রিসিভ আর রেকর্ডই করে না ইলেক্ট্রোনিক পরিবারের এই বিস্ময়কর জাদুর বাক্সটি, করে আরও অনেক অ-নে-ক কিছু।

অতএব চিন্তার কিছু নেই, জানে মাস্টার সার্জেন্ট গ্যারি লুইস। সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকারও প্রয়োজন নেই। বাতাসে যদি কোন

ইলেক্ট্রোনিক ফিসফিসানি ওঠে, ইথারে অস্বাভাবিক কম্পন ধরায়, তার মাথার ওপর, ভবনের ছাতে এরিয়েলের জঙ্গলে তা ধরা পড়বেই। পরমুহূর্তে তা লুইসের সামনের জাদুর বাক্সের মেমোরি ব্যাঙ্কে প্রবেশ করবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

এরপর পলকে ঘটে যাবে আরও অনেক কিছু। প্রথমেই মাস্টার কম্পিউটরের 'হিট' বাটনটি ঝপ্ করে বসে পড়বে নিজের এনট্রেইলে। মেসেজটা রেকর্ড হয়ে যাবে। এবার অটোমেটিক ব্যাণ্ড স্ক্যানার লেগে পড়বে নিজের কাজে। ফিসফিসানিটা কোত্থেকে এল, তার বিয়ারিঙ আত্মস্থ করে নেবে সে৭ তারপর সারা দেশের সবগুলো লিসনিঙ স্টেশনের ব্রাদার কম্পিউটরকে নির্দেশ পাঠাবে তার ক্রসবিয়ারিঙ গ্রহণের। এবং সবশেষে মৃদু 'পিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ' গান গেয়ে সতর্ক করবে ডিউটি অফিসারকে।

এগারোটা তেতাল্লিশ। আরও সতেরো মিনিট ডিউটি করতে হবে গ্যারি লুইসকে। তারপর মুক্তি। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে, কিন্তু কাজটা পুরো করতে পারল না। অদ্ভুত এক নাচের ছন্দে ত্যাড়াবাঁকা দেহটা শক্ত হয়ে গেল তার। নিমেষে কপালে উঠে গেছে চোখ, হাঁ বন্ধ করার কথা ভুলে গেছে। চোখের সামনে 'হিট' বাটনটা এনট্রেইলে বসে পড়েছে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না মাস্টার সার্জেন্ট।

বায়ুমণ্ডলে সারাক্ষণ ভেসে বেড়ানো শব্দজটের ভেতর অস্বাভাবিক একটা কিছু সনাক্ত করেছে মাস্টার কম্পিউটর। ইলেক্ট্রোনিক ফিসফিসানি! মাই গড! ঝট করে সিধে হয়ে বসল গ্যারি, ঝাঁপ দিল সামনের টেলিফোনের রিসিভার লক্ষ্য করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠল লিসনিঙ স্টেশন। হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

দু'মিনিট পর বোঝা গেল, কম্পিউটর যা সনাক্ত করেছে তা সেকেণ্ড তিনেক স্থায়ী জট পাকানো কিছু শব্দের এক গোলাক ধাঁধা ছাড়া আর

কিছুই নয়। অনেকগুলো শব্দ যেন আটকে রাখা হয়েছিল পাইপের ভেতর, ট্যাপের প্যাঁচ খুলতেই ফোয়ারার মত হড় হড় করে বেরিয়ে এল একযোগে। স্কোয়ার্ট বলা হয় একে। সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে প্রেরিত কোন ক্ল্যানডেস্টাইন মেসেজ (গোপন বার্তা)। অত্যন্ত নিরাপদ। যার মর্মোদ্ধার মানুষ তো দূরের কথা, কম্পিউটরেরও সাধ্যের অতীত।

এ জাতীয় বার্তা তৈরি করতে প্রচুর সময় এবং শ্রম ব্যয় হয়। প্রথমে বার্তাটা পরিষ্কার করে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখতে হয়। পরে তা রূপান্তর করা হয় কোডে। এরপর ক্যাসেট রেকর্ডার চালিয়ে মোর্স-কী টিপে ওটা রেকর্ড করা হয়। কী-র ট্যাপ ট্যাপ উঁচু-নিচু পর্দার আওয়াজের ভেতরই লুকিয়ে থাকে বার্তা। বলা বাহুল্য রেকর্ডারটি এ ধরনের 'বিশেষ কাজের' জন্যেই তৈরি।

এবার নির্দিষ্ট একটি বোতাম টিপলেই কয়েক ইঞ্চি ফিতে জুড়ে রেকর্ড হওয়া কী-র ট্যাপিঙের আওয়াজগুলো এগিয়ে এসে একেবারে গায়ে গায়ে লেগে আধ ইঞ্চি কি বড়জোর পৌনে এক ইঞ্চি ফিতের ভেতর অবস্থান নেয়। ফলে বার্তাটা যখন ট্র্যান্সমিট করা হয়, সবগুলো অক্ষর বা ডট-ড্যাশ ইত্যাদি ফোয়ারার মত ছিটকে বেরিয়ে এসে ইথারে মুহূর্তের জন্যে ফিসফিসানির সৃষ্টি করেই গায়েব হয়ে যায়, পৌঁছে যায় জায়গামত। স্কোয়ার্টে কোন প্যাটার্ন বা রিপিটেশন থাকে না, কাজেই এর মর্মোদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।

সেটা না পারলেও কোত্থেকে স্কোয়ার্ট ট্র্যান্সমিট করা হলো, বিয়ারিঙ আর ক্রসবিয়ারিঙের সাহায্যে জায়গাটা পিন-পয়েন্ট করতে সময় লাগে না কম্পিউটরের। কাজেই, কম্মটি সেরেই ঘটনাস্থল ছেড়ে তক্ষুণি সরে পড়তে হয় প্রেরককে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল। দশ মিনিট পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতাশ হলো স্থানীয় পুলিস। ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্টের

জনশূন্য এক রাস্তার পাশের ছোটখাট একটা ঝোপ ওটা। যার ত্রিসীমানার মধ্যেও কেউ নেই।

নিয়ম আনুযায়ী চেলটেনহ্যামের জিসিএইচকিউ হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছল ক্ল্যানডেস্টাইন মেসেজটা। ঝটপট কাজে লেগে পড়ল ওখানকার ঝানু চীফ অ্যানালিস্ট। স্লো মুভিঙ রেকর্ডারে নতুন করে টেপ করা হলো স্কোয়ার্ট, ফুটখানেক ফিতে জুড়ে জায়গা নিল ওটা। যাতে প্রতিটি অক্ষর ডট-ড্যাশ আলাদা আলাদা সনাক্ত করা সম্ভব হয় সহজেই। কিন্তু কোন লাভ হলো না। চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো মানুষ এবং কম্পিউটর ব্রেনের মিলিত শক্তি। ফল দাঁড়াল বড় একটা অশ্বডিম্ব।

'এ নিশ্চয়ই কোন স্লীপার ট্র্যান্সমিটার, স্যার,' সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের কাছে রিপোর্ট করল চীফ অ্যানালিস্ট। 'ডেড ছিল, অ্যাকটিভ করা হয়েছে। উত্তর মিডল্যাণ্ডের কোথাও আছে ওটা খুব সম্ভব। আমাদের স্পাই বন্ধুটি প্রতি শব্দের জন্যে একটা করে ফ্রেশ ওয়ান-টাইম প্যাড ব্যবহার করেছে।'

সিদ্ধান্ত নেয়া হলো 'স্পাই বন্ধুটি' যে চ্যানেলে স্কোয়ার্ট ট্র্যান্সমিট করেছে তার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। যদিও সবাই নিশ্চিত, ফের যদি ট্র্যান্সমিট করে সে নিঃসন্দেহে অন্য চ্যানেলের মাধ্যমে করবে। তবুও। পরদিন দুপুরের আগেই গোপন মাধ্যমে ঘটনার লিখিত পূর্ণ বিবরণ পৌঁছে গেল লণ্ডনে, বিএসএস চীফের টেবিলে।

এর অনেক আগে, স্থানীয় সময় রাত দুটো তেতাল্লিশে বার্তাটা রিসিভ করা হয়েছে মস্কোয়। ওর বক্তব্য ছিল, মার্টিন ফ্ল্যানারি জায়গামত প্রস্তুত। প্রথম 'চালান' পৌঁছার অপেক্ষায় আছে সে।

দুই

রোববার। বিকেল পাঁচটা। হিথ্রো এয়ারপোর্টে অবতরণ করল অ্যারোফ্লোটের বিশালবপু এক টুপোলভ। নিয়মিত সরাসরি মস্কো-লণ্ডন ফ্লাইট। এই সংস্থার প্রতিটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে একজন করে অফিসার থাকে কেজিবির 'এজিয়েন্ট'। এদের কাজ পাইলট-ক্রুদের ওপর নজর রাখা এবং বিদেশে অবস্থানরত কেজিবির 'রেসিডেন্টুরা'-দেরকে প্রয়োজনে মেসেজ বা 'আর কিছু' পৌঁছে দেয়া।

এই ফ্লাইটেও রয়েছে তেমনি একজন, ফার্স্ট অফিসার ভলকভ। ঘণ্টা দুয়েক পর বিমানটি ক্লোজ ডাউন করে রাতের মত হস্তান্তর করা হলো গ্রাউণ্ড ক্রুদের হাতে। কাল ফিরে যাবে ওটা মস্কো। তার প্রতিটি স্টাফ টার্মিন্যাল ভবনের ফ্লাইট-ক্রু এনট্রি পথে ভেতরে ঢুকল। সবার সঙ্গে একটা করে ব্যাগ এবং গ্রিপ। এছাড়াও কয়েকজনের কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝোলানো পোর্টেবল রেডিও ট্রানজিস্টরও রয়েছে।

ব্যাগ আর গ্রিপ চেক করে ছেড়ে দিল তাদের কাস্টমস। অন্যগুলোর মত ভলকভের সনি মডেল পোর্টেবল সেটটার দিকেও দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না কেউ। ওরা পশ্চিমা বিলাস সামগ্রীর ভক্ত, জানে হিথ্রো কাস্টমস। বেরিয়ে এসে নিজেদের বিমান সংস্থার অপেক্ষমাণ মিনিবাসে করে গ্রীন পার্ক হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো দলটা।

মস্কো ত্যাগের তিন ঘণ্টা আগে পোর্টেবলটা ফার্স্ট অফিসার ভলকভকে গছিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা ভালই জানে, এসবের ওপর খুব একটা নজর দেয় না হিথ্রো কাস্টমস। নিজের স্যুইটে পা রাখতে পেরে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ভলকভ। বড্ড টেনশনে ছিল এতক্ষণ। জিনিসটার ওপর নজর বোলাবার প্রবল ইচ্ছে সংবরণ করতে পারল না ফার্স্ট অফিসার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সে ওটা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেখে দিল বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারে।

দরজায় তালা মেরে পা চালাল ভলকভ বারের উদ্দেশে। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে পোর্টেবলটা কোথায় কাকে হস্তান্তর করতে হবে খুব ভাল জানে সে। কেবল জানে না, মস্কো ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে তাকে এয়ারপোর্টেই। প্ল্যান অরোরার স্বার্থে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে ফেলা হবে তাকে। ওটা যে আসলে 'চিরদিনের জন্যে', কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি এবং মেজর কিরলভ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

'আপনি!' দরজা খুলে বিস্মিত হলেন রবার্ট ফিলবি। মনে মনে প্রতি মুহূর্তে লোকটির ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। তার অবসান হলো খানিকটা চমকে ওঠার মধ্যে দিয়ে।

'ভেতরে আসতে পারি?' ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'শিওর শিওর।'

লক্ষ করল রানা, মুখ শুকনো শুকনো লাগছে লোকটির। কালো দাগ পড়েছে চোখের নিচে। দুশ্চিন্তায় নিশ্চয়ই। দরজা বন্ধ করে রানাকে পথ দেখিয়ে সিটিংরুমে নিয়ে এলেন ফিলবি। 'বসুন, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ।' কোটের পকেট থেকে পেট মোটা একটা খাম বের করল

মাসুদ রানা। ভেতর থেকে বেরল সাতটা টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। ওপরে ডি অ্যাঙ্গাসের ক্রিকেট খেলার ছবিসহ পিন আপ করা। মুখ তুলল ও। 'আপনাকে যে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলাম তা ফলো করেছেন?'

'কোন্‌টা? ও হ্যাঁ, করেছি।'

'যোগাযোগ হয়েছে এর মধ্যে অ্যাঙ্গাসের সাথে?'

'হ্যাঁ, দু'বার। টেলিফোনে কথা হয়েছে।'

মিথ্যে নয়, জানে মাসুদ রানা। প্রথমবার ফিলবির সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই তার টেলিফোনের প্রতিটি আউট গোয়িং ইন কামিং কল ট্যাপ করার ব্যবস্থা করেছিল ও। ওদের রেকর্ডে দু'বারের কথাই আছে। দুটোই ইন কামিং। ডি অ্যাঙ্গাস করেছিল। তেমন কোন আলাপ হয়নি দু'জনের। সংক্ষিপ্ত, সাঙ্কেতিক দু'চারটে বাক্য বিনিময় হয়েছে কেবল।

'ঠিক আছে। এগুলো পড়ুন,' কাগজগুলো এগিয়ে দিল মাসুদ রানা।

'কি এসব?'

'পড়ে দেখুন,' নির্দেশের সুরে বলল ও।

ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলেন খানিক রবার্ট ফিলবি। তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটা উঁচু করে ধরে পড়তে শুরু করলেন। প্রথম পাতার মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়া হতে মুখ তুললেন। 'আপনি দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন?'

দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে পলকহীন চোখে তাঁকে দেখছে রানা। 'কীপ রীডিং, প্লীজ।'

আবার পড়ায় মন দিলেন ফিলবি। প্রথম দু'পাতা খুব দ্রুত পড়ে গেলেন। পরের প্রতিটি পাতায় কয়েকবার করে হোঁচট খেল তাঁর দৃষ্টি। কোন কোন জায়গা দু'বার তিনবার করেও পড়লেন। শ্বাস গ্রহণ বর্জনের

ভারি আওয়াজ ব্যাহত হলো কয়েকবার। এক সময় শেষ হলো পড়া। প্রায় এক মিনিট ধরে ছবিটা দেখলেন আবার তিনি। রক্ত সরে গিয়ে ছাইয়ের মত হয়ে গেছে ততক্ষণে চেহারা।

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন রবার্ট ফিলবি। দেহ অল্প অল্প দোল খাচ্ছে সামনে পিছনে। 'ওহ্, গড! এ আমি কি করেছি!'

'আ হেল্ অভ আ লট অভ ড্যামেজ, অ্যাকচুয়ালি।'

ভদ্রলোক নিজের বুদ্ধির দৈন্য অনুধাবন করতে পারছেন এখন হাড়ে হাড়ে, ভাবল মাসুদ রানা। চোখেমুখে তার চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চেহারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, ঝোড়ো কাকের মত দেখতে হয়েছে। বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে দেখতে দেখতে। মুখ তুললেন রবার্ট ফিলবি। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, 'এমন কোন উপায় কি আছে যাতে এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যায়, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'যারা আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করাতে চাইছিল, আমি প্রিটোরিয়া থেকে ফিরে আসার পর তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। একসঙ্গে এতজনকে সামাল দিতে গিয়ে ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছি আমি।'

'মিস্টার রানা,' প্রায় মিনতি ফুটল ফিলবির কণ্ঠে। 'আপনি যা করতে বলবেন, তাই করব আমি। যে কোন কাজ...'

'তিনটে কাজ করতে হবে আপনাকে আসলে,' বাধা দিয়ে বলল মাসুদ রানা।

'আমি প্রস্তুত। আই মীন ইট। যে-কোন কাজ, মিস্টার রানা।'

'ওয়েল। নাম্বার ওয়ান, নিয়মিত অফিস করতে থাকুন। সব রুটিন মাফিক চলতে হবে। শান্ত সারফেসে একটিও যেন বুদ্বুদ না ওঠে। নাম্বার টু, লেডি ফেডোরা যাতে আরও মাসখানেক শেফিল্ডে থাকেন, তা নিশ্চিত

করতে হবে যে ভাবে পারেন। কাল রাতে কয়েকজন লোক আসবে বিএসএস থেকে। ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্টের কাজ করবে ওরা। ডি অ্যাঙ্গাসের হাতে আপনি কোন্ কোন্ ডকুমেন্ট তুলে দিয়েছেন, তার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে ওদের। মনে রাখবেন, প্রতিটির হদিস চাই আমি। ডিটেল জানাবেন। একটি দাঁড়ি কমাও যদি উল্লেখ করতে ভুল করেন, সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেব আমি।'

'ভুল হবে না,' ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন রবার্ট ফিলবি। 'একটুও ভুল হবে না। প্রত্যেকটি ডট-কমা মনে আছে আমার।'

'দেখা যাবে।'

'ইয়ে, তিনটে কাজ বলেছিলেন আপনি।'

'হ্যাঁ। মাঝে মধ্যে ডকুমেন্ট হস্তান্তর করবেন ডি অ্যাঙ্গাসকে। আপনার ইউজুয়াল চ্যানেলে।'

'কিসের ডকুমেন্ট?'

'সময়মত তৈরি করে দেয়া হবে।'

'ডিজইনফর্মেশন?'

'এগজ্যাক্টলি। নিজের দেশের প্রচুর ক্ষতি করেছেন, মিস্টার ফিলবি। এবার ওদের কিছু ক্ষতি করুন। মনে রাখবেন, অ্যাঙ্গাসের মুখোমুখি হওয়া চলবে না এখনই। আপনার চেহারা দেখলেই বিপদ টের পেয়ে যাবে ও, হয়তো সটকে পড়বে। সে ক্ষেত্রে মাঝখান থেকে আপনি ফেঁসে যাবেন।'

'কিন্তু ও যদি দেখা করতে চায়?'

'যে-কোন ব্যস্ততার অজুহাতে কাটিয়ে দেবেন। আমি না বলা পর্যন্ত দেখা করা চলবে না।'

পাঁচ মিনিট পর ফন্টেনয় হাউস থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

সকাল সাড়ে নয়টা। হিথ্রোর এয়ার লাইনার স্টাফদের ক্যান্টিনে প্রচুর

সময় নিয়ে নাশতা সারল অ্যারোফ্লোটের ফার্স্ট অফিসার ভলকভ। তারপর দু'কাপ কালো কফি এবং দুটো সিগারেট ধ্বংস করল। ঠিক পৌনে দশটায় মেনস টয়লেটে এসে ঢুকল সে। আগে একবার এসে দেখে গেছে সে ঠিক কোন কিউবিক্‌ল্‌-এ ঢুকতে হবে তাকে। একদম শেষ মাথার দ্বিতীয়টা। চেক করে দেখেছে, প্রথমটির দরজা কথা মত লক করা আছে।

নির্দিষ্ট কিউবিক্‌ল্‌-এ ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ফার্স্ট অফিসার। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ছয় শব্দের একটি প্রশ্ন লিখল। তারপর ঝুঁকে ওটা পার্টিশনের নিচ দিয়ে ঠেলে দিল প্রথমটির ভেতরে। একটা হাত তুলে নিল কার্ডটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিল আবার। উল্টোপিঠে প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে।

সন্তুষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাল ভলকভ, ঠিকই আছে। এবার সনি পোর্টেবলটা আলতো করে ওপাশে পাঠিয়ে দিল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। বাইরে ইউরিনালে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ, ছর ছর শব্দ আসছে। কমোড ফ্লাশ করল ভলকভ। বেরিয়ে এসে বেসিনের সামনে দাঁড়াল। ইউরিনাল ব্যবহারকারীর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া চালিয়ে গেল সে। তারপর বেরিয়ে এল তার পিছন পিছন।

কাস্টমস ব্যারিয়ার পেরিয়ে এসে নিজেদের বিমানে উঠল ফার্স্ট অফিসার আর সবার সঙ্গে। কাঁধে যে তার পোর্টেবলটা নেই, চোখেই পড়েনি কাস্টমসের। ওদিকে তার সঙ্গীরা ভাবল জিনিসটা নিশ্চয়ই তার গ্রিপে রয়েছে। ঠিক একটায় মাটি ত্যাগ করল অ্যারোফ্লোটের টুপোলভ। মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ ওরফে মার্টিন ফ্ল্যানারির প্রথম চালান নিরাপদেই হস্তান্তর করে যেতে পেরেছে ভলকভ।

পরদিন রাত আটটায় বিএসএস আর ডিফেন্স মিনিস্ট্রির অ্যানালিস্টদের

একটি যৌথ ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট টীম বেলগ্রাভিয়া রোডের ফন্টেনয় হাউসে প্রবেশ করল। প্রস্তুত ছিলেন রবার্ট ফিলবি। শুরু হলো বৈঠক। প্রথম কাজ সনাক্তকরণ। যে সব ডকুমেন্ট এ পর্যন্ত মস্কো গেছে অ্যাঙ্গাসের হাত দিয়ে, সেগুলো চিহ্নিত করা। প্রায় সারা রাত ধরে চলল বৈঠক।

মিনিস্ট্রির ওরা ডকুমেন্ট উইথড্রআল আর রিটার্নের রেজিস্ট্রি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ওতে কবে কোন সেকশন থেকে কি কি ডকুমেন্ট নিজ ডেস্কে আনিয়েছেন ফিলবি, কবে তা ফেরত দিয়েছেন, সব রেকর্ড আছে। ভদ্রলোক এক-আধটার কথা 'ভুলে' গিয়ে থাকলে তা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে আনা হয়েছে ওটা। সঙ্গে ডকুমেন্টগুলোর একটা করে ফটোকপিও। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। দেখা গেল কিছুই ভোলেননি ফিলবি, প্রতিটির কথাই মনে আছে।

এর পরদিন বেশ কিছু 'ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট' তৈরির কাজে লেগে পড়ল যৌথ দলটি। উপযুক্ত সময়ে ডি অ্যাঙ্গাসের হাত হয়ে মস্কো পৌঁছুবে ওগুলো।

ফিনিয়েস্টন কী। গ্লাসগো। সোভিয়েত কার্গো শিপ আকাডেমিক কোমারভ বাঁধা আছে জেটিতে। আজই দুপুরে পৌঁছেছে ওটা মালামাল নিয়ে। সন্ধে পর্যন্ত পোর্ট অথরিটির হেভি ক্রেনগুলো আনলোডিং চালিয়েছে বিরতিহীন। আপাতত বন্ধ কাজ, কাল ফের শুরু হবে।

এখানে কাস্টমস বা ইমিগ্রেশন চেকিঙের ঝামেলা নেই। বিদেশী ক্রুরা ইচ্ছে করলেই নিজ জাহাজ ত্যাগ করতে পারে, ঘোরাঘুরি করতে পারে শহরে। রাত বারোটা। আকাডেমিক কোমারভের ডেকহ্যাণ্ড আঁদ্রেই পাভলভ গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের মাথায় এসে দাঁড়াল। সতর্ক চোখে ডানে বাঁয়ে চোখ বোলাতে লাগল সে।

মানুষজন আছে এখনও কিছু, তবে দূরে দূরে। কেউ নজর রাখছে না ওদের ওপর। তবু ভাল করে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কয়েক মিনিট ব্যয় করল ডেকহ্যাও। তারপর তর তর করে নেমে এল জেটিতে। বন্দর সীমানা গেটের বাইরেই মুখোমুখি একটি বার, বেটি'স বার। নিয়ম অনুযায়ী ঠিক বারোটায় বন্ধ হয়ে গেছে ওটার দরজা। কিন্তু বেশ কিছু মাতাল নাবিক হল্লা করছে সামনে দাঁড়িয়ে, আরও পান করতে চায়। ঠিক ঘড়ি ধরে বার বন্ধ করে দেয়াটা পছন্দ হয়নি তাদের।

দূর থেকে জটলাটার পাশ কাটিয়ে ফিনিয়েস্টন স্ট্রীটে এসে পড়ল পাভলভ। কর্ড ট্রাউজারস, গোল গলা সোয়েটার আর অ্যানোরাক পরেছে সে। পায়ে ভারী জুতো। পাভলভের চেহারা-সুরত নিতান্তই সাধারণ। বাঁ বগলের নিচে একটা ছোট ক্যানভাসের গানি স্যাক ঝুলছে তার। কাঁধের ওপর, ঘাড়ের কাছে ড্রস্ট্রিং দিয়ে বাঁধা, যাতে পড়ে না যায়।

ক্লাইডসাইড এক্সপ্রেসওয়ে পেরিয়ে এসে আরজিল স্ট্রীটে পৌঁছল লোকটা। বাঁয়ে ঘুরে জোর পা চালাল প্যাট্রিক ক্রসের উদ্দেশে। জীবনে কোনদিন এ শহরে আসেনি সে, কাজেই রাস্তাঘাট চেনার প্রশ্নই আসে না। সঙ্গে সিটি ম্যাপও নেই পাভলভের। তবু সঠিক পথেই এগোচ্ছে সে। কারণ দেশ ত্যাগ করার আগে কম্পিউটরের পর্দায় কোন পথে কোন পর্যন্ত যেতে হবে ভাল করে দেখে আত্মস্থ করে নিয়ে এসেছে সে।

এখন আর কোনদিকে তাকাবার গরজ দেখা যাচ্ছে না পাভলভের ভেতর। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। কদাচিৎ এক-আধটা গাড়ি চোখে পড়ে। অতএব নিশ্চিন্ত মনে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে ডেকহ্যাও গন্তব্যের উদ্দেশে। প্যাট্রিক ক্রস ধরে পুরো এক মাইল উত্তরে এগোল সে। ডানে বাঁক নিয়ে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রোডে পৌঁছল।

চট করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল আঁদ্রেই পাভলভ। একটা

ত্রিশ। এখনও পুরো আধঘণ্টা সময় হাতে আছে, অথচ গন্তব্যে পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। আবার ডানে চলল সে। পণ্ড হোটেল বাঁয়ে রেখে বোটিং লেকের তীর ধরে হাঁটছে। হঠাৎ করেই জায়গাটা চোখে পড়ল পাভলভের। আলো ঝলমলে এক বিপি সার্ভিস স্টেশন। ওই পর্যন্তই তার দৌড়। আর বড়জোর দুশো গজ, তারপরই মুক্তি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল আঁদ্রেই, এই সময় আবছা কাঠামোগুলো চোখে পড়ল। ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠল সে। হোটেল এবং সার্ভিস স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় অন্ধকার এক বাস স্টপের যাত্রী ছাউনির নিচে বসে আছে ওরা। পাঁচজন। দশাসই ফিগার একেকজনের। সব ক'টা মাতাল, দেখেই টের পেল ডেকহ্যাণ্ড। গতি কমে এসেছে তার আপনাআপনি। এগোবে না কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

এদেশের কোথাও কোথাও এদের বলা হয় 'স্কিনহেডস্' অথবা 'পাঙ্কস্'। তবে গ্লাসগোয় বলা হয় 'নেডস্'। রাস্তা অতিক্রম করবে কি না, ভাবল একবার পাভলভ। ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না তার। একভাবে ওকেই দেখছে ব্যাটারা। হঠাৎ করেই ওদের একজন হাঁক ছাড়ল তার উদ্দেশে। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে দল বেঁধে বেরিয়ে এল সবাই ছাউনি ছেড়ে। ঘিরে ধরল পাভলভকে।

ওদের আকার এবং রক্ত জমা লাল চোখের অস্থির চাউনি আতঙ্কিত করে তুলল লোকটিকে। একজন কি যেন জিজ্ঞেস করল জড়ানো কণ্ঠে, কিছুই বুঝল না পাভলভ। কাজ চালিয়ে নেয়ার মত ইয়েস নো ভেরি গুড জাতীয় দু'চারটে ইংরেজি জানে সে ঠিকই, কিন্তু একে জড়ানো কণ্ঠ, তারওপর গ্লাসগোর বাজে অ্যাকসেন্ট, একটা শব্দও পরিচিত মনে হলো না তার। বেকুবের মত এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল অসহায় দৃষ্টিতে

উত্তর না পেয়ে খেপে গেল মাতাল। দুহাতে সবলে জাপটে ধরল

তাকে। কানের কাছে বাজখাঁই গলায় আবারও একই প্রশ্ন করল। 'হোয়া' হা' ইয়া গট ইন ইয়া উয়ী স্যাক, দেন?'

জোরে জোরে মাথা দোলাল পাভলভ। লোকটিকে বোঝাতে চাইল তার বক্তব্য বুঝতে পারেনি সে। একই সঙ্গে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মোড়ামুড়ি শুরু করল। পর মুহূর্তে বৃষ্টির মত এলোপাতাড়ি কিল ঘুসি আর লাথির তোড়ে মুখ থুবড়ে পড়ল আঁদ্রেই পাভলভ। শক্ত রাস্তায় ভীষণ জোরে নাক ঠুকে গেল তার। সমানে চেঁচাচ্ছে নেড়ের দল আর নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে তাকে। ওরই মাঝে কেউ তার গানি স্যাকটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, টের পেয়ে গেল আঁদ্রেই কাঁধের পেশীতে ড্রস্ট্রিঙের টান বেড়ে যেতে।

মরিয়া হয়ে উঠল ডেকহ্যাণ্ড। জান যায় যাক, ওটা ছিনিয়ে নিতে দেবে না সে। দু'হাতে বুকের কাছে ব্যাগটা চেপে ধরল সে, বহুকষ্টে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল মাটি কামড়ে। পিছন থেকে কিডনি আর মাথার ওপর সমানে লাথি হেঁকে চলেছে লোকগুলো, থামাথামির লক্ষণ নেই। নীরবে প্রতিটি মার হজম করতে লাগল পাভলভ। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মাথার ভেতর মগজ বিস্ফোরিত হচ্ছে যেন প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে তার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা মুখ।

ঘটনাস্থলের সামান্য দূরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের কলোনি,
ডেভনশায়ার টেরেস। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ভবন। ওর একটির চারতলায় থাকেন নিঃসন্তান, বিপত্নীক মিস্টার বেরেনসন। বাতের ব্যথায় ঘুম হয় না রাতে। নিচ থেকে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসায় দ্রুত বিছানা ত্যাগ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ কপালে তুলে কয়েক সেকেণ্ড ব্যাপারটা লক্ষ করলেন, তারপর বাতের ব্যথা

ভুলে ছুটে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন।

কাছাকাছিই ছিল একটা পেট্রল কার। স্টেশন-ইন-চার্জের নির্দেশ পেয়ে ঝড়ের বেগে এসে হাজির হলো ওটা জায়গামত। সাইরেনের আওয়াজ আর হেডলাইটের আলো দেখে গানি স্যাকের আশা ছেড়ে দিল নেড়ের দল। নিঃসাড় আঁদ্রেইকে ছেড়ে তীরবেগে ছুট লাগাল অন্ধকার বোটিং লেকের দিকে। অজ্ঞান দেহটিকে রক্তের নদীতে ভাসতে দেখে ওদের ধাওয়া করার চিন্তা বাদ দিল কারের দুই আরোহী, সার্জেন্ট হিউই এবং সার্জেন্ট ব্রায়ান।

পাভলভের পালস্ পরীক্ষা করল হিউই এক মুহূর্ত। 'এক্ষুণি অ্যাম্বুলেন্স ডাকো, ব্রায়ান!'

ওয়েস্টার্ন ইনফার্মারি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছল চার মিনিটের মধ্যে। পাভলভের দেহটা ততক্ষণে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে হিউই। কাঁধ থেকে খুলে নিয়েছে গানি স্যাক। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো তাকে। 'তুমি ওর সঙ্গে যাও!' পেট্রল কার থেকে চেঁচিয়ে বলল ব্রায়ান। 'আমি আসছি পিছন পিছন।'

এবার আরও দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছল অ্যাম্বুলেন্স। ট্রলি ঠেলে দু'তিনটে সুইং ডোর, করিডর পেরিয়ে ভবনের পিছনদিকের এমার্জেন্সি অ্যাডমিশনে ঢোকানো হলো আঁদ্রেইকে।

'আমি ভেতরে চললাম,' ব্রায়ানকে বলল হিউই। 'তুমি থাকো এখানে। এর ভর্তি ফরমটা পূরণ করে ফেলো।'

'ওকে।'

গানি স্যাক দোলাতে-দোলাতে করিডর ধরে ভেতরে চলল সার্জেন্ট হিউই। ব্যাগের ভেতর কি আছে দেখা হয়নি এখনও। তা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথাও নেই তার। ক্যাজুয়ালটিতে পা রাখল সার্জেন্ট। দু'পাশে পর্দা

ঢাকা বারোটা রূম। একটা ডিউটি নার্সের অফিস, এগারোটা এক্‌জামিনেশন রূম। জায়গাটা হাসপাতালের রিয়ার এন্ট্রান্সের একেবারে কাছে। ওদিকে সামনের পোর্টারস ডেস্কে বসে পড়ল ব্রায়ান। আঁদ্রেই পাভলভের ভর্তির ফরম তৈরি করার জন্যে।

এদিকে ট্রলির পাশে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল হিউই। কয়েকজন নার্স ব্যস্ত ট্রলি ঘিরে। লোকটা আছে না গেছে বোঝা যাচ্ছে না। নাইট শিফটের ডিউটিতে আছে অল্পবয়সী পাকিস্তানি এক ডাক্তার। লম্বা সময় নিয়ে ডেকহ্যাণ্ডের নাড়ি-নক্ষত্র পরীক্ষা করল সে। তারপর মাথা এক্স-রে করার নির্দেশ দিয়ে ছুটল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আরেকজনকে দেখতে।

কিন্তু যন্ত্রটা এ মুহূর্তে ব্যস্ত, ওয়ার্ড সিস্টারের টেলিফোনের উত্তরে জানাল এক্স-রে ইউনিট। কাজ শেষ হলে জানানো হবে সিস্টারকে। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। নিজের জন্যে কফির পানি চড়াল ওয়ার্ড নার্স। আরেক জুনিয়র নার্স আঁদ্রেইর রক্তাক্ত অ্যানোরাক খুলে এনে রাখল তার টেবিলের ওপর।

'কফি চলবে?' হিউইকে প্রশ্ন করল সিস্টার।

'খুব চলবে। ধন্যবাদ।' অ্যানোরাকের পকেট হাতাতে শুরু করল সার্জেন্ট। দ্বিতীয় পকেট থেকে বের হলো একটা সীম্যানস পে-বুক। ভেতরে মৃতপ্রায় লোকটির ছবি সাঁটা। রুশ এবং ফরাসী ভাষায় লেখা বইটা। তবে ফরাসী অংশে রোমান হরফে লেখা ডেকহ্যাণ্ডের নামটা রয়েছে। ওটা পড়ল সে। আর কিছুই বুঝল না।

'কে লোকটা?' সার্জেন্টের সামনে কফির কাপ রেখে জানতে চাইল সিস্টার।

'সীম্যান,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল হিউই। 'রাশান।' লোকটা এখানকার

কেউ হলে কোন সমস্যা ছিল না। একে বিদেশী, তাও আবার রাশিয়ান। তুলোধোনা হয়েছে নেডদের হাতে। ঝামেলায়ই পড়া গেল, তিক্ত মনে ভাবল সার্জেন্ট। এ গেরো থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। এবার গানি স্যাকে হাত ঢোকাল সে।

ভেতরে পুরু উলের একটা সোয়েটার। ওটা দিয়ে শক্ত কিছু একটা মুড়ে রাখা হয়েছে। জিনিসটা বের করল সার্জেন্ট—একটা টোব্যাকো টিন। পেঁচিয়ে ওটার মুখ খুলল। ভেতরে ঠেসে ঢোকানো আছে এক দলা কটন উল। টিনটা উপুড় করে ঝাঁকি দিল হিউই। সড়াৎ করে বেরিয়ে এল কটন উল, টেবিলের ওপর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ তুলে তিনটে ধাতব ডিস্ক আছড়ে পড়ল। দুটো অ্যালুমিনিয়াম এবং একটা হালকা ধূসর রঙের। তিনটেই দুই ইঞ্চি ডায়ার। কি এগুলো? ভাবল সার্জেন্ট। উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর যেমন ছিল তেমনি ভরে রাখল টিনের মত। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল হিউই। এখনই ডিভিশনে ফোন করা উচিত, ভাবল সে। নইলে পরে ধাতানি খেতে হতে পারে। যা-তা নয়, রাশিয়ান নাবিক লোকটা। গুরুত্ব দেয়া দরকার। 'আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'শিওর,' মাথা ঝাঁকাল ওয়ার্ড সিস্টার। বেরিয়ে গেল রূম ছেড়ে।

রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাতে আরম্ভ করল সার্জেন্ট। এই সময় হঠাৎ করেই জ্ঞান ফিরে পেল আঁদ্রেই পাভলভ। কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, মাথার ভেতর কেমন একটা ধোঁয়াটে ভাব। সব কিছু দুলছে। বহু কষ্টে মাথা তুলল সে ইঞ্চি দুয়েক। কালো ইউনিফর্ম পরা হিউইকে দেখেই কলজে লাফিয়ে উঠল। পুলিস!

তার ডান কনুইয়ের কাছে টেবিলের ওপর নিজের পে-বুক আর

টোব্যাকো টিনটা দেখতে পেয়ে চক্কর দিয়ে উঠল পাভলভের মাথার মধ্যে। সর্বনাশ! ভেতরের জিনিসগুলো কি দেখেছে লোকটা? চিনে ফেলেছে ওগুলো কি? সেই খবরই জানাতে যাচ্ছে ফোন করে? কোন এক অজানা শক্তি যেন ধাক্কা মেরে ট্রলি থেকে নামিয়ে দিল পাভলভকে।

কাঁধে কারও শক্ত গুঁতো খেয়ে চমকে উঠল সার্জেন্ট, পাশে তাকাল। ততক্ষণে টোব্যাকো টিনটা ঝটকা মেরে তুলে নিয়েছে আঁদ্রেই। 'হেই, ম্যান...।' রিসিভার ফেলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল হিউই। মাথায় আঘাত পেয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে হয়তো লোকটা, ভেবে তাকে শান্ত করার জন্যে জড়িয়ে ধরল পিছন থেকে। 'শান্ত হও, ব্রাদার। কোন ভয় নেই।'

কিন্তু শান্ত হওয়ার কোন লক্ষণ নেই পাভলভের মধ্যে। গায়ের জোরে টানা হ্যাঁচড়া করে নিজেকে মুক্ত করে নিল সে। জোর খাটাতে গিয়েই হঠাৎ করে টিনটা ছুটে গেল তার হাত থেকে। গড়িয়ে চলে গেল নাগালের বাইরে। সেদিকে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত পাভলভ, তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল করিডর ধরে।

'হেই, ম্যান! কাম ব্যাক, কাম ব্যাক!' সার্জেন্টও ছুটল পাভলভের পিছন পিছন।

সামনেই এক্স-রে রুম। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাস্টি ইনগ্রাম। লোকটি মাঝবয়সী কারখানা শ্রমিক। ডিউটির সময় ছাড়া বাকি সময় মদে বুঁদ হয়ে থাকা একমাত্র নেশা তার। আজ তার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল। তাই সকাল থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত মদ গিলেছে বারে বসে। পকেট খালি করে বাসায় ফেরার পথে একটা ল্যাম্পপোস্ট আচমকা অন্যায় ভাবে পথরোধ করে দাঁড়ায় তার। প্রথমে নরম সুরেই তাকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল রাস্টি। কাজ হলো না, বরং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আরও কাছে এসে দাঁড়াল ওটা। আত্মরক্ষার্থে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাস্টি। ওটার কি হাল হয়েছে জানার সুযোগ হয়নি, কারণ

লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই পুলিস তাকে পাকড়াও করেছে। বলে কি না, রাস্টি ইনগ্রামের ডান হাত ভেঙে গেছে।

তার হাজারো আপত্তি কানেই তোলেনি পুলিস, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসেছে হাসপাতালে। ওদের ওপর তাই বড় রাগ ইনগ্রামের। আধা মাতাল সে এখনও। এক্স-রে সেরে ডাক্তার তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলেছে বলে করিডরে বসার জন্যে এসেছে। এই সময় ধুম্ ধাম্ পায়ের শব্দে মুখ তুলল সে। চোখ পড়ল আতঙ্কিত রক্তাক্ত পাভলভের ওপর। এবং পরক্ষণেই সার্জেন্ট হিউইর ওপর।

কালো পোশাকের ওপর রাগটা চেগিয়ে উঠল রাস্টি ইনগ্রামের। ওই লোকটিকেও নিশ্চয়ই ওর মত···ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই ঝড়ের গতিতে ইনগ্রামকে পাশ কাটাল পাভলভ। তার ঠিক চার ফুট পিছনেই সার্জেন্ট হিউই। আস্তে করে ডান পা-টা বাড়িয়ে দিল ইনগ্রাম। ল্যাঙ খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ল হিউইর ভারী দেহটা।

'ইউ স্টুপিড উয়ী বাগার!' প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল হিউই, পরক্ষণেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল ফ্লোরে। সড় সড় করে ফুট কয়েক পিছলে এগিয়ে গেল দেহটা। মেঝে কেঁপে উঠতে পিছনে তাকাল আঁদ্রেই এক পলক, বাড়িয়ে দিল ছোটার গতি।

রাগে গা জ্বলে গেলেও কিছু করার নেই হিউইর। আঁদ্রেই ততক্ষণে প্রায় দশ গজ পিছনে ফেলে দিয়েছে তাকে। ইনগ্রামের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলার ভঙ্গি করল সে, তারপর আবার ছুটল ডেকহ্যাণ্ডের পিছনে। করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছেই পাশাপাশি দুটো এলিভেটরের ওপর চোখ পড়ল পাভলভের। একটার দরজা আধখোলা, বন্ধ হতে শুরু করেছে, ভেতরে নেই কেউ।

দিশে না পেয়ে সেদিকেই ছুটল ডেকহ্যাণ্ড। একেবারে শেষ মুহূর্তে কাত হয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল এলিভেটরে। বন্ধ দরজার গায়ে হিউইর

দমাদম কিলের আওয়াজ উঠছে, অনবরত চেঁচাচ্ছে লোকটা। দুলে উঠে ওপরদিক রওনা হলো এলিভেটর। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল আঁদ্রেই।

ওদিকে এলিভেটর শ্যাফটের পিছনেই স্টেয়ারওয়েল। ক্যাঙ্গারুর মত একেক লাফে চারটে করে ধাপ টপকে ওপরে উঠতে শুরু করল সার্জেন্ট হিউই। প্রতি ফ্লোরেই ছুটে ছুটে এসে এলিভেটর ইণ্ডিকেটরের ওপর চোখ বোলাচ্ছে। কোন ফ্লোরে আছে ওটা, নিজে কতখানি পিছিয়ে পড়েছে বোঝার জন্যে। কোথাও না থেমে সোজা টপ ফ্লোরে, দশতলায় উঠে গেল এলিভেটর। ছুটতে ছুটতে জিভ বেরিয়ে পড়ল হিউইর। দম ফেলছে ঝড়ের বেগে।

শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল সে। জায়গামত পৌঁছে দেখল দাঁড়িয়ে রয়েছে এলিভেটর। দরজা খোলা, কেউ নেই ভেতরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক হাঁপাল সে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আঁদ্রেইর খোঁজে। দীর্ঘ করিডর ফাঁকা। কোথাও কোন চিহ্ন নেই তার। ছুটল সার্জেন্ট। দশতলার প্রতিটি ওয়ার্ড, কেবিন খুঁজে দেখল, নেই সে। কেউ কিছু বলতে পারল না।

হঠাৎ কি মনে হতে আবার স্টেয়ারওয়েলের দিকে ছুটল হিউই। তিন-চার লাফে উঠে এল ছাতে। দরজা পেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠল সে। তারা জ্বলা আকাশের গায়ে ছায়া পড়েছে পাভলভের। উত্তর দিকের প্যারাপেটে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে।

'আঁদ্রেই!' গলার স্বর আটকে গেল হিউইর। 'পাভেল! নেমে এসো, ভাই। কোন ভয় নেই তোমার। নেমে এসো, তোমার চিকিৎসা দরকার।'

পা বাড়াল সে। অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। নিচের ঘরবাড়ি, রাস্তার আলোয় আঁদ্রেইর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

নিজের শূন্য দু'হাত তুলে দেখাল সার্জেন্ট। 'এই দেখো, কোন অস্ত্র নেই আমার হাতে, আঁদ্রেই। কোন ভয় নেই তোমার। প্লীজ, নেমে এসো। পা পিছলে গেলে...।'

সার্জেন্ট বিশ ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে দেখে কিছুটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল পাভলভ। দ্রুত একবার নিচে তাকাল। দম নিল লম্বা করে। চোখ বুজল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে। আহাম্মক হয়ে গেল সার্জেন্ট। কয়েক সেকেণ্ড বিশ্বাসই করে উঠতে পারল না যা দেখল তা মিথ্যে নয়। সত্যি। নিচের স্টাফ কার পার্কে পতনের ভারী আওয়াজ উঠল।

চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল সার্জেন্টের। 'হা ঈশ্বর! মরে গেছি!' কাঁপা হাতে বেল্টে ঝোলানো পারসোন্যাল রেডিওটা বের করল সে।

বিপি সার্ভিস স্টেশনের একশো গজ ওপাশে বিশাল বিএমডব্লিউর ওপর মূর্তির মত বসে আছে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। একটা বড় ঝোপের আড়ালে। একে জায়গাটা অন্ধকার, তারওপর কালো মোটরসাইকেল লেদার পরে থাকায় ভাল করে তাকালেও কেউ দেখতে পাবে না তাতায়েভকে।

ঘড়ি দেখল সে। তিনটে। দুটোয় পৌঁছার কথা তার দ্বিতীয় চালান। কিন্তু এল না। আর অপেক্ষা করারও উপায় নেই। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরও যদি চালান না পৌঁছায়, তো সে স্থান ছেড়ে সরে পড়ার নির্দেশ আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মেজর। আবার মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাকে। জানাতে হবে ব্যাক-আপ কুরিয়ার পাঠাবার কথা। এঞ্জিন স্টার্ট দিল তাতায়েভ।

*

ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে 'প্রতিবেশীকে' (স্থানীয় ভাষায় সহকারী) ছুটে আসতে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট ব্রায়ান। 'কি ব্যাপার!' হিউইর ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে। 'লোকটার পরিচয় জানা গেল?'

'লোকটা...লোকটা ছিল সীম্যান, রাশান।'

'এই রে! বেঁচে আছে, না...।'

'নেই,' দ্রুত মাথা দোলাল হিউই। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে বুঝি। 'লোকটা আত্মহত্যা করেছে, ব্রায়ান। লাফিয়ে পড়েছে ছাদ থেকে।'

অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে প্রতিবেশীর দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ ব্রায়ান। 'বলো কি!' পরক্ষণে বিস্ময় আর অবিশ্বাসের জায়গা দখল করল পুলিসী ট্রেনিং। সে জানে, যখনই কোন গণ্ডগোল দেখা দেবে, আগে নিজের পিঠ আর চাকরি বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা যে করেই হোক। প্রতিটি পা ফেলতে হবে প্রসিডিওর অনুযায়ী। কোন কাউবয় ট্যাকটিক নয়। নয় কোন অতি স্মার্ট চালাকি। 'ডিভিশনে যোগাযোগ করেছ?'

'আয়ি,' মাথা ঝাঁকাল হিউই।

'চলো, ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাক।'

তিন

বাঁ হাতের চেটোয় মাথা রেখে প্রায় শুয়ে আছে গিলটি মিয়া টেবিলের ওপর। কাগজে আঁকিবুকি করছে। নাকি সুরে চাপা কণ্ঠে গাইছে, 'মাঁটির পিঁঞ্জিরার মাঁজে-এ-এ...।'

রানা এজেন্সির ফ্রন্ট অফিস এটা। বেলা তিনটে। ব্যক্তিগত কাজে রানার পি.এ মেয়েটি ছুটি নিয়েছে আজ আধবেলার জন্যে। গিলটি মিয়া সামলাচ্ছে তার কাজ। 'হাঁছুন রাঁজার মঁন মঁয়না' পর্যন্ত পৌঁছেছে সে, এমন সময় নক হলো দরজায়। বিরক্ত মুখে ওই অবস্থায়ই ঘুরে তাকাল গিলটি মিয়া। 'ক্যা?'

খুলে গেল দরজা দড়াম করে। কেঁপে উঠল পার্টেক্স পার্টিশন। সেই সঙ্গে গিলটি মিয়াও। পরক্ষণেই চমকে গেল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটিকে দেখে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাড-মিনিস্ট্রেটর, সোহেল আহমেদ। বাঘের দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে সোহেল। অসাড় আঙুলের ফাঁক গলে কলমটা খসে পড়ল গিলটি মিয়ার। স্প্রিঙের মত তড়াক করে আসন ছাড়ল সে, সালাম করার ভঙ্গিতে কপালে উঠে গেছে ডান হাত।

এই 'হাত কাটা সায়েবকে' যমের চেয়েও বেশি ভয় করে সে। তার চোখের দিকে তাকালে হিম হয়ে যায় বুকের ভেতরটা। কী চাউনি! ঠিক

যেন শামসুদ্দীন দারোগা। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে জ্বর উঠে যায় গতরে। 'স্যা...স্যার, আপনি?'

'রানা কোথায়?' হুঙ্কার ছাড়ল সোহেল।

'ওপরে, স্যার। ঘুমুচ্চেন।'

ভেংচি কাটল সোহেল, 'বা বা বা! ঘুমুচ্চেন! একজন ভর দুপুরে ঘুমুচ্ছেন, আরেকজন শুয়ে শুয়ে গলা সাধছেন। ভালই চালাচ্ছ তোমরা অফিস। দাঁড়াও, বার করছি তোমাদের...।' ঘুরে দাঁড়াল সোহেল আহমেদ। পা চালাল সিঁড়ির দিকে।

রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া, পা বাড়াতে গেল পিছন পিছন। কিন্তু সোহেলকে ঘাড় ফেরাতে দেখে থেমে পড়ল। 'তুমি কেন আসছ?'

'না, স্যার,' এক প্পা পিছাল গিলটি মিয়া। 'আস্চি নে। আসবো কোতায়?' সুড়ুৎ করে রুমে সেঁধিয়ে গেল সে।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ হাসি ঠেকিয়ে রেখেছিল সোহেল। আর পারল না। হাসতে হাসতে ওপরে চলল সে। ওদিকে দিবাস্বপ্নে বিভোর মাসুদ রানা। ধানমণ্ডি লেকে মাছ ধরছে ও আর সোহেল। টোপ ফেলামাত্র টান পড়ল সোহেলের ফাৎনায়। 'ওরেশ্ শা-লা!' বলে ছিপ ধরে হ্যাঁচকা টান লাগাল সোহেল। কিন্তু বাধল না মাছটা, ছুটে গেছে। ওদিকে টান খেয়ে পানি ছেড়ে উঠে পড়েছে বড়শি, ঘুরে এসে 'কুট' করে বিঁধে গেল ওটা রানার বাঁ কানের লতিতে।

'উফ্!' নড়ে উঠল মাসুদ রানা। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে সচকিত হলো। চোখ না মেলেই বুঝল বড়শি বেঁধার জন্যে নয়, আর কোন কারণে ব্যথা করছে কান। চট করে চোখ মেলল রানা।

'কি, চাঁদ?' কানটা ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল সোহেল, মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'খুব তো কাজের কথা বলে দিনের পর দিন বিদেশে পড়ে থাকা

হচ্ছে। টিএ ডিএর নাম করে রোজ শ'শ' ডলার ড্র করা হচ্ছে। এই নাকি সে কাজের নমুনা?'

'আরে! দোস্ত, তুই?' ঝট করে উঠে বসল মাসুদ রানা। ঘুমের রেশ মুহূর্তে কেটে গেছে। অনেক দিন পর প্রিয়তম বন্ধুর দেখা পেয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল রানা। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। নইলে কথা নেই বার্তা নেই লণ্ডনে কেন সোহেল? 'ব্যাপার কি, সোহেল? তুই হঠাৎ?'

'সে কি!' কৃত্রিম অবাক হলো সোহেল। বসে পড়ল বিছানায়। 'তুই জানিস্‌নে?'

'কিসের কথা?' চোখ কোঁচকাল রানা।

'তোকে ছাঁটাই করা হয়েছে! একেবারে যাকে বলে ডিসমিস।'

গম্ভীর হলো ও। 'আমার অপরাধ?'

যেন খুব দুঃখ পেয়েছে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সোহেল শব্দ করে। 'অযোগ্যতা, দোস্ত। অযোগ্যতা। আমি অনেকদিন ধরেই বুড়োকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, দোস্ত, যে তুই আর আগের সেই মাসুদ রানা নেই। ছাতা পড়েছে তোর রেপুটেশনে। তা কে শোনে কার কথা? তুই-ই বল, আমি তোর সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি তুই হচ্ছিস উলুবনের শেয়াল...' রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে শঙ্কিত হলো সোহেল, চট্‌ করে ছিপি আঁটল মুখে। ওর গতিবিধি লক্ষ করছে সতর্ক চোখে।

মুখ টিপে হাসল মাসুদ রানা। 'বোস্‌। হাত-মুখ ধুয়ে আসি,' অ্যাটাচড্‌ বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ও।

'ওই সঙ্গে শেষ গোসলটাও সেরে আসিস, দোস্ত,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল সোহেল। 'পাক সাফ হয়ে আসিস। পরে আর সুযোগ পাবি বলে মনে হয় না। বুড়ো আসছে,' তর্জনী দিয়ে জবাই করার ভঙ্গি করল

সে। 'আজই সেরে ফেলবে কাজটা।'

দরজা বন্ধ করতে গিয়েও থমকে গেল মাসুদ রানা। উবে গেছে হাসি। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে জিজ্ঞেস করল, 'বুড়ো আসছে মানে?'

সোহেলের হাসিখুশি চেহারা বিগড়ে গেল। 'অ্যাহ্! মহা যন্ত্রণায় পড়া গেল তো শালাকে নিয়ে, সোজা কথার মানে বোঝে না!'

খেপে গেল রানা। কিন্তু তলপেটের চাপ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অসহায় ও। 'রাখ, শালা! এসে দেখাচ্ছি মজা।' দড়াম করে দরজা লেগে গেল।

এরপর দুই বন্ধু মুখোমুখি হলে সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই হলো। মিনিট দুয়েক ঘরময় ছোটাছুটি, কিল, চড়, চিমটি, এ বলে 'তুই ছাড়!' ও বলে, 'আগে তুই ধরেছিস, তুই ছাড়!' চলল। তারপর জয়-পরাজয় অমীমাংসিত রেখেই মুখোমুখি বসে পড়ল দু'জন। আপাতত সন্ধি।

কফিতে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'তুই তাহলে ঢাকা থেকে নয়?'

'উঁহুঁ! বার্লিন থেকে।'

'বার্লিন! কেন?'

দাঁত খিঁচাল সোহেল। 'তোকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'ফের যদি কথা বাড়াস, এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে দেব তোর, শালা। যা জিজ্ঞেস করি, সরাসরি তার উত্তর দিবি।' ডান হাত মুঠো করে ওর নাকের সামনে ধরল রানা।

তৎক্ষণাৎ মাথা দোলাল সোহেল ভাল মানুষের মত। 'জ্বে, আজ্ঞে।' চোখ ট্যারা করে চেয়ে আছে হাতটার দিকে।

হেসে ফেলল রানা। 'ফাজলামো রাখ, দোস্ত। টেনশনে আমার অবস্থা টাইট। খুলে বল সব।'

কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল সোহেল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে

গিয়েও হাত টেনে নিল। ভেতর থেকে একটা বের করে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। 'আমি আসলে অন্য কাজে বার্লিনে গিয়েছিলাম। কাজ সেরে ঢাকায় রিপোর্ট করতে বুড়ো বলল এখানে চলে আসতে। বলল, আমি আসছি লণ্ডন। তুমি অপেক্ষা করো ওখানে, এক সঙ্গে ঢাকা ফিরব।'

'ব্যাস? কেন লণ্ডন আসছে, তা বলেনি?'

'না। তবে খানিকটা আভাস দিয়েছে। ওঁর আসার পিছনে কেজিবির হাত আছে।'

'কেজিবি?'

'আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেট প্রধান জেনারেল ভাদিম বরিসভ।'

'জেনারেল বরিসভ?' কপাল কুঁচকে উঠল রানার আপনাআপনি।

'হ্যাঁ। ওরা নাকি ঢাকায় তোর খোঁজ জানতে চেয়েছিল। ব্যাপার কি, রানা? ওদের লেজ মাড়িয়ে দিয়েছিস নাকি?'

মুহূর্তের জন্যে ডি অ্যাঙ্গাসের কথা ভাবল মাসুদ রানা। পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। না, ওটা হতে পারে না। নিশ্চয়ই আর কিছু আছে ভেতরে। কিন্তু এমন কি ব্যাপার থাকতে পারে যে কারণে জেনারেল বরিসভ ওকে খুঁজবেন, ভেবে পেল না।

'কিরে, কিছু বলছিস না যে?'

'কই, তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।'

'পড়বে পড়বে,' আপনমনে মাথা দোলাল সোহেল। 'ধোলাই খেলে সব মনে পড়ে যাবে।'

'চুপ থাক, শালা! কখন আসছে বুড়ো? ক'টায় ফ্লাইট?'

'সাতটায় হিথ্রোয় ল্যাণ্ডিঙ।'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'সোয়া পাঁচ। চল, ওঠ।'

'কোথায়!'

'এয়ারপোর্ট যেতে হবে না বস্‌কে রিসিভ করতে?'

'না। নিষেধ আছে।'

'কেন?'

'গোপনে আসছেন রাহাত খান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করা আছে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ডাউনিং স্ট্রীটে যাবেন তিনি। মীটিং সেরে নিজেই চলে আসবেন এখানে।'

'বলিস কি রে!' ভীষণ বিস্মিত হলো রানা। 'শুনে মনে হচ্ছে যেন...। এত কিছু ঘটছে লংফেলো জানেন না?'

'জানেন, তবে তোর চেয়ে কম।'

'মানে?'

'আমার আসার খবর জানা নেই তাঁর। জানেন কেবল রাহাত খানের খবর। তা-ও কেবল আসছেন, এটুকুই। কেন, জানেন না। তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বুড়োর মীটিঙের সময় সব জানতে পারবেন। তাঁকে ওখানে থাকতে বলা হয়েছে।'

'কিন্তু তুই এত খবর জানলি কি করে? তোকে নাকি কেবল আভাস দিয়েছে বুড়ো? এ যদি আভাস হয় তো ডিটেল বলে কাকে?'

মারফতি হাসি দিল সোহেল। 'এই কথা? তা আভাস থেকে যদি এসব সামান্য ব্যাপার বুঝে না-ই নিতে পারলাম, তাহলে কি আর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হওয়া চলে এত বড় এক ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্কের, তুই-ই বল?'

আচমকা গাঁট্টা চালাল রানা সোহেলের চাঁদি সই করে। ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল সোহেল গলা ফাটিয়ে। যন্ত্রণার চোটে লাফাচ্ছে তড়াক তড়াক। 'শালা, গণ্ডার! উহুরে, খুলি বোধহয় ফুটোই হয়ে গেছে রে!'

অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাসুদ রানার চেহারা। 'এই কথা? তা মেরে যদি এক আধটু ব্যথা না-ই দিতে পারলাম, তাহলে কি আর স্পাই হওয়া চলে, তুই-ই বল?'

ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। এক আধটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। এমন সময় ইয়র্কশায়ারের মেনউইথ লিস্নিঙ স্টেশনে ধরা পড়ল আরেকটা স্কোয়ার্ট ট্র্যান্সমিট করার ঘটনা। ওয়েলসের ব্রডি এবং চিকস্যাণ্ডস স্টেশনও ট্রেস করল ওটা। ট্র্যান্সমিশনের বিয়ারিঙ ও ক্রসবিয়ারিঙ গ্রহণ করল তারা একই সঙ্গে। শেফিল্ডের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে পাঠানো হয়েছে বার্তাটা।

দ্রুত জায়গামত পৌঁছে গেল শেফিল্ড পুলিস। বারনস্লি-পন্টিফ্র্যাক্ট সড়ক ওটা। কেউ নেই কোথাও। শূন্য সড়কটা যেন উপহাস করল দলটিকে।

'সেই একই ট্র্যান্সমিটার, স্যার,' গভীর রাতে রিপোর্ট করল চেনটেলহ্যামের হতাশ চীফ অ্যানালিস্ট। এবারও বার্তার মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে সে। 'আগের মতই তিন সেকেণ্ড স্থায়ী। কোন সন্দেহ নেই স্পাই বন্ধুটি কার-বোর্ন। ট্র্যান্সমিট সেরেই গাড়ি চালিয়ে সটকে পড়ে।'

'ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার,' বললেন কর্মকর্তা। 'লেগে থাকো। ভেবে পাই না ব্যাটা কাকে কি সংবাদ পাঠাচ্ছে!' শেষেরটুকু অন্যমনস্কের মত যেন নিজেকেই শোনালেন তিনি।

মস্কোয় ততক্ষণে বার্তাটা ডিকোড হয়ে পৌঁছে গেছে জেনারেল সেক্রেটারির সামনে। ওটা এরকম ঃ কুরিয়ার টু নেভার শোড। ইনফর্ম সূনেস্ট রি-অ্যারাইভেল সাবস্টিটিউট।

চার

টেবিলের ওপাশে বসেছেন বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। তাঁর ডানদিকে বিএসএস চীফ লংফেলো। এপাশে মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটা। মিনিট পাঁচেক হলো দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে ফিরেছেন দুই বৃদ্ধ।

লংফেলোর মুখে রক্ত নেই এক বিন্দু। চেহারা মরার মত ফ্যাকাসে। মাত্র গতকাল সকালেই ভদ্রলোকের সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ হয়েছে রানার। এই কয় ঘন্টার ব্যবধানে কোন মানুষের চেহারা যে এমন অস্বাভাবিকভাবে বদলে যেতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। দু'গাল চুপসে ঢুকে গেছে ভেতরে। ত্বকের স্বাভাবিক লাবণ্য গায়েব হয়ে গেছে, খসখসে হয়ে উঠেছে চেহারা। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। অন্তঃসারশূন্য। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ফাঁসীর হুকুম হয়েছে বুঝি লংফেলোর। ধরেবেঁধে ঝোলাতে নিয়ে যাওয়া হবে এখনই।

রাহাত খানের অবস্থাও কম-বেশি একই রকম। কাঁচাপাকা ভুরুর নিচে চোখ দুটো লালচে। নিচে কালির প্রলেপ। কপালের দু'পাশের রগ ফুলে উঠেছে, লাফাচ্ছে তড়াক তড়াক। রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ। খেয়াল নেই কোনওদিকে, অন্যমনস্ক। গভীর দুশ্চিন্তার চিরাচরিত সেই লক্ষণটিও বিদ্যমান—হাতে লাইটার

থাকতেও আগুন না ধরিয়েই পাইপ টেনে চলেছেন।

মুখে তালা মেরে বসে আছেন দুই বৃদ্ধ। কথা নেই কারও মুখে। কি ঘটেছে, কেন আচমকা রাহাত খানের লণ্ডন ছুটে আসার প্রয়োজন হলো, কেন সোভিয়েত জেনারেল ঢাকায় খোঁজ করেছেন ওকে, এমনকি অনুমান করতেও ব্যর্থ হয়েছে মাসুদ রানা। সোহেলকে বার বার জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পায়নি। আসলে ঢাকার বাইরে ছিল বলে ও-ও রানার মতই অন্ধকারে আছে। জানে না ভেতরের খবর। নিশ্চয়ই অভাবনীয় একটা কিছু ঘটতে চলেছে, ভাবল রানা। নাকি ঘটেই গেছে?

'রানা, কেজিবির এফসিডি চীফ তোমার খোঁজ করেছিলেন ঢাকায়। শুনেছ নিশ্চই?' হঠাৎই মুখ খুললেন রাহাত খান।

'জ্বি, স্যার।' আনুষ্ঠানিক পরিচয় নেই রানার ভদ্রলোকের সঙ্গে, তবে দু'জন দু'জনের খুব ভালই চেনা। অতীতে বহুবার কর্মক্ষেত্রে তাঁর মুখোমুখি হতে হয়েছে মাসুদ রানাকে। ব্যক্তি বরিসভের নয়, তাঁর পরিকল্পিত কেজিবির কয়েকটি মিশনের। তিনি যেমন জানেন মাসুদ রানা কী চীজ, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্যে রানাও রীতিমত শ্রদ্ধা করে জেনারেলকে। 'কিন্তু কেন, স্যার? আমাকে তাঁর কি প্রয়োজন!'

'বলছি,' তর্জনী দিয়ে ডান চোখের পাতা চুলকালেন বৃদ্ধ। 'তবে তার আগে খানিকটা ভূমিকা প্রয়োজন। পুরোটা অল্প কথায় বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তবু, যতটা সংক্ষেপে পারা যায়, বলছি। '৬৮ সালের পয়লা জুলাই, তখনকার বিশ্বের প্রথম তিন পারমাণবিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফিকেশন ট্রিটি নামে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার, তার প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কিত ওটাই ছিল সর্বপ্রথম অফিশিয়াল চুক্তি। পৃথিবীর সবাই জানে এ চুক্তির কথা।

'পরে চার দফার আরও একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দেশ তিনটি, যার কথা ওরা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটি অত্যন্ত গোপনে করা হয়। ওরা বুঝতে পেরেছিল যে যে হারে এগোচ্ছে নিত্য নতুন নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাতে ভবিষ্যতে চরম অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে নিজেদেরই। নিজেরাই সৃষ্টি করে বসতে পারে হাজারো সমস্যা। যে কারণে বাধ্য হয়েই ওই চার দফা প্রটোকলে স্বাক্ষর করতে হয় ওদের। ওর প্রথম তিনটি প্রটোকল ছিল কে কি ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র বানাবে বা বানাতে পারবে এইসব সম্পর্কিত।

'কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, শেষ প্রটোকলটি বাদে অন্যগুলো মেনে চলার ব্যাপারে কোন পক্ষেরই বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। বরং প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল তারা কে কত বেশি বেশি ভাঙতে পারে ওগুলো। যে সব অস্ত্র ওই চুক্তিতে তৈরি নিষেধ ছিল, সেগুলো তো বটেই, তা ছাড়াও আরও মারাত্মক সব অস্ত্র বানিয়ে মজুদের পাহাড় গড়ে ফেলল দেশ তিনটি। তাতে লাভই বলি, আর লোকসানই বলি, কাজ হয়েছে এই, কেউ একটা ভয়ানক কিছু তৈরি করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'পক্ষ তার অ্যান্টিডোট আবিষ্কার করে তার হুমকি মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এতে শেষ পর্যন্ত কেউ কারও জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

'তবে সর্বশেষ, অর্থাৎ প্রটোকলটির ব্যাপারে সবাই খুব সচেতন ছিল। ওটা অমান্য করার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। ওটার আতঙ্ক তখনও যেমন ছিল, আজও তেমনি···কি বলব, একটা জান্তব দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করছে সবার ভেতর। কারণ কেউ যদি চতুর্থ প্রটোকল ভঙ্গ করে, তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যাবে পৃথিবী ধ্বংসের প্রক্রিয়া।' হঠাৎ করেই যেন পাইপের কথা মনে পড়ল বৃদ্ধের। চোখ কুঁচকে তাকালেন ওটার দিকে। তারপর তামাকে

আগুন ধরিয়ে টানতে লাগলেন আনমনে।

'ওই প্রটোকলের অঙ্গীকার কি ছিল, স্যার?' প্রশ্নটা করল সোহেল।

ঘুরে বিএসএস চীফের দিকে তাকালেন রাহাত খান। এর অর্থ বুঝতে দেরি হলো না স্যার লংফেলোর। 'আমি বলছি,' বললেন তিনি। 'পঁয়তাল্লিশ সালে হিরোশিমা-নাগাসাকির ওপর প্রথম আণবিক বোমা বর্ষণের পর থেকেই এই তিন দেশের নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টরা বোমাগুলোর আকার কত ছোট করা সম্ভব তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। সে সময় ওগুলোর আকার হত অনেক বড়, বিশাল। স্থানান্তর, পরিবহন ইত্যাদিতে সমস্যা হত খুব। সে গবেষণার ফল ফলেছে আশির দশকে। একটা আস্ত পারমাণবিক বোমা এখন ব্রিফকেসে ভরে অনায়াসে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শুধু তাই-ই নয়, নয়-দশটা প্রিফ্যাব্রিকেটেড অংশ যেখানে-সেখানে বসে বাচ্চাদের খেলনা কনস্ট্রাকশন কিটের মত জুড়ে বানানোও যাবে এ বোমা ইচ্ছে করলে। অদূর ভবিষ্যতে এমনটি যে ঘটবে, ষাটের দশকের শেষ দিকে বিজ্ঞানীরা তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। যে কারণে শেষ প্রটোকলের সৃষ্টি। এর মূল বক্তব্য ছিল এই তিন দেশের কেউ কোন অবস্থাতেই সহজে বহনযোগ্য খুদে পারমাণবিক বোমা বা তার বিযুক্তকৃত প্রিফ্যাব্রিকেটেড অংশসমূহ অপর দু'পক্ষের কারও ভৌগলিক সীমানার অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে পারবে না। বিজ্ঞানীদের অভিমত ছিল, এই চুক্তি কঠোরভাবে মেনে চলা না হলে পরস্পরের ভেতর স্যাবোটাজ আর কাউন্টার স্যাবোটাজে দেশ তিনটির ভবিষ্যৎ রকেট-মিজাইল মজুদ, ইলেক্ট্রোনিক কাউন্টারমেজারস্, আর্মস এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তার মানে...বলতে চাইছেন...।' থেমে গেল মাসুদ রানা। ঢোঁক গিলল। অজান্তেই পিঠের পেশী শক্ত হয়ে গেছে। সোহেলেরও একই

অবস্থা। দুই বন্ধুর হতভম্ব দৃষ্টি ঘন ঘন নেচে বেড়াচ্ছে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দুই বৃদ্ধের মুখের ওপর।

'ঠিকই ধরেছ তুমি, রানা,' বললেন রাহাত খান।

'রাশিয়া?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন তিনি। 'মাঠে নেমে পড়েছে ওরা এরই মধ্যে। টপ্ ক্লাস এক কেজিবি এজেন্ট ঢুকে পড়েছে ব্রিটেনে। কিন্তু জেনারেল বরিসভ ব্যাপারটা ঘটতে দিতে চান না; তিনি চান তাঁর এজেন্টটিকে বোমা অ্যাসেম্বলিঙের ব্যাপারে বাধা দেয়া হোক। তাই এ কাজে তোমার সাহায্য আশা করে ঢাকায় যোগাযোগ করেন জেনারেল। তোমার লণ্ডন অবস্থানের কথা জানেন তিনি। কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ করতে সাহস পাননি। প্রচুর ঝুঁকি ছিল ওতে।'

'কিন্তু, স্যার...'

'জানি কি বলতে চাইছ। উত্তরটা হলো: এর সঙ্গে কেজিবির অফিশিয়ালি কোন সংশ্রব নেই। সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অ্যাসাইনমেন্ট এটা। প্ল্যান অরোরা। অরোরার মূল পরিকল্পনা জিআরইউ চীফ মেজর জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কোর। ব্রিটেনের আগামী সাধারণ নির্বাচনের ঠিক ছয় দিন আগে কোন এক ইঙ্গ-মার্কিন বিমানঘাঁটিতে দেড় কিলো টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাতে চলেছে রুশ এজেন্টটি। কিন্তু মুশকিল হলো লোকটি কে, কোথায় আছে, কোন্ বিমানঘাঁটিতে বোমা হামলা চালাতে যাচ্ছে, কিছুই জানা যায়নি। ইচ্ছে করেই জানাননি বরিসভ।'

'যাহ্!' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল সোহেলের।

চোখ মুদলেন রাহাত খান। মনে হলো উপায় নেই দেখে মনে মনে চূড়ান্ত হার স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ঝাড়া দু'মিনিট পর মুখ

খুললেন তিনি। 'রুশরা কেন এ পরিকল্পনা নিয়েছে, সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু এদিকে নির্বাচনের আর মাত্র একুশ দিন বাকি। যদি তার ছয়দিন আগে ফাটানো হয় বোমা, তাহলে হাতে থাকে মাত্র চোদ্দ দিন।'

'কিন্তু জানালেনই যখন, পুরোটা কেন জানালেন না ভদ্রলোক, স্যার?' ঝড়ের বেগে এলোমেলো সব ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে রানার মাথায়।

'কারণ আছে। এ কাজে যাকে ব্রিটেনে পাঠিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট, সে হাইলি ট্রেইনড্ এক কেজিবি স্পাই। ইললিগ্যালস্। লোকটি টপ ক্লাসদের মধ্যেও টপ ক্লাস। কেজিবির অমূল্য এক সম্পদ। তাই তাকে হারাবার ঝুঁকি নিতে চান না জেনারেল। সব জানিয়ে দিলে ধরা পড়ে যাবে লোকটা, সেই জন্যে। তাঁর সমস্যাটা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তুমি, রানা। জেনারেল চান না এমন দুনিয়া কাঁপানো কিছু ঘটুক, মৃত্যু হোক অসংখ্য নিরীহ নিরপরাধ বেসামরিক মানুষের। লক্ষ ওদের কোন বিমানঘাঁটি হলেও নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলও বিরান হয়ে যাবে বিস্ফোরণে। এর কোনটিই কাম্য নয় বরিসভের।'

মোনাজাত করার মত দু'হাতে অনবরত মুখ ডলছেন রিচার্ড লংফেলো। নিজের মাঝে ডুবে গেছেন বৃদ্ধ। কোন দিকে, কারও দিকে খেয়াল নেই। মানুষটির বুকের ভেতর কি তুফান চলছে, ভেবে খুব খারাপ লাগল রানার।

'এই বোমা হামলার পরিকল্পনা মস্কোর বাইরে উসভোয় করা হয়েছে। অত্যন্ত গোপনে। এতই গোপনে যে কেজিবিকেও জানানো হয়নি কিছু। জানেন কেবল এর মূল হোতা মার্চেঙ্কো, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আর তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত তিন বন্ধু। কোনও আভাস-ইঙ্গিত পেয়ে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ভেতরের খবর উদ্ধার করেছেন বরিসভ, পিছ পা হননি মারাত্মক ঝুঁকি আছে জেনেও। তিনি যেটুকু করেছেন, আমি মনে করি অনেক করেছেন।'

'ঠিক,' বলল মাসুদ রানা। 'স্বীকার করতেই হবে।' লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা আরও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল ওর। তাঁর এ তদন্তের খবর ফাঁস হয়ে গেলে পরিণতি কি হবে ভাবতেও শিউরে উঠল রানা। সব জেনে-বুঝেও এ পথে পা রেখেছেন জেনারেল, রীতিমত অবিশ্বাস্য। একইসঙ্গে নতুন এক শিক্ষাও হলো মাসুদ রানার। যে কেজিবিকে এতদিন পাষণ্ড, কসাই, হৃদয়হীন ভাবত ও, তার ভেতরে এমন এক-আধজন মানবদরদীও আছেন। কী আশ্চর্য!

'তবে লাঠির ক্ষতি না করে সাপ মারার পথটিও ভদ্রলোক দেখিয়ে দিয়েছেন। ঠিকমত এগোতে পারলে তাতে কাজ হবে।'

মেজর জেনারেলের মন্তব্যে নিকষ কালো আঁধারের মাঝে সামান্য এক চিলতে আলোর আভাস পেল রানা।

'প্রায় খালি হাতেই এদেশে ঢুকেছে স্পাইটি। সঙ্গে আছে কেবল একটা ওয়ান টাইম প্যাড।'

'আচ্ছা!'

'লংফেলোর ধারণা ওটার সাহায্যে এরইমধ্যে মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে অজ্ঞাত এক ফ্লীপার ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে।'

ঝট করে বিএসএস চীফের দিকে ফিরল রানা। 'তাই?'

করুণ হাসি ফুটল তাঁর মুখে। 'আমাদের চেলটেনহ্যাম জিসিএইচকিউর একটা রিপোর্ট পেয়েছি কাল দুপুরে। ওরা নাকি,' চট করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন বৃদ্ধ। 'এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি আগে একটা স্কোয়ার্ট মেসেজ ট্রেস করেছে।'

'কোথায়?' পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রানা।

'ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্টের একটা রাস্তা থেকে ট্র্যান্সমিট করা হয় ওটা। কাজ সেরে সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে সরে পড়েছে স্পাইটি। প্রথমে

খুব একটা গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু রাহাতের মুখে সব শুনে বুঝলাম এ সে না হয়েই যায় না।'

স্কোয়ার্টের বক্তব্য উদ্ধার অসম্ভব, জানে মাসুদ রানা। তাই ও নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। চিন্তিত মুখে ফিরল রাহাত খানের দিকে। 'যা বলছিলাম,' বললেন তিনি। 'বরিসভ জানিয়েছেন, বোমা তৈরির ছোট ছোট নয়টা উপাদান হাতে হাতে নয়দিক থেকে ঢুকবে ব্রিটেনে, এক এক করে পৌঁছবে তার হাতে। সবগুলো হাতে পেলে তবেই বোমা তৈরি সম্পূর্ণ করতে পারবে সে। নইলে নয়।'

'তার মানে যে কোন দিক থেকে, যে কোন পথে ঢুকতে পারে ওগুলো,' অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। 'সড়ক-আকাশ-সমুদ্র, নিশ্চই সব পথই ব্যবহার করবে ওরা?'

'নিশ্চয়ই!' জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে সায় জানালেন স্যার লংফেলো।

'এখন,' বললেন রাহাত খান, 'যদি এর দু'তিনটে চালান কোনমতে ঠেকিয়ে দেয়া যায়, তাহলেই ব্যর্থ হতে বাধ্য ওদের মিশন।'

'দু'তিনটে?' আবার চোখে আঁধার দেখতে আরম্ভ করল রানা।

'হ্যাঁ।' পাইপ ধরালেন বৃদ্ধ। ঘন ঘন টান দিয়ে পুরু ধোঁয়ার একটা পর্দা দিয়ে আড়াল করে ফেললেন নিজেকে। 'কারণ আমরা জানি না এক আধটা চালান খোয়া গেলে তার বিকল্প চালান পাঠাবার ব্যবস্থা ওরা রেখেছে কি না। আমার মনে হয় না রেখেছে। পুরো ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ, অথচ ওটারই বড় অভাব। এর মধ্যে নয়টা চালানই জায়গামত পৌঁছানো কঠিন। আর যদি রেখেও থাকে বিকল্প ব্যবস্থা, দু'তিনটের রিপ্লেসমেন্ট পাঠানোর সময় থাকবে না। সময়মত জিনিস না পৌঁছলে মস্কোকে জানাতে হবে, তারপর ওরা আবার তা পাঠাবে, সে তো আরও

লম্বা সময়ের ব্যাপার। তবু, পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে করেই হোক অন্তত দু'তিনটে চালান আটক করতেই হবে। তা যদি সম্ভব হয়, নির্ধারিত তারিখে যদি কাজটা করতে ব্যর্থ হয় ওরা। তাহলে বাধ্য হয়েই মস্কোকে মিশন পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এর পিছনে ওদের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, তা হাসিলের উপায় না থাকলে শুধু শুধু এত বড় একটা কাণ্ড ঘটাবার ঝুঁকি মস্কো নেবে না।

'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এর প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমাদের। তোমার ওপর ভদ্রমহিলার প্রচুর আস্থা।' কপাল চুলকালেন রাহাত খান। ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন পাইপে। 'ওদিকে জেনারেল বরিসভও তোমার ওপর নির্ভর করে আছেন। তুমি যদি... ।'

করণীয় ঠিক করে ফেলল মাসুদ রানা। 'দায়িত্বটা আমি নিচ্ছি স্যার।'

'ভাল করে ভেবে সিদ্ধান্ত নাও, রানা। সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকি আছে এ কাজে। তাছাড়া কাজটা তুমিই করে দেবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি আমি ওঁদের কাউকেই দেইনি। আমি এসেছি প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাটা বিস্তারিত জানাতে। কাজটা তুমি করবে কি না, তা সম্পূর্ণ তোমার নিজের ব্যাপার। ইচ্ছে হলে করতে পারো, ইচ্ছে না হলে ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগও রয়েছে।' কপাল চুলকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ।

'ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, স্যার,' দৃঢ় আস্থার সুর ফুটল রানার স্বরে। 'ঝুঁকির চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে চাই আমি।'

'বেশ।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাহাত খানের চেহারা, চেষ্টা করেও মনের ভাব চেপে রাখতে পারলেন না। স্যার মারভিন লংফেলোর মুখের মেঘও পলকে কেটে গেল। এমন ভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি, দেখে মনে হলো এতক্ষণ যেন দম বন্ধ ছিল বুকের ওপর মস্ত কোন চাপের কারণে। হঠাৎ করেই চাপমুক্ত হয়েছেন।

'তবে একটা কথা, স্যার।'

'জানি।' হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ওকে বৃদ্ধ। 'অপারেশন নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তোমার হাতেই থাকবে। ওসব আমি দেখব।'

মন দিয়ে সার্জেন্ট হিউই ও ব্রায়ানের মৌখিক স্টেটমেন্ট শুনলেন প্রবীণ চীফ সুপারিনটেণ্ডেন্ট অভ পুলিস। মাঝে মধ্যে একটা দুটো প্রশ্ন করলেন। সব শেষে নিশ্চিত হলেন যে এরা মিথ্যে বলেনি। সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু মুশকিল হলো, এ পেশায় দীর্ঘদিন জড়িত বলে সুপারের অভিজ্ঞতার ঝোলাটিও বেশ বড়। ভালই জানেন তিনি, সত্য বলেও কখনও কখনও এ ধরনের গেরো থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল হয়ে পড়ে।

এই ঘটনাটির কথাই ধরা যাক। রুশ নাবিকটি ছিল পুলিস কাস্টডিতে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সার্জেন্ট হিউইর বক্তব্য অনুযায়ী ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে লোকটি। এর কোন সাক্ষী নেই। ছাতে ছিল তখন একমাত্র হিউই। তাছাড়া এমন কোন কিছু ঘটেওনি যে নাবিকটির আত্মহত্যা করা জরুরি হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে কঠিন হবে প্রেসকে সামাল দেয়া। এমন একটা বাজার গরম করার সুযোগ ওরা ছাড়বে না কিছুতেই।

পুলিসি নৃশংসতা, ভাবলেন সুপার, এ ব্যাপারে স্থানীয় পত্রিকাগুলোর হেডিং নিশ্চয়ই এই হবে। কাজেই নিরীহ দুই সার্জেন্টকে রক্ষা করার জন্যে নাবিকটি টেম্পোরারি হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হয়ে এ কাজ করেছে বলে প্রমাণ করার ব্যবস্থা করতে হবে তাঁকে। এরপর সোভিয়েত কনসালের ধাক্কা তো রয়েইছে।

কোন জাহাজের নাবিক ছিল লোকটা, জানতে হবে, ভাবতে লাগলেন সুপার। তার ক্যাপ্টেনের জবানবন্দী নিতে হবে, তাকে দিয়ে দেহটা আইডেন্টিফাই করাতে হবে। আরও আছে, পুলিসে ফোন করেছিল কে, তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সের দুই স্টাফ,

ড্রাইভার আর মেল নার্স, ওদের জবানবন্দী নিতে হবে। ওয়ার্ড সিস্টার এবং পাকিস্তানি ডাক্তার ইকবালের জবানবন্দীও চাই। সব শেষে ফ্রন্ট-ডেস্ক পোর্টার।

ভোর চারটে থেকে টানা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শেষের পাঁচজনের বক্তব্য রেকর্ড করলেন পুলিস সুপার। চারজনের বক্তব্যে বোঝা গেল সত্যিই প্রচণ্ড মার খেয়ে জখম হয়েছে নাবিকটি, অমানুষের মত পিটিয়েছে ওকে নেড়রা। সবার শেষে, ফ্রন্ট-ডেস্ক পোর্টারের বক্তব্যে খানিকটা আশার আলো দেখা গেল। লোকটা জানাল, মৃত লোকটিকে দৌড়ে এসে লিফটে উঠতে দেখেছে সে। পরপরই সেখানে পৌছায় সার্জেন্ট হিউই। লিফটে উঠতে না পেরে সার্জেন্ট পিছনের স্টেয়ারওয়েলে গিয়ে ঢোকে। পরের ঘটনা তার জানা নেই।

আটটায় হাই তুলতে তুলতে অফিসে রওনা হলেন সুপার। রাতের ঘুম তো গেছেই, দিনেও হয়তো বিশ্রাম জুটবে না কপালে। অফিসে এসেই পোর্ট ট্রাফিক অফিসারকে ফোন করলেন তিনি। তার কাছে জানা গেল, আকাডেমিক কোমারভ নামে একটিই রুশ জাহাজ আছে জেটিতে। গতকালই এসেছে। ওটার ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি পাঠালেন সুপার। তারপর টেলিফোন করলেন গ্লাসগোর সোভিয়েত কনসালকে।

টেলিফোনের আওয়াজে গাল ভর্তি একরাশ শেভিং ফোম নিয়ে বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল বিএসএসের গ্লাসগো স্টেশন চীফ, হ্যারি ফরবস। এক হাতে রেজর। অন্য হাতে রিসিভার তুলল সে। 'হ্যালো!'

'মিস্টার ফরবস? আমি ক্রেইগ।'

কপাল কুঁচকে উঠল স্টেশন চীফের। ক্রেইগ প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনের একজন প্লেন ক্লথ ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর।

'ইয়েস, ক্রেইগ। হোয়াট ইজ ইট?' চুপ করে দু'মিনিট লোকটির কথা

শুনল স্টেশন চীফ। তারপর যেন নিজেকে শোনাচ্ছে এমন ভাবে বলল, 'রিয়েলি?'

'হ্যাঁ। এর মধ্যে আরও গভীর কিছু আছে।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

লাইন কেটে দিয়ে খানিক চিন্তা করল হ্যারি ফরবস। তারপর জোর পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। সাড়ে আটটা বাজে। তাড়াহুড়ো করে শেভ সেরে পোশাক পরল সে। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে। ছুটল সোজা পুলিস সুপারের অফিস। একই সময় সিটি মর্গে পৌঁছল আকাডেমিক কোমারভের ক্যাপ্টেন আর পলিটিক্যাল অফিসার। এক পলক আঁদ্রেই পাভলভের দেহের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল দু'জনেই।

'ঠিকই আছে,' বলল দ্বিতীয়জন। 'এ আমার শিপের ডেকহ্যাণ্ড। আমরা আমাদের কনসালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দুজনকেই বেশ বিচলিত দেখে মর্গের ডিউটি সার্জেন্ট ভাবল, একজন শিপমেট হারিয়ে বড্ড দুঃখ পেয়েছে নিশ্চয়ই। 'চলুন,' ওদের পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এল সে। 'আমাদের সুপারিনটেণ্ডেন্টের অফিসে যাওয়া যাক। ন'টায় ওখানে আসবেন আপনাদের কনসাল।'

ওরা পৌঁছার আগেই এসে পড়েছেন সোভিয়েত কনসাল। পুলিস সুপারের মুখোমুখি বসে আছেন তিনি। পাশেই আরেকজন বসা, বিএসএস স্টেশন চীফ।

'এ আমি বিশ্বাস করি না যে লোকটা আত্মহত্যা করেছে,' ক্যাপ্টেন আর পলিটিক্যাল অফিসার ভেতরে পা রাখতেই ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন কনসাল। 'অনতিবিলম্বে আমার এমব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই...'

বাহু ধরে কনসালকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল পলিটিক্যাল অফিসার। রুমের এক কোণে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কী সব যেন

বোঝাল তাঁকে। পলকে চেহারা বদলে গেল ক্রুদ্ধ কনসালের। তিন মিনিট পর সুপারের টেবিলে ফিরে এলেন তিনি।

একেবারে শান্ত হয়ে গেছেন। জানালেন, এমব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ তিনি অবশ্যই করবেন। তবে পরে হলেও চলবে, তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।

কনসাল আশা করেন, আঁদ্রেইকে যারা মারধর করেছে, পুলিস সেই নেডদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। মাননীয় সুপারের পক্ষে কি সম্ভব হবে, আঁদ্রেই পাভলভের মৃতদেহ এবং তার সঙ্গে যা যা ছিল সে সব আকাডেমিক কোমারভে তুলে দেয়া? জাহাজটি আগামীকালই লেনিনগ্রাদ রওনা হবে।

অত্যন্ত প্রশান্ত মেজাজে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে অনুরোধটা প্রত্যাখ্যান করলেন সুপার। যতক্ষণ না বখাটেগুলোকে পাকড়াও করা যায়, দেহটা সিটি মর্গেই থাকবে। আর তার জিনিসপত্র যত্ন করে রেখে দেয়া হবে প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনে। মৃদু হাসির ভঙ্গি করে সিদ্ধান্তটা মেনে নিলেন সোভিয়েত কনসাল। নিয়ম কানুন ভালই জানেন তিনি। এরপর বিদেয় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বেরিয়ে পড়লেন তিনি কনসুলেটের উদ্দেশে।

পিছন পিছন বেরিয়ে এল হ্যারি ফরবসও। মর্গের দিকে গাড়ি ছোটাল সে। পোস্টমর্টেম রুমের এক কোণে ড্রেনের ওপর বসানো বড় একটা স্ল্যাবে শোয়ানো আছে পাভলভের দেহটা। ব্যবচ্ছেদ শুরু করার জন্যে পুলিস প্যাথলজিস্ট প্রস্তুত।

'দেহটা আমি একটু দেখতে পারি?' লোকটিকে জিজ্ঞেস করল ফরবস।

তার আইডি কার্ডে চোখ বুলিয়ে মাথা দোলাল সে। 'শিওর।'

খুব কাছ থেকে দশ মিনিট ধরে দেহটা পর্যবেক্ষণ করল ফরবস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর বেরিয়ে এসে নিজের অফিসে রওনা হলো।

পাঁচ

জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে এসে বসল টেবিলে। ওর সামনেই চেলটেনহ্যাম জিসিএইচকিউর পাঠানো রিপোর্টের একটা কপি রয়েছে। অসংখ্যবার পড়েছে ওটা রানা, প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। আরও একবার পড়ল। তারপর বিরক্ত হয়ে ঝপ করে বন্ধ করল ফাইল কভারটা।

ওটা সরিয়ে আরেকটা পেটমোটা ফাইল টেনে আনল মাসুদ রানা। গত এক সপ্তাহে আকাশ-সড়ক-সমুদ্রপথে যত বহিরাগত ঢুকেছে এ দেশে, তাদের নাম এবং পাসপোর্ট নাম্বারের পূর্ণ তালিকা আছে এতে। মাত্র ছয় ঘণ্টায় দেশের প্রত্যেকটি এনট্রি পয়েন্ট থেকে কম্পিউটরের মাধ্যমে এগুলো পৌঁছেছে রানার টেবিলে। ওর মধ্যে রুশ ব্লকভুক্ত দেশগুলো থেকে যারা এসেছে, তাদের তালিকা আলাদা।

এরকম জটিল, সময়সাপেক্ষ একটা কাজ এত দ্রুত সম্পন্ন হওয়া এক কথায় অসম্ভব। কিন্তু রানা এজেন্সির বিশেষ নির্দেশে সেটাই সম্ভব করে তুলেছে এদের নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ প্রশাসনযন্ত্রের একটি অংশ। যদিও এর ভেতর থেকে অলৌকিক কোন ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করে না মাসুদ রানা। সব জটিলতারই সীমা আছে। কিন্তু এটা এমনই জটিল, যার কোন সীমা নেই।

তবুও ভরসা করে আছে মাসুদ রানা। ওর বিশ্বাস, সমস্যা যত জটিল আর কুটিলই হোক, ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে পারলে সমাধানের একটা না একটা পথ পাওয়া যাবেই। তাছাড়া সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন ওকে সহায়তা করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেছে পিছনে। ভরসা করার ওটাও একটা বড় কারণ। এই ব্যাপক অভিযানের নাম রাখা হয়েছে 'অপারেশন ব্লাইণ্ড হান্ট'। এর সর্বময় ক্ষমতা মাসুদ রানার হাতে। ওর মুখের নির্দেশই এখন আইন।

এরই মধ্যে কাজে নেমে পড়েছে কয়েক হাজার অপারেটর-ওয়াচার। রানা এজেন্সির প্রায় সবাই তো রয়েইছে, সঙ্গে বিএসএস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, এমআইফাইভ, এমআই সিক্স, আর্মড ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স এবং পুলিস সবাই রয়েছে এর মধ্যে। ব্রিটেনের প্রত্যেকটি বিমান বন্দর, নৌ-বন্দর, ফেরিঘাট এবং বর্ডার পোস্ট, মোট কথা প্রতিটি এনট্রি পয়েন্টে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে তারা।

ব্রিটেনে যারা ঢুকতে চাইবে, বিশেষ করে রুশ ব্লকের বা খোদ রুশ নাগরিক, ঢুকতে পারে স্বচ্ছন্দে। বাধা দেয়া হবে না। তবে তাদের পাসপোর্ট, ব্যাগেজ, গাড়ি ইত্যাদি চেক করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। কারও ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয়, সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে আশেপাশে উপস্থিত 'মেট'-কে, বা রানা এজেন্সি নয়ত বিএসএস স্টেশন চীফকে। তবে সন্দেহ হলেই গ্রেফতার করা যাবে না কাউকেই। আড়াল থেকে ছবি তুলতে হবে তার এবং মাসুদ রানার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বা তাদেরকে অনুসরণ করে যেতে হবে।

বিএসএস চীফের পাশের রুমটিকে করা হয়েছে 'অপারেশন ব্লাইণ্ড হান্টের' কন্ট্রোল রুম। তার পাশেরটা কমিউনিকেশনস রুম। ডজনখানেক লাল টেলিফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটর সব মিলিয়ে এলাহি কারবার। কিন্তু এত আয়োজন, এত কিছু তবু কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে মন। পারবে তো

ও? দুপুরে সোহেল ও মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান লণ্ডন ত্যাগ করেছেন। তখন থেকেই বিষণ্নতা পেয়ে বসেছে রানাকে। দুনিয়াতে নিজেকে একদম একা, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে ওর।

জোর করে কাজে মন দিল মাসুদ রানা। সম্ভ্রকের ইমিগ্রান্টদের ফাইল খুলে নজর বোলাতে লাগল। কিন্তু মিছেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল খানিকক্ষণ, দাঁত ফোটাতে পারল না। কোন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ কাজ করতে যাচ্ছে, পরে শুনেছে ও রাহাত খানের মুখে। বুঝতে দেরি হয়নি লেবার পার্টির ভেতরের কারা এ কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে মস্কোকে। ওদের সঙ্গে এদের গোপন আঁতাতের কথা আরও আগে থেকেই জানে রানা। কিছু কিছু ঝামেলার জন্যে দেরি হয়ে গিয়েছিল, নইলে এই আঁতাতে লেবার পার্টির কে কে জড়িত, তাদের নাম এবং অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ আরও আগেই বিএসএসের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল রানা। কিন্তু হলো না।

সময়ের সামান্য হেরফেরের কারণে রানাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ওরা এবার। যত তথ্য-প্রমাণই থাকুক, কিছু যায় আসে না এখন। ওদের বিরুদ্ধে এ মুহূর্তে কিছু করতে গেলে বিপদে পড়ে যাবে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভরা। দ্রুত জনসমর্থন হারাবে। যার প্রভাব পড়বে নির্বাচনে। কাজেই ওই পর্যন্ত আঙুল কামড়ানো ছাড়া উপায় নেই। এমনিতে ক্ষমতাসীনদের হেরে যাওয়ার কোন কারণ নেই। সর্বশেষ বিবিসি জনমত জরিপের ফলাফলে লেবারদের চাইতে প্রায় পনেরো শতাংশ এগিয়ে আছে ওরা।

মস্কোপন্থীদের জুজুর ভয়ে যদি ব্যবধান আরও খানিকটা কমেও যায়, খুব বেশি হলে পাঁচ ভাগ কমবে। অতএব দুশ্চিন্তার কিছু নেই, নিজেকে প্রবোধ দিল মাসুদ রানা। ভালয় ভালয় শেষ হোক নির্বাচন, তারপর দেখা

যাবে।

রাত ন'টায় উঠল ও। কমিউনিকেশনস্-এর সহকারীদের নির্দেশ দিল জরুরি কোন খবর এলে যেন সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয় ওকে। বেরিয়ে এসে গাড়ি ছোটাল রানা। মাথাটা পরিষ্কার রাখা চাই। তাই আজ আর কাজ নয়। লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে সকালে শুরু করা যাবে নতুন উদ্যমে।

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙানো হলো মাসুদ রানার। জানানো হলো চেলটেনহ্যাম জিসিএইচকিউ আরও একটি স্কোয়ার্ট মেসেজ ট্রেস করেছে খানিক আগে। তড়াক করে বিছানা ছাড়ল ও। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল কন্ট্রোল রুমের উদ্দেশে। সংস্থা প্রধানের ফ্যাক্স করে পাঠানো সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের ওপর কয়েকবার চোখ বোলাল ও। সেই একই ব্যাপার। তিন সেকেণ্ড স্থায়ী ক্ল্যানডেস্টাইন মেসেজ। ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে শেফিল্ডের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে।

প্রথমবার ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্ট, ভাবছে রানা, তারপর শেফিল্ডের উত্তরে...রুশ স্পাইটি কি নর্থ মিডল্যাণ্ডের কোথাও আস্তানা গেড়েছে? নাকি প্রমাণ করতে চাইছে সে ওখানেই আছে? আসলে ওর ধারেকাছেও নেই, আছে দূরে কোথাও? তাই হবে হয়তো। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে লোকটা কার বোর্ন। ভাবছে মাসুদ রানা। পাশের রুম থেকে একটু পর পরই টেলেক্স-ফ্যাক্স মেশিনের-মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। নতুন নতুন নামের তালিকা আসছে তো আসছেই।

পুব ইউরোপীয় দেশগুলোর ইমিগ্রান্টদের নামের পাশে স্টার মার্ক করা আছে। সহকারীরা ওগুলোর আলাদা তালিকা তৈরি করে ফাইলবন্দী করছে। বাঁধা নিয়মে এগোচ্ছে সব কাজ। শুধু একটা ফাঁক চাই, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। কেবল একটা সুযোগ। টেলিফোনের আওয়াজে চমকে উঠল অন্যমনস্ক রানা। দ্রুত রিসিভার তুলল। 'ইয়েস!'

'আপনার কল, স্যার। গ্লাসগো বিএসএস স্টেশন চীফ।'

'পুট মি থ্রু, প্লীজ। থ্যাঙ্ক ইউ। ...মাসুদ রানা। ইয়েস, গুড মর্নিং।' ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল ও দীর্ঘ সময় ধরে। টের পেল গরম রক্তের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে শিরায় উপ-শিরায়। বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার ফরবস,' বলল রানা। 'নেক্সট অ্যাভেইলেবল্ শাটলে গ্লাসগো আসছি আমি। নিজে চেক করতে চাই।'

'আমি থাকব এয়ারপোর্টে,' বলল ফরবস।

'দ্যাট'স ভেরি কাইণ্ড অভ ইউ।'

গ্লাসগো বিমানবন্দর শহর থেকে আট মাইল দূরে। আকাশ পথে লণ্ডনের সঙ্গে দেড় ঘণ্টার দূরত্ব। বিকেল সাড়ে তিনটেয় অবতরণ করল মাসুদ রানার বিমান। হ্যারি ফরবস রানার প্রায় সমবয়সী। সামান্য খাটো। থ্যাবড়া নাক। পরিচয় পর্ব সেরে এয়ারপোর্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। ফরবসের অপেক্ষমাণ গাড়ি নিয়ে রওনা হলো শহরের দিকে।

পাঁচ মিনিটেই ঘটনা বিস্তারিত শোনা হয়ে গেল মাসুদ রানার। 'আমার ধারণা সঠিক, এমন দাবি করছি না,' সবশেষে যোগ করল স্টেশন চীফ। 'তবে লাশটা দেখে মনে হয়েছে কস্মিনকালেও পাভলভ মার্চেন্ট নেভি ছিল না।'

'আপনি খবর পান কি ভাবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'পুলিস সুপারের নির্দেশে এক ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ফোন করে জানায় আমাকে।' লাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে গাড়ি দাঁড় করাল ফরবস। 'যে দুই পুলিস সার্জেন্ট উদ্ধার করেছিল পাভলভকে, তাদের রিপোর্টে লেখা দেখলাম লোকটা উপুড় অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল পথে। যেটা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। এ ধরনের গণপিটুনির শিকার

উপুড় হয়ে থাকতে পারে না, মারের চোটে দেহ তার আপনাআপনিই কুণ্ডলি পাকিয়ে যাবে। এবং জ্ঞান হারালে ওই অবস্থায়ই হারাবে।'

সবুজ আলো জ্বলে উঠল। গীয়ার দিল হ্যারি ফরবস। 'আরও আছে। কাঁধের গানি স্যাকটা দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে দেখেছে তাকে দুই সার্জেন্ট। এ-ও নিঃসন্দেহে আরেক অসম্ভব। আঘাত থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা না করে কেউ অমন কাজ করে?'

প্রশ্নটা মনে ধরল মাসুদ রানার। ক্রমাগত বুটের লাথির হাত থেকে মাথা না রক্ষা করে সামান্য···। 'তারপর ধরুন,' আবার শুরু করল ফরবস। 'ঘটনার সময় আর স্থানের বিষয়টাও ভেবে দেখেছি আমি। রাতে কোন সীম্যান ঘাটে বাঁধা জাহাজ ত্যাগ করে বারে যাওয়ার জন্যে। অথবা ব্রোথেলে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু এই লোক? রাত দুটোয় পোর্টের চার মাইল দূরের এক ডুয়াল ক্যারিজওয়েতে শিকার হলো নেডদের। কিন্তু কেন গেল সে ওখানে? বার নেই, রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় বার। ব্রোথেলও ওদিকে নয়। তাহলে কোথায় যাচ্ছিল পাভলভ?'

'ভাল একটা পয়েন্ট।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। স্টেশন চীফকেও অফার করল। 'কিন্তু লোকটা যে মার্চেন্ট নেভি ছিল না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কি করে?'

'লাশ দেখতে মর্গে গিয়েছিলাম আমি। পতনের ফলে হাড়গোড় চুরমার হয়ে দেহটা দেখার যোগ্য না থাকলেও ব্যাটার মুখ সামান্য দু'চারটে কাটাকুটির চিহ্ন ছাড়া প্রায় অক্ষতই ছিল। আমি এ শহরেই মানুষ, জীবনে কম ডেকহ্যাণ্ড দেখিনি। ওদের চেহারা হয় রোদে পোড়া, তামাটে। কিন্তু এ ছিল ধপধপে ফর্সা। এছাড়া হাতের উল্টোপিঠও তামাটে হয়। তালু হয় কর্কশ। কিন্তু এর হাতে তেমন কোন আলামত ছিল না। মনে হয়েছে আকাডেমিক কোমারভে পা রাখার আগ পর্যন্ত ফাইল ওঅর্ক করেই

কাটিয়েছে পাভলভ।

'আরও একটা সন্দেহের কারণ লোকটার সোনা বাঁধানো দুটো দাঁত। রুশ ফোরডেক ক্রুদের দাঁত সব সময় দেখে এসেছি স্টীল বাঁধানো হয়ে থাকে, রাশান স্টাইলে। ওদেশে সোনা দিয়ে···ব্যাপারটা নিশ্চয়ই প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। অন্তত একজন ডেকহ্যাণ্ডের পক্ষে।'

আনমনে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। মনে মনে লোকটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না। কিছুই দৃষ্টি এড়ায়নি। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল হ্যারি ফরবস। 'আর একটা পয়েন্ট।' সুপারের সামনে সোভিয়েত কনসালের আকস্মিক রেগে ওঠা, পরমুহূর্তে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও পলিটিক্যাল অফিসারের আগমন, অতঃপর কানে কানে আলোচনা এবং সবশেষে কনসালের সুমতির উদয় ইত্যাদি খুলে জানাল সে। 'আমার ধারণা বিষয়টি যাতে বেশি গড়াতে না পারে, সে জন্যে পলিটিক্যাল অফিসারের পরামর্শেই ভিজে বেড়াল বনে গিয়েছিল কনসাল। নইলে লোকটা যে ভাবে খেপে উঠেছিল, অত সহজে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা নয় ব্যাপারটা।'

সোজা প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনে এল ওরা। অপারেশন ব্লাইণ্ড হান্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার মাসুদ রানার আসার খবর স্টেশন চীফকে আগেই দিয়ে রেখেছিল হ্যারি ফরবস। স্টেশন চীফ নিজে স্বাগত জানাল ওদের কারপার্কে। সময় নষ্ট না করে পথ দেখিয়ে ভবনের পিছনদিকের ফাইলিং কেবিনেটে ঠাসা খুদে একটা রূমে নিয়ে এল সে ওদের দুজনকে।

'সার্জেন্ট হিউই আর ব্রায়ানের রিপোর্ট পাবেন টেবিলের ড্রয়ারে,' ঘরের একমাত্র টেবিলটি দেখিয়ে বলল চীফ। 'পাভলভের জিনিসপত্রও ওখানেই আছে। আমি আমার অফিসে আছি। কোন প্রয়োজন হলে খবর দিতে দ্বিধা করবেন না, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ।'

একজন সার্জেন্টকে রানার প্রয়োজনের ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে বিদেয় নিল লোকটি। প্রথমেই হিউই ও ব্রায়ানের বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ায় মন দিল মাসুদ রানা। ওর জানা হলো না যে ছুটে পালাবার আগে ডেকহ্যাণ্ড পাভলভ হিউইর সামনে থেকে তার টোব্যাকো টিনটা তুলে নিয়েছিল, পালাতে চেয়েছিল ওটা নিয়েই। জানা হয়নি কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেছে সে। কয়েকবার করে পড়ল রানা রিপোর্ট দুটো।

তারপর ভাবতে বসল। ধরা যাক, পাভলভ এদেশে বেআইনীভাবে প্রবেশ করেছে। করে থাকতে পারে। অসম্ভব নয়। তবে ফরবসের কাছে শুনেছে রানা, জাহাজের ক্রু লিস্টে তার নাম ছিল। এর একটাই অর্থ হতে পারে, এ লোক নকল পাভলভ। আসল ডেকহ্যাণ্ড পাভলভের পরিবর্তে নকল পে-বুক তৈরি করে পাঠানো হয়েছে একে লেনিনগ্রাদ থেকে।

ঠিক আছে, না হয় তাই। কিন্তু কেন এসেছিল সে? অত রাতে জাহাজ ত্যাগ করার কি কারণ তার? গ্রেট ওয়েস্টার্ন রোডে কেন গিয়েছিল? কারও হাতে গোপন কিছু তুলে দেয়ার জন্যে? কাজটা কি সম্পন্ন করতে পেরেছে পাভলভ? যদি পেরে থাকে, তাহলে গানি স্যাকটা রক্ষার জন্যে পড়ে পড়ে মার খেল কেন সে?

রিপোর্ট দুটোর সঙ্গে পিন আপ করা পাভলভের সঙ্গে প্রাপ্ত আলামতের তালিকাটার ওপর চোখ বোলাল রানা আবার। ওটা লেখা এভাবেঃ হাতঘড়ি ১টি, অ্যানোরাক ১টি, রোলনেক পুলওভার ১টি, ক্যানভাস গানি স্যাক ১টি, পুরু নিট জার্সি ১টি, টোব্যাকো টিন ১টি, ট্রাউজার ১টি, অন্তর্বাস ১টি, পুরু উলের মোজা একজোড়া এবং চামড়ার জুতো একজোড়া।

নিচের ড্রয়ার খুলল ও। বড় একটা পলিথিন ব্যাগে রাখা আছে

আলামতগুলো। জুতোজোড়া দিয়ে শুরু করল রানা। হিলের ভেতর কোন গোপন কুঠুরি আছে কি না, সোল বিযুক্ত করে ভেতরে কিছু রাখার ব্যবস্থা আছে কি না বা ভেতরে, একদম মাথার দিকে কোন গহ্বর আছে কি না আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখল রানা। কিন্তু না, নেই তেমন কিছু। ও দুটো ছেড়ে হাতঘড়ি নিয়ে পড়ল ও।

কাঁচের কোন খবর নেই। সেকেণ্ডের কাঁটাটিও উধাও। ভালমত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো রানা হাতঘড়িটা স্রেফ হাতঘড়িই। অন্য কিছু নয়। এরপর ট্রাউজার। কোমর বা ফ্লাইয়ের কোথাও কোন নতুন সেলাই পড়েছে কি না, চাপ দিলে শক্ত কিছু বাধে কি না ওসব জায়গায়, কোথাও কোন পট্টি আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। নেই।

এরপর অ্যানোরাক, রোলনেক পুলওভার, নিট জার্সি এবং মোজা। কোনটির সঙ্গেই সন্দেহজনক কিছু নেই। এবার গানি স্যাক। ওটা স্পর্শ করামাত্রই কেন যেন মনে হলো মাসুদ রানার যে রহস্যময় নাবিকটি যদি সঙ্গে করে সত্যিই কিছু এনে থাকে, তা এর মধ্যেই রয়েছে। টোব্যাকো টিন রেখে ব্যাগটাই ধরল ও প্রথম। অনেকক্ষণ পর নিশ্চিত হলো ও যে আসলেই ওটা একটা ব্যাগ। তলাটা দুই পাল্লা ক্যানভাসের, বাকি চারদিক এক পাল্লার। এবং ওর আইলেট দুটো মিনিয়েচার কোন ট্র্যান্সমিটার নয় বা ড্রস্ট্রিং কোন গুপ্ত অ্যারিয়েলও নয়।

সবশেষে টোব্যাকো টিন। রাশিয়ায় তৈরি সাধারণ স্ক্রু-টপ টিন। মুখ খুলতে ভেতরে তামাকের মৃদু গন্ধও পাওয়া গেল। টিন উপুড় করে ভেতরের জিনিসগুলো টেবিলের ওপর ঢালল মাসুদ রানা। আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে এল হ্যারি ফরবস। 'কি ওগুলো?'

চোখ কুঁচকে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল রানা। শুনতে পায়নি প্রশ্নটা। তিনটে ধাতব চাকতি। দুটো অ্যালুমিনিয়ামের মত চকচকে, হালকা।

অন্যটার রঙ সীসার মত, ওজনেও বেশ ভারি। চাকতি তিনটে পাশাপাশি সাজিয়ে চেয়ে থাকল রানা। ফরবস এবং সার্জেন্টও চেয়ে আছে। হালকা চাকতি দুটোর ব্যাস তিন ইঞ্চি, অন্যটির দুই ইঞ্চি। কেমন শির শির করে উঠল রানার গায়ের ভেতর। কি ওগুলো!

রাত ন'টায় লণ্ডন ফিরে এল মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টের শর্ট-টার্ম পার্ক থেকে নিজের গাড়িটা সংগ্রহ করে এম-ফোর মোটরওয়ের দিকে চলল। মোটরওয়েতে উঠে গতি বাড়াল ও, দ্রুতবেগে ছুটল দক্ষিণে। দশ মিনিট চলার পর এক তেমাথায় পৌঁছল। বাঁ দিকেরটা গেছে লণ্ডন, ডানদিকেরটা বার্কশায়ার।

ডানে বাঁক নিল মাসুদ রানা। টানা আধঘণ্টা ছোটার পর পৌঁছল গন্তব্যে। আলডারমাস্টন জায়গাটার নাম। ব্রিটেনের ইনস্টিটিউট অভ অ্যাটমিক ওয়েপনস্ রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট-এর বিশাল কমপ্লেক্স রয়েছে এখানেই। নাম শুনে বোঝা না গেলেও এটি আসলে মাল্টি ডিসিপ্লিন ইউনিট। নিউক্লিয়ার ডিভাইস ডিজাইন এবং তৈরি করা ছাড়াও কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, এঞ্জিনীয়ারিং, অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিকস্, রেডিও বায়োলজি, ইলেক্ট্রোনিকস্ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের ওপরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় এখানে। একই সঙ্গে মেটালারজি ডিপার্টমেন্টও রয়েছে এর।

শেষের এই ডিপার্টমেন্টের এক বিজ্ঞানীকে চেনে মাসুদ রানা। অনেক দিন আগে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা বোমা তৈরির কাজে কোন কোন ধাতব বেশি ব্যবহার করে, লণ্ডনে একদল ইন্টেলিজেন্স অফিসারের উদ্দেশে তা নিয়ে বিশেষ এক কোর্সে ভাষণ দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। রানাও ছিল ওই অফিসারদের মধ্যে।

'ওয়েল ওয়েল,' রানার পরিচয় এবং তাঁর সঙ্গে ওর পরিচয়ের সূত্র শুনে মৃদু হাসলেন বিজ্ঞানী, প্রফেসর ডেভিড ওয়েন। ওয়েলশ অ্যাকসেন্টে

বললেন, 'দারুণ স্মরণশক্তি আপনার। নাম-ধাম সব মনে রেখেছেন আমার! অল রাইট, মিস্টার মাসুদ রানা। বলুন কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে।'

পকেট থেকে ধাতব চাকতি তিনটে বের করল মাসুদ রানা। টিনটা আনেনি ও, রুমালে মুড়ে নিয়ে এসেছে এগুলো। 'এই জিনিসগুলো ঠিক চিনতে পারছিনে, প্রফেসর। এগুলো কি, কি কাজে লাগে যদি দয়া করে জানান, খুব উপকৃত হব।'

চাকতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন প্রফেসর ওয়েন। 'কি এগুলো!' আপনমনে বললেন। 'কোন দুরভিসন্ধিমূলক কাজে ব্যবহার হতে পারে বলে ভাবছেন?' মুখ তুললেন তিনি।

'হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, পারে। পরীক্ষা না করে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।'

'কত সময় লাগতে পারে, প্রফেসর?'

'ঘণ্টাখানেক লাগবে। সকালে ল্যাব টেস্ট সেরে আপনাকে জানাতে পারব। যদি এগুলো রেখে যেতে আপত্তি না থাকে আপনার।'

পকেট থেকে কার্ড বের করে প্রফেসরের দিকে বাড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা। 'কোন আপত্তি নেই। তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রফেসর। আমার সন্দেহ এর সঙ্গে ব্রিটেনের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। টেস্ট সেরে এর যে কোন একটি নাম্বারে ফোন করলেই পাবেন আমাকে। এবং দয়া করে গোপন রাখবেন বিষয়টা।'

কার্ডে চোখ বুলিয়ে মাথা দোলালেন ধাতু বিশারদ। 'অফকোর্স।'

পরদিন সকাল দশটায় ফোন করলেন প্রফেসর ডেভিড ওয়েন। 'মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ইয়েস, প্রফেসর।'

'আপনার জিনিসগুলো পরীক্ষার কাজ শেষ করলাম এইমাত্র।'

'কি বুঝলেন?'

'খুবই ইন্টারেস্টিঙ। সম্ভব হলে এখনই চলে আসুন। ফোনে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়তো ঠিক হবে না।'

'মনে করুন রওনা হয়ে গিয়েছি আমি, প্রফেসর।'

'গুড।'

আলডারমাস্টন কমপ্লেক্সের ভিজিটর'স কার পার্কে একটাই মাত্র স্লট খালি। সাঁ করে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল রানা ওর মধ্যে। পঁচিশ-ত্রিশ পা হেঁটে মেইন কমপ্লেক্স বিল্ডিঙের রিসেপশন ডেস্কে পৌঁছে নিজের নাম জানাল অ্যাটেনডেন্টকে। বাঁ দিকে রাখা একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ির ভেতর থেকে কয়েকটা পাস তুলে নিয়ে চোখ বোলাল লোকটা। ওর থেকে একটা আলাদা করে বলল, 'কি নাম বললেন, স্যার? মিস্টার মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

পাসটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'তিন তলায় প্রফেসর ওয়েনের রুম, স্যার। রুম নাম্বার দুশো বারো। সোজা গিয়ে ডানে ঘুরলেই লিফট।'

'ধন্যবাদ।'

'ইউ ওয়েলকাম।'

দরজা খোলার শব্দে নাকে ঝোলানো চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তাকালেন ডেভিড ওয়েন। 'সীট ডাউন, বয়ো (বয়)।'

বসল মাসুদ রানা। প্রফেসরের সামনে রাখা একটা কাঁচের সীলড জার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। ভেতরে রয়েছে ওরই দেয়া সেই তিন চাকতির একটি—সীসার তৈরি ছোটটি।

'এই জিনিসটা কোথায় পেয়েছেন আপনি জানতে পারি কি, মিস্টার রানা?'

'গ্লাসগোয়, অ্যাকচুয়ালি। অন্য দুটো···?'

'হ্যাঁ, ওগুলোও টেস্ট করেছি। সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক ও দুটো। এটার বডিগার্ড বলতে পারেন ওদের। এটার যাতে ক্ষতি না হয়, তাই দু'পাশটা গার্ড দেয়ার জন্যে তৈরি। এমনিতে মূল্যহীন। জিনিস হচ্ছে এইটা,' চোখ নাচিয়ে জারটা দেখালেন প্রফেসর।

'জিনিস!'

'হ্যাঁ।'

'কি ওটা, প্রফেসর?'

'খাঁটি পোলোনিয়াম। কঠিন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ বিশেষ।'

ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা। আগে কখনও এ নাম শুনেছে বলে মনে করতে পারল না। 'শুনিনি কখনও এর নাম।'

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। ঠোঁট ওল্টালেন। 'না শোনারই কথা। এটা খুবই বিরল এক ধাতু।'

'কি কাজে ব্যবহার হয়?'

'কখনও কখনও ওষুধ তৈরিতে লাগে, তাও খুবই কম। যার কাছে পেয়েছেন এটা, তিনি কি গ্ল্যাসগোয় কোন মেডিকেল এক্সিবিশন বা সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন?'

'জ্বি না, প্রফেসর,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'সে ধরনের কোন কিছুর সাথে তার আদৌ সম্পর্ক নেই।'

'ওয়েল, সম্পর্ক আছে এমনটি কিন্তু আমিও ভাবিনি, মিস্টার মাসুদ রানা। সেক্ষেত্রে সম্ভবত আমার আশঙ্কাটাই সত্যি।'

'আশঙ্কা' শুনেই সিধে হয়ে গেল ও। 'কি রকম?'

'এই সাইজের এক খণ্ড পোলোনিয়ামের একা কিছু করার ক্ষমতা নেই। তবে এর সঙ্গে আরেক মেটাল, লিথিয়ামের যদি সংযোগ ঘটানো

হয়, তাহলেই ওটা এক অশুভ সংবাদের কারণ হয়ে উঠবে। এ দুটো মিলিত হয়ে যা হবে, তার নাম সোজা কথায় ইনিশিয়েটর।'

'কি বললেন?'

'ইনিশিয়েটর, বয়ো।'

'কি কাজে লাগে এ জিনিস, প্রফেসর?'

'নিউক্লিয়ার বোমা ডেটোনেট করতে।'

ওইদিনই দুপুরের দিকে প্যারিস থেকে আসা ব্রিটিশ মিডল্যাণ্ড এয়ারওয়েজের একটি বোয়িং অবতরণ করল বার্মিংহামের পশ্চিমে মিডল্যাণ্ডস এয়ারপোর্টে। যাত্রীদের ভেতরে রয়েছে ডেনিশ পাসপোর্টধারী এক যুবক। আর সবার সঙ্গে কাস্টমস চেকিঙের মুখোমুখি হলো সে।

পোশাক-আশাকে বেশ স্মার্ট যুবকটি। বাঁ হাতটি তার ভাঙা, প্লাস্টার করা। কেউ যদি সন্দিহান হয়ে ডেনিশে প্রশ্ন করত তাকে, জবাব পেত অনর্গল ডেনিশে। যুবকের মা ডেনিশ, বাবা জার্মান। এ দুটো ছাড়াও রুশ এবং ইংরেজি ভাষাতেও সমান দখল যুবকের। পুব জার্মানির এরফুর্ট শহরে জন্ম। ভেতরের কথা, ওদেশের এইচভিএ ইন্টেজিলেন্স সার্ভিসের স্টাফ অফিসার সে। কেন তাকে ব্রিটেনে আসতে হয়েছে জানে না যুবক, জানার কোন ইচ্ছেও নেই।

তার ওপর যে নির্দেশ পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে সে। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন চেকিং শেষ হতে বেরিয়ে এল যুবক বন্দর ভবন থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো নিউ স্ট্রীটের মিডল্যাণ্ড হোটেল। বিমানে সারাপথ এবং অবতরণের পর চেকিঙের সময় ভাঙা হাতের সঙ্গে যাতে কারও কোন সংঘর্ষ না ঘটে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিল যুবক। এখনও আছে। ওই হাতে ভুলেও কিছু স্পর্শ করছে না সে।

হোটেল রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিল সে। তারপর কাজে লেগে পড়ল। তার ট্রাভেল ব্যাগের তলায় বসানো পেস্টবোর্ডের সাপোর্টারের ভেতর থেকে একটা পাতলা স্টীল কাটার বের করে কবজির কাছে লম্বালম্বিভাবে প্লাস্টার কাটতে শুরু করল যুবক। কাজটা শেষ হতে ভেতর থেকে 'ভাঙা' হাতটা বের করে আনল সে। কাটা কাস্টটুকু কাগজে মুড়ে ভরে ফেলল একটা প্লাস্টিক ক্যারিয়ার ব্যাগে।

সন্ধে ছয়টা পর্যন্ত রুম থেকে বের হলো না যুবক। কারণ ডে-স্টাফরা তার ভাঙা হাত হঠাৎ করে 'ভাল' হয়ে যাওয়ার রহস্য নিয়ে ধাঁধায় পড়ে যেতে পারে। রাত আটটায় বের হলো ডেনিশ। নির্দেশমত নিউ স্ট্রীট স্টেশন নিউজপেপার কিয়স্কটা খুঁজে বের করল সে অনায়াসে। নির্ধারিত সময়ে, ঠিক দশটায়, কালো লেদার জ্যাকেট ও ট্রাউজার পরা দীর্ঘ এক লোক এসে দাঁড়াল যুবকের পাশে।

বিড় বিড় করে আইডেন্টিফিকেশন কোড আওড়াল দুজনে। হস্তান্তরিত হলো প্লাস্টার কাস্টের ব্যাগ। মুহূর্তের মধ্যে নেই হয়ে গেল কালো পোশাকধারী। আশপাশের কারও চোখেই পড়ল না ব্যাপারটা।

হোটেলে ফিরে ডিনার সারল যুবক। রাত দুটোর খানিক আগে চেক আউট করল। ট্রেনে ম্যানচেস্টার এসে বিমানে চাপল। এখানে কেউ চেনে না তাকে, দেখেনি কোনদিন। অতএব অসুবিধে হলো না বিন্দুমাত্র। নিরাপদেই ব্রিটেন ত্যাগ করল ডেনিশ। প্রথমে হামবুর্গ, তারপর বার্লিন। সবশেষে চেক পয়েন্ট চার্লি হয়ে প্রাচীর পেরিয়ে ওপারে, নিরাপদ আশ্রয়ে সেঁধিয়ে গেল যুবক।

তৃতীয় চালান খুব সহজেই পৌঁছে দিতে পেরেছে সে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ ওরফে মার্টিন ফ্ল্যানারির হাতে।

ছয়

তুফানের গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে থেটফোর্ড ফিরে এল মেজর তাতায়েভ। মোটর সাইকেল গ্যারেজে রেখে পোশাক পাল্টাল সে দ্রুত। একটা হালকা রঙের স্যুট পরে রেইনকোট চাপাল তার ওপর। এরপর গ্যারেজে তালা মেরে গাড়ি চালিয়ে রওনা হলো চেরিহে'জ ক্লোজ।

যখন বাসায় পৌঁছল সে, তখন ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। ভেতরে ঢুকে দরজায় তালা লাগাল তাতায়েভ। ওপরতলায় এসে ক্লোদস্ চেস্টের নিচের ড্রয়ার খুলে হাঁটু মুড়ে বসল সামনে। সনি পোর্টেবলটা আছে ভেতরে। রেইনকোটের পকেট থেকে প্লাস্টার কাস্টের ব্যাগটা বের করে ওর পাশে রাখল সে। ব্যাগে কি আছে জানে না ভ্যালেরি। জানতে চায়ও না সে।

তাতায়েভের কাজ ওগুলো সংগ্রহ করে অ্যাসেম্বলারের হাতে তুলে দেয়া। চালান সবগুলো পৌঁছলে আসবে সে। বিছানায় যাওয়ার আগে এক কাপ চা তৈরি করল মেজর ভ্যালেরি। দুটো চালান পৌঁছেছে, আরও সাতটা পৌঁছতে হবে। মোট নয়টা। নয়টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট, নয়টা ব্যাক-আপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং আরও ছয়টা অতিরিক্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রথম চালান খোয়া গেলে ব্যাক আপ কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হবে ওগুলো আবার। বাই চান্স, তাদের ভেতর থেকেও যদি এক-আধজন ব্যর্থ

হয় কোন কারণে, তা সামাল দেয়ার জন্যেই রয়েছে শেষের এই অতিরিক্ত ছয়জন। প্রতিটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের স্থান-কাল মুখস্থ তাতায়েভের। ব্যাক আপ কুরিয়ারদের একজনের সঙ্গে মিলিত হতে হবে তাকে খুব শিগগির। দু' নম্বর বিকল্প চালান নিয়ে আসবে সে। চালানটা কেন যে পৌঁছল না, তাতায়েভের কোন ধারণা নেই সে ব্যাপারে।

তবে মস্কো ব্যাপারটা জানে। তার গ্লাসগো কনসাল সে ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে, জানিয়েছে বিস্তারিত। ওতে ডেকহ্যাণ্ড আঁদ্রেই পাভলভের 'জিনিসপত্র' যে প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনের লক আপে রয়েছে, সে বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে কনসাল মস্কোকে।

ঘুমিয়ে পড়ল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন।

টাইয়ের ঢিলে নট্ বুকের কাছে ঝুলছে। চুল এলোমেলো। ঘুমের অভাবে দু'চোখ জবা ফুলের রঙ পেয়েছে। সামনের অ্যাশট্রেতে উপচান সিগারেটের গোড়া। কার্পেট ঢাকা পড়ে গেছে কম্পিউটর প্রিন্টআউট পেপারে। ওর মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে মাসুদ রানা। অসহায়ের মত চেয়ে আছে কাগজের স্তূপের দিকে। চেহারায় রাজ্যের শঙ্কা আর হতাশা।

মূল্যবান চার চারটে দিন পেরিয়ে গেছে হাতের ফাঁক গলে, আর এক চুলও এগোতে পারেনি রানা। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। অন্য তালিকার সঙ্গে গত এক সপ্তাহে সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনে আসা কয়েক শো ইমিগ্রান্টের এনট্রি তালিকাও রয়েছে রানার সামনে। ওর মধ্যে রয়েছে ডেলিগেট, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বায়ার, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন ভাঁড়, জর্জিয়ার একদল গায়ক-গায়িকা, কোসাকের একদল নর্তক, দশজন অ্যাথলেট এবং তাদের সফরসঙ্গীরা এবং ম্যানচেস্টারে

অনুষ্ঠিতব্য একটি মেডিকেল কনফারেন্সে যোগ দিতে আসা একদল ডাক্তার।

এছাড়াও আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ট্যুর সেরে ফিরে আসা অসংখ্য ইংরেজ অ-ইংরেজ ট্যুরিস্ট। নেই কেবল অ্যারোফ্লোট ক্রু-অফিসারদের তালিকা, যারা নিত্য আসা-যাওয়া করে মস্কো-লণ্ডন-মস্কো। নেই ডেনিশ যুবকের তথ্যও, যে প্যারিস থেকে এসে বার্মিংহাম দিয়ে এদেশে ঢুকে বেরিয়ে গেছে ম্যানচেস্টার হয়ে।

এ কাজে যথেষ্ট সহায়তা করছে ওকে এয়ারপোর্ট, সী-পোর্ট ও বর্ডার পোস্ট কাস্টমস। এমনিতে ব্রিটিশ কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সব সময়ই কড়া। দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সচেতন। রানা এজেন্সির অনুরোধে আরও কড়াকড়ি আরোপ করেছে তারা এ ক্ষেত্রে। ওদের সঙ্গে প্রতিটি এন্ট্রি পয়েন্টে কম করেও দু'জন করে বিএসএস ও রানা এজেন্সির এজেন্ট রয়েছে। রানার বিশ্বাস, কোথাও বেলাইনের কিছু ঘটলে সময় মত সামাল দিতে পারবে ওরা।

এর মধ্যে রুশ ব্লকভুক্ত দেশের কয়েকজন ইমিগ্রান্টকে আটক করার মত ঘটনাও ঘটেছে। তবে তা অতিরিক্ত ডিউটি-ফ্রি কারেন্সি সঙ্গে আনার জন্যে, অন্য কোন কারণে নয়। ওদিকে ইমিগ্রেশনের হাতে কোন জাল বা ভুয়া পাসপোর্ট এর মধ্যে পড়েনি। পড়বে বলে আশাও করেনি মাসুদ রানা। কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এ ব্যাপারে যতটা ঢিলে, কমিউনিস্ট দেশগুলো ঠিক ততটাই সচেতন। দেশত্যাগ করার আগে নিজ নাগরিকদের পাসপোর্ট অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে পরীক্ষা করে দেখে ওরা। বিশেষ করে দেশটি যদি হয় ব্রিটেন।

রানার মূল দুশ্চিন্তা বিশটিরও বেশি কমার্শিয়াল সমুদ্র বন্দর, যার

ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বলতে গেলে কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। যেমন গ্লাসগো। বিদেশী নাবিকরা ইচ্ছেমত বন্দর ত্যাগ করতে পারে, যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করতে পারে। ভাগ্যিস ওখানে সেদিন একদল নেড ছিল, নইলে পোলোনিয়াম ডিস্কের টিকির সন্ধানও পেত না কেউ।

রুমের ভেতর পা রেখে থমকে গেলেন স্যার লংফেলো। ওর সঙ্গে আলোচনা করে কিছু অগ্রগতি হলো কি না জানতে এসেছিলেন। কিন্তু চেহারা দেখে সাহস হলো না মুখ খুলতে।

'আসুন, আসুন,' বৃদ্ধকে আহ্বান জানাল রানা।

'না, রানা। থাক বরং। তোমার যা অবস্থা!'

'ও কিছু নয়,' সামনের কাগজগুলো ঠেলে পাশে সরিয়ে দিল ও। 'বসুন।'

বসলেন বৃদ্ধ। এটা-ওটা নিয়ে খানিক আলোচনা হলো দু'জনে। 'কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না তো, রানা?' একসময় প্রশ্ন করলেন স্যার লংফেলো। করেই বুঝলেন, বোকার মত হয়ে গেল প্রশ্নটা। কাজটা পুরোটাই আপাদমস্তক এক মহা সমস্যা। 'মানে, ঠিক আর কি কি খুঁজতে হবে সে ব্যাপারে কোন ধারণা পেয়েছ? বলেছেন প্রফেসর ওয়েন?'

'হ্যাঁ।' ড্রয়ার থেকে একটা তালিকা বের করে এগিয়ে দিল রানা বিএসএস চীফের দিকে। 'এগুলো। অন্তত এরকমই হওয়ার কথা।'

কাগজটায় চোখ বোলালেন তিনি। 'ব্যাস?' বিস্মিত হলেন বৃদ্ধ। 'এসব দিয়েই তৈরি হবে বোমা?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'কিন্তু মুশকিল যে এসব চেনা খুব মুশকিল। গ্লাসগোর মত যদি ভাগ্য সহায়তা না করে তাহলে...।' ইচ্ছে করেই থেমে গেল ও। 'ওহ্, আরেকটা কথা।'

'বলো!'

'পুরো মিডল্যাণ্ডে কতগুলো ব্রিটিশ-আমেরিকান বিমান ঘাঁটি আছে, ওর কোন্ কোন্টায় নিউক্লিয়ার ডিভাইস আছে জানা প্রয়োজন।'

'আজই জেনে যাবে। আর কিছু?'

'এ মুহূর্তে নেই, স্যার। তবে পরে প্রয়োজন হতে পারে। আমি আসলে একটা প্যাটার্ন খুঁজছি।'

'কিসের প্যাটার্ন?'

'একই নাম্বারের পাসপোর্ট নিয়ে একাধিকবার আসা-যাওয়ার ঘটনা ঘটে কি না। অথবা এক পয়েন্ট দিয়ে ঢুকে আরেক পয়েন্ট দিয়ে কেউ বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কি না। চান্স নেই, আমিও বুঝি। তবুও আশায় আছি।'

নতুন এক ব্যবস্থা নিয়েছে রানা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বন্ধু দেশগুলো থেকে আগতরা যে পয়েন্ট দিয়েই এ দেশে প্রবেশ করুক, তাদের নাম ও পাসপোর্ট নাম্বার কম্পিউটরের মাধ্যমে সারাদেশের প্রতিটি এনট্রি ও এক্সিট পয়েন্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে সহজেই তা ঠেকিয়ে দেয়া যাবে।'

'প্রার্থনা করি সফল হও,' বিড় বিড় করে বললেন লংফেলো। 'প্রার্থনা করি ওরা যেন অন্তত আর একটা সুযোগ দেয়।'

কিন্তু মাসুদ রানাকে কোন সুযোগ দিতে রাজি নয় মেজর ক্রিপচেঙ্কো। কোন প্যাটার্নের সন্ধান দিতে চায় না সে। ক্রিপচেঙ্কোর কোন ধারণাই নেই কি পাচার করছে সে ব্রিটেনে, কি কাজে লাগবে ওগুলো। কেবল জানে, জিনিসগুলো পাঠাবার নির্দেশ আছে তার ওপর। পাঠাতেই হবে। বিফল হলে চলবে না। মোট বারোজন কুরিয়ার বাছাই করেছে সে। প্রথম নয়জনের দুটো করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, প্রাইমারি ও অলটারনেটিভ।

প্রথমবার কেউ ব্যর্থ হলে ফিরে আসবে সে, অবশ্য যদি ধরা না পড়ে। আবার ঢুকবে অন্যদিক থেকে। বাকি তিনজন স্ট্যাণ্ড বাই কুরিয়ার। প্রথম দলের কেউ কোন দুর্ঘটনায় পড়লে, ওদের পাঠানো হবে বদলি হিসেবে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে মেজরকে, এ কাজে কোন কেজিবি রেসিডেন্টুরাকে ব্যবহার করা চলবে না। কোনমতেই না। এবং ডিরেকটরেট 'এস' যাতে ভেতরের কিছু টের না পায়, সে জন্যে তার বিভাগ থেকেও আর কোন ইল্লিগ্যালকে নেয়া যাবে না।

যে কারণে বাধ্য হয়েই প্রতিবেশীদের সাহায্য চাইতে হয়েছে ক্রিপচেঙ্কোকে। যাদের মধ্যে রয়েছে চেকস্লোভাকিয়ার এসটিবি, পোল্যাণ্ডের এসবি এবং পুব জার্মানির হপট্ ভেরওয়ালটাঙ অউয-ক্লারাঙ বা এইচভিএ। এরমধ্যে শেষেরটিই সেরা। তাছাড়া ওদের ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদও। কারণ লাখ লাখ পুব জার্মান পালিয়ে গেছে পশ্চিম জার্মানিতে, বসবাস করছে স্থায়ীভাবে। ওর মধ্যে এইচভিএ-র শ' শ' ইন প্লেস ইল্লিগ্যালসও রয়েছে। মাঝে প্রাচীর থাকলেও এথনিক জার্মানে পরিচিতি আছে ওদের। বড় একটা প্লাস পয়েন্ট ওটা।

মাত্র দু'জন রুশ নিয়েছে মেজর, বাকিদের ধার করেছে। তার জানার কোন উপায় নেই যে প্রথম দুজনের একজন, ভুয়া ডেকহ্যাণ্ড পাভলভ গ্লাসগোয় ঝাপটা পার্টির হাতে পড়ে শেষ পর্যন্ত মরে বেঁচেছে। এবং তার জিনিসপত্র প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনে থাকলেও ওর মধ্যে আসল জিনিসটি নেই। মস্কো তাকে জানিয়েছে যে জাহাজে অতিরিক্ত মদ পানের কারণে পথেই মারা গেছে পাভলভ।

খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে মেজর ক্রিপচেঙ্কো। তার পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় সুবিধে, মাত্র তিন কুরিয়ারকে ইস্ট ব্লক ডিপারচার পয়েন্ট দিয়ে ব্রিটেনে পাঠানোর আয়োজন করেছে সে। অন্যরা যাবে যে পথে গেলে কারও কোন সন্দেহের

উদ্রেক হবে না, সে পথে।

ব্রিটিশ কাস্টমস বা ইমিগ্রেশন যাতে কোন প্যাটার্নের সন্ধান না পায়, সে-জন্যেই তার এ আয়োজন।

পরদিন। প্রাগ থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ পিয়ানো বাদক অবতরণ করলেন হিথ্রো। আলইটালিয়া ফ্লাইটে। পরদিন উইগমোর হল কনসার্টে পিয়ানো বাজানোর প্রোগ্রাম আছে তাঁর। এমন একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, কাস্টমস চটপট রেহাই দিল তাঁকে এবং তাঁর তিন সফরসঙ্গীকে।

একজন ড্রেসার; যে বাদকের পোশাক এবং সাজগোজের ব্যাপার দেখাশোনা করে। এক মহিলা সেক্রেটারি; ভক্তদের চিঠিপত্রের বোঝা সামলানো এবং তার উত্তর দেয়াসহ যাবতীয় পত্র যোগাযোগের কাজ করে সে। অন্যজন ব্যক্তিগত সহকারী। লোকটি তালগাছের মত লম্বা, লিকলিকে স্বাস্থ্য। লোকটা হোস্টদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন ও ফিনানশিয়াল ঝামেলা সামাল দেয় বাদকের।

তাঁর হোস্ট, ভিকটর হশ্সার অর্গানাইজেশনের একদল গুণমুগ্ধ ভক্ত যুবক-যুবতি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল বৃদ্ধকে। কাম্বারল্যাণ্ড হোটেলের নির্ধারিত সুইটে পৌঁছে দিল তাঁকে দলবলসহ। অন্যদের জন্যে সুইটের সঙ্গেই আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা আছে।

খানিক বাদে এক এক করে বিদেয় নিল গুণমুগ্ধ ভক্তরা। খানিক জিরিয়ে নেয়ার সুযোগ পেল দলের সবাই। কিন্তু রুমে আশ্রয় নিয়েও সে সুযোগ হলো না ব্যক্তিগত সহকারীর। দুশ্চিন্তায় গত কয়েকদিন থেকেই বিশ্রাম-ঘুম কোনটিই হচ্ছে না তার। সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে লোকটির দুশ্চিন্তা। যে কাজের নির্দেশ আছে তার ওপর, তা করার

আগ্রহ একেবারেই ছিল না সহকারীর। কিন্তু চেকস্লোভাকিয়ান সিক্রেট পুলিস ও ইন্টেলিজেন্স সংস্থা এসটিবি-র বিরুদ্ধাচরণ করার কথা ওদেশে কেউ কল্পনাও করে না।

ওদের দাবি না মেনে উপায় ছিল না সহকারীর। রাজি না হলে একমাত্র নাতনীটিকে প্রাগ ভার্সিটিতে ভর্তি করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে তার। সফল হবে না কোনদিনও। ওরা আশ্বাস দিয়েছে যদি সে কাজটা করে দেয়, তাহলে ওরা মেয়েটির ভর্তির ব্যাপার সামাল দেবে। বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না তাকে।

কি চাই? না, তোমার জুতোজোড়া। অবাক হলেও মনের ভাব চেপে রেখে নির্দেশ পালন করেছে সহকারী। দু'দিন পর যখন ফেরত দেয়া হলো, ও দুটো, খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে দেখেছে সে। কিন্তু আবিষ্কার করতে পারেনি কিছুই। মনে হয়েছে যেমন ছিল, তেমনই আছে তার জুতো। ওদের নির্দেশে ওই জুতো পায়ে দিয়েই লণ্ডন এসেছে সহকারী।

সন্ধের পর হোটেলের রিসেপশনে এল সুবেশি এক যুবক। মোলায়েম কণ্ঠে সহকারীর রুম নাম্বার জানতে চাইল সে। একই রকম মোলায়েম কণ্ঠে নাম্বারটা জানানো হলো তাকে কোন প্রশ্ন না করেই। ধারণা করা হলো এ নিশ্চয়ই পিয়ানো বাদকের ভক্ত, সহকারীর মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে এসেছে।

পাঁচ মিনিট পর, নির্ধারিত সময়ে দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে চমকে উঠল ব্যক্তিগত সহকারী। এ সেই সঙ্কেত। প্রথমে তিনটে, তারপর খানিক বিরতি দিয়ে আবার দুটো। লাফিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। দরজার নিচ দিয়ে কেউ এক টুকরো কাগজ ভরে দিল ভেতরে। তুলল ওটা লিকলিকে। ওতে বড় করে লেখা আছে আইডেন্টিফিকেশন কোড।

দরজা পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ উন্মুক্ত করল সে। একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা

জুতো জোড়া বের করে দিল। অদৃশ্য হাত প্রায় কেড়ে নিল ব্যাগ। দরজা বন্ধ করে বাথরুমে এসে ঢুকল সহকারী। কাগজটা কুচি কুচি করে কমোডে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিল। বুকের ভার নেমে গেছে। যতটা কঠিন হবে বলে ভেবেছিল সে, ঠিক ততটাই সহজে বিদেয় হয়েছে ঝামেলা। যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভাবল সহকারী, এবার হয়তো নাতনীটার একটা হিল্লে হবে।

মাঝরাতের দিকে ইপসউইচের বারো নাম্বার চেরিহে'জ-এ পোর্টেবল সনি ও প্লাস্টার কাস্টের পাশে স্থান পেল জুতো জোড়া। চতুর্থ চালান তার গন্তব্যে পৌঁছেছে নিরাপদেই।

কেজিবিকে কেন এত ব্যাপক এক কর্মকাণ্ড থেকে বাদ রাখলেন রুশ প্রেসিডেন্ট? ভাবছে মাসুদ রানা, কেন? এত ঝুঁকি না নিয়ে সেক্ষেত্রে সহজেই তো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পুরে পাঠানো যেত চালানগুলো! সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা থাকতেও কেন তাকে পাশ কাটালেন প্রেসিডেন্ট? লণ্ডনের রুশ দূতাবাসের উঁচু পর্যায়ে বিএসএসের সোর্স রোমানভ আছে বলে? রোমানভের ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ দেখা দিয়েছে তাঁর মনে? ওর মাধ্যমে বিএসএস খবর পেয়ে যাবে বলে?

না, তা হতে পারে না। রোমানভের ব্যাপারে এখনও কারও মনে সন্দেহ জাগেনি। জাগলে এখনও চাকরিতে বহাল থাকা সম্ভব হত না তার পক্ষে। তেমন কিছু ঘটে থাকলে হয় কৌশলে মস্কো ডেকে নিয়ে যাওয়া হত রোমানভকে, নয় কোন গুরুত্বহীন পদে বদলি করা হত, নয়ত তৃতীয় বিশ্বের কোন অখ্যাত দেশে পাঠিয়ে দেয়া হত।

মাসুদ রানা জানে, মস্কোর এলিট মহলে গত কিছুদিন ধরে ঘন ঘন পরিবর্তন চলছে। বড় বড় কর্তাদের কাউকেই এক পদে ছয় মাসের বেশি

রাখা হচ্ছে না। বিশেষ করে কেজিবির বেলায় সেন্ট্রাল কমিটির মনোভাব ভীষণ কঠোর। হাতে গোণা দু'চারজন ছাড়া প্রায় সবাইকেই গণবদলির শিকার হতে হচ্ছে। ইচ্ছেমত যখন-তখন বিদেশে অবস্থানরত কেজিবি রেসিডেন্টুরাদের ডেকে নেয়া হচ্ছে দেশে।

এর কারণ একটাই হতে পারে, ভাবছে রানা। কেজিবির বেশ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী পক্ষ বদল করেছে গত কয়েক বছরে। সংখ্যাটা আশঙ্কাজনক। সেই জন্যেই কি খেপে গেছেন প্রেসিডেন্ট ওদের ওপর? কেজিবি ছাড়াই কাজ চলবে প্রমাণ করতে চাইছেন? কিন্তু রানা যেমন জানে, তেমনি তিনিও নিশ্চয়ই অবহিত আছেন, এই দ্বীপ দেশটির ব্যাপারে যে অগাধ জ্ঞান রাখে কেজিবি, পৃথিবীর আর কোন গোয়েন্দা সংস্থা তার সিকিভাগও রাখে না।

জানালা দিয়ে দূরের অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে অন্যমনস্ক মাসুদ রানা। এ দেশের ভৌগলিক সীমারেখার বাইরে কোথাও কাজ করছে একটি চতুর মস্তিষ্ক। অসম্ভব চতুর মস্তিষ্ক। রানার মন বলছে, ট্রেস করা যাচ্ছে না বলে লোকটা কাজ বন্ধ রেখেছে এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে। ধরতে পারছে না কেউ। ধরার উপায় সে রাখেনি বলে। একের পর এক চালান পাঠাচ্ছে সে ব্রিটেনে, অত্যন্ত বিপজ্জনক চালান। ক'টা পাঠাতে পেরেছে সে এ পর্যন্ত? চারটা? পাঁচটা? নাকি ছ'টা? শেষ পর্যন্ত কি ব্যর্থই হতে হবে রানাকে?

তুমি হতে পারো ভাল, মনে মনে নিজেকে বলল রানা; কিন্তু ওই লোক আরও ভাল। সেরা। তোমার কোন চান্স নেই এ যাত্রা, মাসুদ রানা। খুব সম্ভব ব্যর্থ হতে চলেছ তুমি।

টেমসের দিকে তাকাল রানা। বাতাসে মৃদু ঢেউ উঠেছে ঘোলা পানিতে। একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকল ও।

*

আরও একজন চেয়ে আছে ঢেউয়ে দিকে। তবে টেমসের নয়, ইংলিশ চ্যানেলের। সাসেক্সের নিউহ্যাভেন পোর্টে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কালো লেদার জ্যাকেট—ট্রাউজার পরনে। পাশেই ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে আছে তার বিএমডব্লিউ। হেলমেটটা সীটের ওপর রাখা। প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি একটা ফেরিবোট দেখা যাচ্ছে, চ্যানেলের বিশাল একেকটা ঢেউ ঠেলে এদিকেই আসছে। সেদিকেই চেয়ে আছে মেজর।

ডিয়েপপি থেকে আসছে ফেরিবোট কর্নোওয়ালিস। আর এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে ঘাটে। ওটার ফোরডেকে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ উপকূলের দিকে চেয়ে আছে আন্তন যেলেস্কি। সঙ্গে নির্ভেজাল পশ্চিম জার্মান পাসপোর্ট রয়েছে তার। নামটার ভেতরে পোলিশ-পোলিশ গন্ধ। কিন্তু ও কিছু নয়, অনেক জার্মানের পোলিশ নাম আছে, জানে ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন।

প্রথম বাধা পেরিয়ে কাস্টমসের সামনে উপস্থিত হলো আন্তন যেলেস্কি। ওরা খুলে দেখল তার সুটকেস। এক বোতল জিন আর পঁচিশটি চুরুটের আনকোরা একটা বাক্স আছে ওতে। কর্নোওয়ালিসের ডিউটি-ফ্রি শপ থেকে কেনা। কাস্টমসের আপত্তি জানানোর কিছু নেই, কারণ অনুমতির বাইরে কিছু করেনি যেলেস্কি। তাকে মুক্তি দিয়ে পরেরজনকে নিয়ে পড়ল কাস্টমস।

এক প্যাকেট চুরুট ঠিকই কিনেছিল যেলেস্কি, সঙ্গে সঙ্গে তা আবার ফেলেও দিয়েছে সাগরে। ওই প্যাকেটের মত অবিকল দেখতে আরেকটা প্যাকেট সঙ্গে নিয়েই ডিয়েপপি থেকে কর্নোওয়ালিসে ওঠে সে। মাঝপথে এসে ফেরির ডিউটি ফ্রি শপ থেকে চুরুট কিনে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। তারপর সদ্য কেনা প্যাকেটের রঙচঙে লেবেলটি যত্নের সঙ্গে খুলে তা দিয়ে মুড়ে নেয় আগের প্যাকেটটি। সাগরে আশ্রয় পায় আসল চুরুটের

প্যাকেট।

স্টেশনে এসে টাইম টেবল চেক করল আন্তন যেলেস্কি। আর আধঘণ্টা পর ছাড়বে লণ্ডন এক্সপ্রেস। টিকেট কেটে এঞ্জিনের কাছাকাছি একটা ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিজে উঠে পড়ল সে। জানালার পাশে বসল আয়েশ করে। যাত্রী নেই তেমন একটা। কম্পার্টমেন্টে যেলেস্কি ছাড়া আর দু'তিনজন আছে কেবল। সময়মত ছাড়ল ট্রেন।

লুইস পৌঁছার সামান্য আগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাক পরা এক দীর্ঘ দেহ এসে দাঁড়াল তার পাশে। হাসি মুখে প্রশ্ন করল, 'গাড়িটা সোজা লণ্ডন যাবে, তাই না?'

'না,' হাসল জার্মান। 'লুইসে দাঁড়াবে শুনেছি।'

হাত বাড়াল ভ্যালেরি তাতায়েভ। সিগারের চ্যাপ্টা প্যাকেটটা তুলে দিল জার্মান। জ্যাকেটের জিপ খানিকটা নামিয়ে ওটা ভেতরে পাঠিয়ে দিল মেজর, গলা পর্যন্ত টেনে তুলল জিপ। মাথা দুলিয়ে বিদেয় জানাল, বেরিয়ে গেল কম্পার্টমেন্ট থেকে। লুইসে পলকের জন্যে আরেকবার তাকে দেখতে পেল আন্তন যেলেস্কি। রেল লাইনের সমান্তরাল রাস্তা ধরে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে উল্টোদিকে চলেছে মানুষটা। ফিরে যাচ্ছে নিউহ্যাভেন।

ইপসউইচে আগের চালানগুলোর সঙ্গে যোগ হলো চুরুটের প্যাকেট। অবলীলায় যথাস্থানে পৌঁছে গেছে পঞ্চম চালান।

সাত

অন্ধ গলিতে ঘুরে মরছে মাসুদ রানা। বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। আটদিন হয়ে গেল, কোন অগ্রগতি হয়নি কাজের। এদিকে সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। নির্বাচনী প্রচারণায় মুখর সারা ব্রিটেন। বক্তৃতা-বিবৃতি আর শোভাযাত্রায় উৎসবের রূপ পেয়েছে ছোটবড় প্রতিটি শহর। সবাই ব্যস্ত। কেউ জানে না ওরা কী ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে মাথার ওপর।

প্রতিদিন অজস্র ভ্রমণার্থী আসে এ দেশে, তাদের প্রত্যেকের আগাপাশতলা সার্চ করে দেখা অসম্ভব একটা কাজ। সে-জন্যে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ডক পুলিসের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে মাসুদ রানা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে। বিশেষ করে ইস্ট ব্লকভুক্ত দেশের নাগরিকদের ব্যাপারে। ঠিক কি খুঁজতে হবে, সে সম্পর্কে খানিকটা ধারণাও দেয়া হয়েছে তাদের।

নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করতে কি কি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন, প্রফেসর ডেভিড ওয়েনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে মাসুদ রানা। ওর একটা হবে খাঁটি ইউরেনিয়াম ব্লক, টু থার্টি ফাইভ। একটা ট্যামপার, আকার সিলিণ্ডার অথবা বলের মত, যে-কোনটা হতে পারে। এক ইঞ্চি পুরু, হাই টেনসিল হার্ডেনড্ স্টীলের। তৃতীয়টা একটা স্টীল টিউব। এটাও হাই টেনসিল হার্ডেনড্ স্টীলের, এক ইঞ্চি পুরু। টিউবের দৈর্ঘ্য

হতে হবে আঠারো ইঞ্চি, ওজন ত্রিশ পাউণ্ড।

রানা নিশ্চিত, এই তিনটে জিনিস অন্তত গাড়ির চেসিসে জুড়ে ব্রিটেনে ঢোকাবার চেষ্টা করা হবে। এ ব্যাপারেও কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে ওর। তাই সবগুলো বর্ডার ও ফেরিঘাটে হন্যে হয়ে জিনিসগুলো খুঁজছে কর্তৃপক্ষ। গাড়ির অংশ নয়, এমন কোন ব্লক, বল বা গ্লোব এবং সিলিণ্ডার। প্রতিটির ওজন হতে হবে অস্বাভাবিক ভারী। মানুষের ব্যাপারে শ্রেণী বিভেদ থাকলেও গাড়ির ব্যাপারে তা নেই। সে পুব ইউরোপীয়ই হোক, পশ্চিম ইউরোপীয়ই হোক, প্রতিটি গাড়িই সার্চ করা হচ্ছে। কোনও দিক থেকেই কোন খবর নেই এখনও।

বুকে জোর পাচ্ছে না রানা। স্রোতের মত প্রতিদিন আসছে-যাচ্ছে অসংখ্য গাড়ি। মোটর সাইকেল, কার, ভ্যান, ট্রাক, জাগারনাট, আরও কত কি! শুধু তৎপরতায় কাজ হবে না, মন বলছে ওর। সঙ্গে ভাগ্যের সহায়তাও চাই খানিকটা। দুটোর মিলন না হলে কোন আশা নেই।

পরদিন শনিবার, বিকেল চারটের দিকে ফেরিবোটে করে ডোভার পৌঁছল এক ক্যাম্পার ভ্যান। জার্মান রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ওটার। ভ্যানের মালিক সপরিবারে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে এসেছে ক্যালাইস থেকে। ওটার মালিক-কাম-চালক, উলফ কিগলারের সঙ্গে আছে তার স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে। ওদের কাগজপত্রে কোন খুঁত চোখে পড়ল না ইমিগ্রেশনের। সব ঠিকঠাক। কাজেই ছেড়ে দিল ওরা কিগলারকে।

ধীরগতিতে কাস্টমসের নাথিং-টু-ডিক্লেয়ার গ্রীন জোনের দিকে এগোল এবার ক্যাম্পার ভ্যান। প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে হাত তুলল এক কাস্টমস অফিসার। পাশ থেকে রানা এজেন্সির এক ওয়াচার খুঁচিয়ে দিয়েছে তাকে, কারও নজরে পড়েনি ব্যাপারটা। দাঁড়িয়ে পড়ল

ভ্যান। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখা হলো কিগলারের কাগজপত্র। তারপর ওগুলো ফেরত দিয়ে পিছনের কম্পার্টমেন্টে তল্লাশি চালানো হবে বলে জানাল অফিসার।

হাসিমুখে পাশে বসা সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকাল উলফ কিগলার। কিছু বলল। অভয় দিল সম্ভবত, কিন্তু বুঝল না অফিসার। বেরিয়ে এসে পিছনের দরজা খুলে দিল সে। ভেতরের লিভিং এরিয়ায় খেলা করছিল তাদের দুই ছেলেমেয়ে, ইউনিফর্ম পরা অফিসারকে দেখে ঘুরে তাকাল। ছেলেটি ছোট, বছর চারেক হবে বয়স। মেয়েটির বয়স ছয় বছর।

'হাই!' মিষ্টি করে হাসল অফিসার শিশু দুটির উদ্দেশে।

মেয়েটি বেশ চটপটে। উঠে দাঁড়াল বসা থেকে। 'গুটেন ট্যাগ!'

তার সোনালি চুল নেড়ে দিল অফিসার। থুতনি স্পর্শ করে আদর করল ছেলেটিকে। তারপর কাজে লেগে পড়ল। নিচে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে উলফ কিগলার ও রানা এজেন্সির ওয়াচার। প্রথমে নিজের চারদিকে নজর বোলাল অফিসার, তারপর ডানদিকের দেয়ালে ঝোলানো কাবার্ডগুলোর ভেতরটা পরখ করতে লাগল। কাপড়-চোপড় ও রান্নার ইউটেনসিল ছাড়া কিছু নেই ওখানে।

এবার ওর ঠিক নিচের লকারগুলো চেক করা হলো। একটিতে বাচ্চাদের কিছু খেলনা রয়েছে। দুটো পুতুল, একটা টেডি বেয়ার, চার-পাঁচটা রঙচঙে নরম রাবারের বল ইত্যাদি। ছুটে এসে ভেতর থেকে একটি পুতুল বের করে নিল মেয়েটি, ওটা নাচিয়ে উত্তেজিত স্বরে কিছু বলতে লাগল অফিসারকে।

'ওহ্, বিউটিফুল!' আবার তার চুল নেড়ে দিল লোকটা। লাফিয়ে নেমে পড়ল ভ্যান থেকে। 'অল রাইট, স্যার,' মাথা ঝাঁকাল অফিসার জার্মানের উদ্দেশে। 'এনজয় ইওর হলিডে।'

'ড্যাঙ্কি!'

গড়িয়ে গড়িয়ে শেড থেকে বেরিয়ে এল ক্যাম্পার ভ্যান। এগিয়ে চলল ডোভার শহরের দিকে। শহর হয়ে লণ্ডন যাওয়ার ইচ্ছে কিগলারের। তার স্ত্রী ম্যাপ দেখে দেখে নির্দেশ দিচ্ছে, সেই মত গাড়ি চালাচ্ছে সে। এর মধ্যে কয়েকবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়েছে কিগলার। দেরি করে ফেলেছে সে। কিন্তু কিছু করার নেই। তার ওপর নির্দেশ ছিল কোনমতেই স্পীড লিমিট অতিক্রম করা যাবে না।

আধঘণ্টা চলার পর চ্যারিঙ গ্রামে পৌঁছল ভ্যান। মেইন রোডের ডানদিকে। গ্রামের শেষ মাথায় দেখা গেল বড় একটি সাইনবোর্ড—হ্যাপি ঈটার ক্যাফেটেরিয়া। স্টিয়ারিঙ ঘোরাল কিগলার, প্রায় শূন্য কার পার্কে দাঁড় করাল ভ্যান। বাচ্চাদের নিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে ঢুকল মিসেস কিগলার। এদিকে মিস্টার নির্দেশমত এঞ্জিন কভার তুলে লেগে পড়ল 'কাজে'। মিনিটখানেক পর অপরিচিত এক কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাল সে। রাইডার'স লেদার ড্রেস পরা এক যুবক দাঁড়িয়ে।

'এঞ্জিনে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে?' প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'হ্যাঁ। মনে হয় কারবুরেটরে কিছু একটা হয়েছে।'

'না,' মাথা দোলাল মোটর সাইক্লিস্ট। 'গোলমালটা ডিস্ট্রিবিউটরে। দেরি করে ফেলেছেন আপনি।'

'দুঃখিত। ফেরি, কাস্টমস সবাই মিলে দেরি করিয়ে দিল। আসুন।'

ভ্যানে এসে উঠল সে তাতায়েভকে নিয়ে। খেলনার লকার থেকে একটা বল বের করে তুলে দিল তার হাতে। 'এই যে।'

পাঁচ ইঞ্চি ডায়া বলটার, কিন্তু তার ওজন অবিশ্বাস্য। প্রায় বিশ কিলোগ্রাম বা চুয়াল্লিশ পাউণ্ড। হতেই হবে, কারণ ওটার রাবারের আবরণের ভেতর লুকিয়ে আছে আসল জিনিস। খাঁটি ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ। যার ওজন সীসার দ্বিগুণ। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে বলটা ভরল তাতায়েভ।

ভ্যান থেকে নেমে পার্কের ও প্রান্তে রেখে আসা বিএমডব্লিউর দিকে চলল। প্রচণ্ড শক্তি খাটাতে হচ্ছে তাতায়েভকে ওটা হাতের তালুতে করে বয়ে নিয়ে যেতে, মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখতে। সবাইকে সে বোঝাতে চাইছে যে জিনিসটা তেমন কিছু নয়। যদিও বোঝার জন্যে কেউ তাকিয়ে নেই তাতায়েভের দিকে।

কভার নামিয়ে দ্রুত ক্যাফেতে ঢুকে পড়ল উলফ কিগলার। ওদিকে পিছনের ফাইবার গ্লাস বক্সে জিনিসটা রেখে মোটর সাইকেল স্টার্ট দিল মেজর ভ্যালেরি। মেইন রোডে উঠে তুমুল গতিতে ডার্টফোর্ড টানেলের দিকে ছুটল। টানেল অতিক্রম করে সাফোক। সেখান থেকে লণ্ডন হয়ে ইপসউইচ। সুদীর্ঘ সফর। রাস্তা ছেড়ে শূন্যে ভাসছে প্রায় বিএমডব্লিউর দুই প্রশস্ত চাকা, উড়িয়ে নিয়ে চলেছে প্রভুকে।

ভাইজরের ভেতর দিয়ে স্থির চোখে সামনে তাকিয়ে আছে মেজর তাতায়েভ। নিরুদ্বিগ্ন, প্রশান্ত চেহারা। শিস দিয়ে গান গাইছে।

নিজেকে পরাজিত সেনাপতির মত নিঃস্ব, অসহায় মনে হচ্ছে মাসুদ রানার। এত বড় একটা বাহিনী, এত ব্যাপক আয়োজন সব বেকার হতে বসেছে। সব ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢোকা অব্যাহত রয়েছে শত্রুর। জানে, অথচ কিছুই করতে পারছে না ও। অন্ধের মত শিকার করতে নেমেছে রানা। দেখতে না পেলেও ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে শিকারের উপস্থিতি।

কিন্তু এর বেশি কি-ই বা করতে পারে রানা? কি করার আছে? কম্পিউটর প্রিন্টআউটের পাহাড় কোন আশার আলো দেখাতে পারেনি এখন পর্যন্ত। কোন প্যাটার্নের সন্ধান পায়নি রানা ওর মধ্যে। কোন ইস্ট ব্লক নাগরিক একবারের বেশি প্রবেশ করেনি ব্রিটেনে, কোন পাসপোর্টও একবারের বেশি ব্যবহৃত হয়নি।

কিছু কিছু অনিয়ম যে ঘটেনি, তা নয়। ঘটেছে। কিন্তু তার সঙ্গে রানার কাঙ্ক্ষিত অনিয়মের কোন সংযোগ নেই। কয়েকবার করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সেগুলো, রুমে নিয়ে আলাদাভাবে লাগেজ তো বটেই, প্রায় উলঙ্গ করে সার্চ করা হয়েছে ওর বাহকদের। কিন্তু ফলাফল শূন্য। এসব হিথ্রোর ঘটনা। লণ্ডনের বাইরেও এ ধরনের তিনটে ঘটনা ঘটেছে গত দু'দিনে।

এমআই ফাইভের মতে তিনজনই আমেরিকান আণ্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার। জুয়া এবং মাদক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ওদেশের পুলিসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে আশ্রয় পাওয়ার আশায়। ঘাড় ধরে পরবর্তী বিমানে তুলে দেয়ার আগে তাদেরও একই কায়দায় সার্চ করেছে ইমিগ্রেশন-কাস্টমস। বিএসএসের অনুরোধে সিআইএ ওদের পরিচয় ও কীর্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে। এমআই ফাইভের রেকর্ডের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই তাতে।

কোন কিছু কি নজর এড়িয়ে যাচ্ছে ওর? ভাবল মাসুদ রানা। বিশেষ কিছু? নতুন করে ভাবতে বসল ও, আর কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া যায় এর বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে চেষ্টা বাদ দিল রানা। ঠিক পথেই এগোচ্ছে ও, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

মন বলে, একটা না একটা সুযোগ শেষ পর্যন্ত পাবেই ও। কোথাও না কোথাও ছোট্ট একটা ভুল করবেই চতুর ব্রেনটি। করবেই।

চেরিহে'জ ক্লোজ। ইপসউইচ। একটা শক্তিশালী পোর্টেবল রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। তার জন্যে নির্ধারিত ব্যাণ্ডে মস্কো রেডিওর কমার্শিয়াল শুনছে সে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে। বড়সড় একটা ব্রাউন সেট, ক'দিন আগে স্টোমার্কেট থেকে কিনেছে তাতায়েভ। পৃথিবীর প্রায় সব চ্যানেলই ধরে এটায়।

তাতায়েভ বেশ চিন্তিত। দু'নম্বর চালান পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ সময় মতই মস্কোকে জানিয়েছে সে। কথা ছিল, সেরকম কিছু ঘটলে মস্কোকে কেবল অবহিত করতে হবে তা। এরপর প্রতিদিন রাত বারোটা থেকে পরবর্তী পনেরো মিনিট অথবা প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে সোয়া একটা পর্যন্ত এই বিশেষ ব্যাণ্ড শুনতে হবে তাকে। নিজের কাজে গাফিলতি নেই তাতায়েভের।

রাতে সম্ভব না হলে দিনের নির্ধারিত সময় রেডিওর সামনে কাগজ কলম নিয়ে বসে থাকে সে। এক দিনও বাদ দেয়নি। কিন্তু উত্তর এল না আজও। বিকল্প চালান হাতে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না সে।

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার হঠাৎ। আসছে! উত্তর আসছে, কল সাইন শুনতে পেয়েছে সে। ঘড়ি দেখল তাতায়েভ—বারোটা দশ। কলম তুলে নিল তাতায়েভ। প্রস্তুত। পর পর দু'বার কল সাইন, তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে শুরু হলো সঙ্কেত বার্তা। মোর্স সঙ্কেত। ঝটপট লিখে ফেলল সে ওটা, সরাসরি ইংরেজিতে।

তাতায়েভ নিশ্চিত, ব্রিটিশ, মার্কিন এবং জার্মান লিসনিং পোস্টগুলোও এতক্ষণে লিখে নিয়েছে বার্তাটা। কিন্তু তাতে চিন্তার কিছু নেই। কোড জানা না থাকলে এ আর কারও পক্ষে ডিসাইফার করা কোনমতেই সম্ভব নয়। সেট অফ করে ওয়ান টাইম প্যাড নিয়ে লেগে পড়ল ভ্যালেরি তাতায়েভ। পনেরো মিনিট ব্যয় হলো তার বার্তার অর্থ উদ্ধার করতে। যা এরকম ঃ ফায়ারবার্ড টেন রিপ্লেসিঙ টু আর ভিটি।

আর ভি অর্থ রঁদেভু। টি বিশেষ একটি স্থানের নাম। একটা এয়ারপোর্ট হোটেল। হোটেল পোস্ট হাউস, হিথ্রো। ঝামেলা! ভাবল তাতায়েভ। কুরিয়ার দশ এবং সাতের সঙ্গে খুব কম সময়ের ব্যবধানে সাক্ষাৎ করতে হবে ওকে। প্রথমটির সঙ্গে সকাল সাতটায়, হিথ্রোয়, এবং সাতের সঙ্গে সকাল এগারোটায়। কলচেস্টারে।

এর মধ্যে এত পথ অতিক্রম করা কঠিন হবে। তবে পঙ্খিরাজটির ওপর বেশ আস্থা আছে ভ্যালেরি তাতায়েভের। ঠিক সময় জায়গামত গিয়ে হাজির হতে পারবে সে, নিজেকে আশ্বস্ত করল মেজর। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, ঠিক চারটের সময় ঘুম ভাঙা চাই। কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করল তাতায়েভ, কানের ভেতর দিয়ে অবচেতন মনে পৌঁছে দিল বার্তাটা। মুহূর্তে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমের কোলে। ডান হাত বালিশের নিচে, আলতো করে ধরে রেখেছে সাকো অটোমেটিক।

কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় ঘুম ভাঙল তার। হালকা নাশতা এবং এক কাপ চা খেয়ে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল তাতায়েভ। পোস্ট হাউস হোটেলে পৌঁছল সে ছয়টা পঁয়তাল্লিশে। মোটর সাইকেল পার্ক করে লেদার জ্যাকেট ও জিপ সাইডেড ট্রাউজার খুলে ফেলল ভ্যালেরি। নিচে সাধারণ ফ্ল্যানেলের স্যুট পরেই এসেছে। এক পেনিয়ারে ওগুলো ভরল সে। ওটা বন্ধ করে দ্বিতীয়টা খুলে বের করল একজোড়া জুতো। জ্যাকবুট খুলে ওটায় ভরে রাখল, পায়ে দিল জুতো।

পা বাড়াল হোটেল রিসেপশনের দিকে।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি লুইস্ ইয়ারজেলস্কির। কারণ দীর্ঘ চাকরি জীবনে গতকাল সন্ধেয় প্রথম বড় ধরনের একটা ঝাঁকি খেতে হয়েছে তাকে। এমনটি ঘটতে পারে কখনও চিন্তাই করেনি সে। পোলিশ বিমান সংস্থা 'লট'-এর সিনিয়র স্টুয়ার্ড ইয়ারজেলস্কি। হিথ্রোর ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসে্র সবার খুবই পরিচিত সে। আগে কখনও তার ব্যাগেজ খুলেও দেখেনি ওরা।

কিন্তু কাল দেখেছে। শুধু তার নয়, প্রত্যেকের। তাও আবার যেমন-তেমন দেখা নয়। ব্যাগের সবকিছু বের করে, ফেলে-ছড়িয়ে বিচ্ছিরি এক

কাণ্ড করেছে ওরা। পরিচিত বলে খাতির করেনি বিন্দুমাত্র। তারওপর একেকজনের সে কী চাউনি! সে সময়ে ইয়ারজেলস্কির বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল যে লোকগুলো ওর অনেকদিনের চেনা, এবং তাকেও খুব ভাল করে চেনা আছে ওদের।

কাস্টমসের একজন যখন হাত ঢুকিয়ে দিল তার ব্যাগে, ইয়ারজেলস্কির মনে হলো যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। মুহূর্তে মুখ ভরে উঠেছিল টক টক পানিতে। খানিক পর যখন আসল জিনিস বের করল লোকটা, মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল সে আরেকটু হলে। ওটা ছিল একটা ইলেক্ট্রিক রেজর। ওয়ারশ ত্যাগ করার ঘণ্টাখানেক আগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা ভরে দিয়েছিল তার ব্যাগে। ওটা নিয়ে কি করতে হবে লণ্ডন পৌঁছে, তাও তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ভাগ্য ভাল যে জিনিসটা ব্যাটারি চালিত বা রিচার্জেবল্ মডেলের নয়। এবং ধারেকাছে কোন প্লাগ পয়েন্টও ছিল না যে চালু করে ওটার কার্যকরিতা পরীক্ষা করে দেখবে লোকটা। ওই জন্যেই বেঁচে গেছে লুইস ইয়ারজেলস্কি। নইলে হয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা, দেখতে রেজরের মত হলেও ওটা আদৌ তা নয়। অন্ করা হলে ঠিকই ধরে ফেলত কাস্টমস যে একটা কিছু গণ্ডগোল আছে ওটায়।

ঠিক সাতটায় রিসেপশনে ঢোকার আগে, হাতের বাঁ দিকে, হোটেলের পাবলিক বাথরূমে ঢুকল এসে সিনিয়র স্টুয়ার্ড। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যানেলের স্যুট পরা এক ইংলিশম্যানকে হাত ধুতে দেখে কপাল কোঁচাকাল সে। ড্যাম! কন্ট্যাক্ট যদি এসে পড়ে এখন, ও ব্যাটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে। কি করবে ভাবছে ইয়ারজেলস্কি, এই সময় কথা বলে উঠল ইংলিশম্যান।

'মর্নিং। আপনার ইউনিফর্মটা কি ইয়োগোস্লাভ এয়ারলাইনের?'

চমকে গেলেও নিজেকে সামলে নিল স্টুয়ার্ড দ্রুত। স্বস্তির নিঃশ্বাস

ছেড়ে বলল, 'না। এটা পোলিশ ন্যাশনাল এয়ারলাইনের।'

'দারুণ এক দেশ পোল্যাণ্ড,' হাত মুছতে মুছতে বলল যুবক। কোনরকম টেনশনের বালাই নেই তার মধ্যে। হাসি হাসি, অত্যন্ত সপ্রতিভ চেহারা। 'কিছুদিন ছিলাম আমি আপনাদের দেশে। বড় সুখের ছিল দিনগুলো।'

বড় সুখের ছিল দিনগুলো, আপনমনে মাথা দোলাল ইয়ারজেলস্কি। ঠিক এই কয়টা শব্দই শুনতে চাইছিল সে। রেজরটা বের করে এগিয়ে দিল যুবকের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই থতমত খেয়ে গেল তাকে কটমট করে তাকাতে দেখে। চট্ করে ফিরিয়ে নিল হাত। মাথা দুলিয়ে তাকে একটা দরজা বন্ধ বুদ দেখাল যুবক। বুঝে ফেলল স্টুয়ার্ড। ওর ভেতরে কেউ আছে, তাই সতর্ক হতে বলছে।

মুখ ঘুরিয়ে যে ওয়াশবেসিনের সামনে সে দাঁড়িয়ে, সেটার কাঁচের শেলফটা দেখাল ইংলিশম্যান। ওর ওপর রাখতে বলছে সে জিনিসটা। তাই করল স্টুয়ার্ড। এবং যুবকের আরেক চোখে শাসানি ও ইঙ্গিত দেখে তাড়াতাড়ি প্যান্টের জিপ্ খুলে দাঁড়িয়ে গেল ইউরিনালের সামনে। পাঁচ আঙুল তুলে দেখাল যুবক। অর্থাৎ পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলছে তাকে এখানে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ইয়ারজেলস্কি। বলল, 'ধন্যবাদ। পোল্যাণ্ড সত্যিই খুব সুন্দর দেশ।'

কথাটা শোনেনি বোধহয় যুবক, ভাবল স্টুয়ার্ড। তার আগেই রেজর নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে এম টুয়েলভ মোটরওয়েতে পৌঁছে গেল তাতায়েভ। উড়ে চলেছে উত্তর-পুব লণ্ডনের এসেক্স কাউন্টি বর্ডারের দিকে। আটটা বেজে কয়েক মিনিট তখন।

হারউইচের পার্কস্টোন কী-র জেটিতে এসে ভিড়ল 'টর ব্রিটানিয়া' ফেরি।

ওটা গোথেনবার্গ থেকে এসেছে। এ ফেরির যাত্রী সাধারণত ট্যুরিস্ট, ছাত্র, কমার্শিয়াল ভিজিটর। ওটা ভিড়তে দল বেঁধে নেমে এল সবাই। ওর মধ্যে স্টিগ লাণ্ডভিস্ট নামে এক কমার্শিয়াল ভিজিটর রয়েছে। নিজের স্যাব সেলুন কার নিয়ে এসেছে লোকটি।

তার কাগজপত্র বলছে সে একজন সুইডিশ ব্যবসায়ী। কথাটা মিথ্যে নয়। একদম সত্যি। আরও সত্যি যে সে একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট এজেন্ট। কথাটা অবশ্য কাগজপত্রে উল্লেখ করতে ভুলে গেছে সে দেশের কর্তৃপক্ষ। আসলে জানার কোন উপায় নেই যে স্টিগকে কমিউনিস্ট পার্টির অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে সুইডিশ সরকার অনেক আগেই। এবং পুলিসের তাড়া খেয়ে পুব জার্মানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। বর্তমানে এইচভিএ-র এজেন্ট সে।

গাড়ি থেকে নামার অনুরোধ করা হলো তাকে। বলা হলো সঙ্গের লাগেজ নিয়ে এক্সামিনেশন বেঞ্চে আসতে। তাই করল স্টিগ লাণ্ডভিস্ট। মুখে অমায়িক হাসি। এদিকে তার লাগেজ চেকিঙ চলছে, ওদিকে আরেক কাস্টমস অফিসার গিয়ে তার সেলুনের এঞ্জিন কভার তুলে ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা দেখতে লাগল। একটা চকচকে স্টীলের বল বা রডের মত দেড় ফুট দীর্ঘ পাইপ ধরনের কিছু একটা খুঁজছে সে। এঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের ভেতর কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকতে পারে জিনিসগুলো। কিন্তু নেই।

এবার গাড়ির তলা দেখল লোকটা। তারপর পিছনের বুট। সাধারণ টুল কিট্ এবং একটা ছোট ফায়ার এক্সটিঙগুইশার ছাড়া ওখানেও কিছু নেই। ব্যাগেজ তল্লাশি শেষ সুইডিশের। স্যুটকেস দুলিয়ে হৃষ্টচিত্তে গাড়ির কাছে ফিরে এল সে।

'সব ঠিক আছে, অফিসার?' বিনয়ী কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ, স্যার। এনজয় ইওর স্টে।'

এক ঘণ্টা পর কলচেস্টারের দক্ষিণে লেয়ের-ডি-লা-হে নামে খুদে এক গ্রামে কিংস ফোর্ড পার্ক হোটেলের কার পার্কে এসে থামল স্টিগ লাণ্ডভিস্টের স্যাব সেলুন। মিড মর্নিং কফি পানের সময় এটা। পার্কে বেশ কিছু গাড়ি রয়েছে। তবে মানুষ নেই কোনটিতে। সবাই ভেতরে পানাহারে ব্যস্ত।

ঘড়ি দেখল লাণ্ডভিস্ট। সময় হয়নি এখনও। আরও পাঁচ মিনিট বাকি। তবে ওই সময়েই যে মুক্তি পাবে সে এমন কোন কথা নেই। ওর পরেও পাক্কা এক ঘণ্টা সময় থাকবে চূড়ান্ত সময়সীমায় পৌঁছতে। যদি লোকটা তার মধ্যে আসে, ভাল। নইলে নতুন স্থান, নতুন সময় নির্ধারণ করে দেবে হউপট ভেরওয়ালটাঙ অউফক্লারাঙ।

লোকটা কি আসবে? আপনমনে ভাবছে লাণ্ডভিস্ট, কখন আসবে? চারদিকে ভাল করে তাকাল সে আবার। পিছনদিকে, পার্কের একেবারে ও প্রান্তে এক মোটর সাইক্লিস্টকে দেখতে পেল সুইডিশ, স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করাচ্ছে নিজের বিশাল বিএমডব্লিউ। মুখ ঘুরিয়ে সিগারেট ধরাল লাণ্ডভিস্ট। যার আসার কথা, সে দেখতে কেমন জানা নেই তার।

. কেমন লোকটা? কোন দেশী? ঠিক এগারোটায় কাঁচের জানালায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনে চমকে ঘুরে তাকাল ব্যবসায়ী। মোটর সাইক্লিস্ট! বোতাম চেপে কাঁচ নামিয়ে দিল সে।

'আপনার নাম্বার প্লেটের "এস" কি সুইডেন মীন করে? না, সুইটজারল্যাণ্ড?' প্রশ্ন করল আগন্তুক।

চওড়া হাসি ফুটল লাণ্ডভিস্টের মুখে। বাঁচলাম! 'সুইডেন। গোথেনবার্গ থেকে আসছি আমি।'

'যাইনি কখনও ওদেশে।'

আসন ছাড়ার প্রয়োজন হলো না ব্যবসায়ীর। আসল জিনিস, অগ্নি

নির্বাপক যন্ত্রটা এখানে পৌঁছার আগে পথে গাড়ি থামিয়ে পাশের সীটে এনে রেখেছিল সে একটা হেসিয়ান ব্যাগে পুরে। ব্যাগটা চালান করে দিল সে ঝটপট। পেনিয়ারে ভরল তাতায়েভ ওটা। এক ঘণ্টা পর থেটফোর্ডে নিজের লক্ আপ গ্যারাজে পৌঁছল সে। চালান দুটো ফ্যামিলি সেলুনের বুটে ভরে ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল ইপসউইচের পথে।

বিকেল তিনটের দিকে আগেরগুলোর সঙ্গে ক্লোদস চেস্টে স্থান পেল দুইয়ের বিকল্প দশম ও সপ্তম চালান।

অসটেণ্ড থেকে দীর্ঘ যাত্রা সেরে ফকস্টোন জেটিতে ভিড়তে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন বোঝার ভারে ডুবু ডুবু 'কুইন এলিজাবেথ'। পায়ে হাঁটা ট্যুরিস্টের দঙ্গল ও হালকা গাড়ির ভারমুক্ত হতে সময় লাগল এক ঘণ্টারও বেশি। এরপর রয়েছে অসংখ্য দৈত্যাকার টিআইআর জাগারনাট। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, ইইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কার্গো বহন করে এগুলো।

ওর মধ্যে সাতটা জার্মানিতে রেজিস্টার্ড। প্রচণ্ড শক্তিধর হ্যানোমাগ রিগ, পিছনে বিশ ফুট দীর্ঘ কন্টেইনারবাহী আঠারো চাকার ট্রেইলার। প্রতিটির ক্যাবের পিছনে, দু পাশে দুটো করে ভার্টিক্যাল এগজস্ট পাইপ রয়েছে আকাশমুখি। এঞ্জিনের গর্জনের সঙ্গে তাল রেখে ধোঁয়া ছুঁড়ছে ওপরে। একেকটা ছাড় করাতে পনেরো বিশ মিনিট করে ব্যয় হলো। ব্রিটিশ ব্রেকফাস্ট টেবিলের জন্যে তৈরি জার্মান কফি মেশিন নিয়ে এসেছে ওগুলো।

হুঙ্কার ছেড়ে কাস্টমস শেড থেকে এক এক করে বেরিয়ে এল জাগারনাটগুলো। রওনা দিল অ্যাশফোর্ড হয়ে লণ্ডনের পথে। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, ওরই একটার এগজস্ট পাইপের ভেতরে, তলার দিকে

ফিট্ করা আছে আরেকটা বাই-পাস পাইপ। হিট্ প্রুফ কাপড়ের প্যাড দিয়ে মোড়া। আঠারো ইঞ্চি লম্বা ওটা, অবিশ্বাস্য ওজন।

রাত ন'টার দিকে কেন্টের লেনহ্যাম পৌঁছল রিগটা। রাস্তার পাশে ওটা দাঁড় করিয়ে ক্যাবের ছাদে উঠে এল ড্রাইভার। এগজস্ট পাইপ ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল সে, তারপর ভেতরে হাত চালিয়ে বের করে আনল প্যাড মোড়া পাইপটা। একটু পরই এল সে আঁধার ফুঁড়ে। কালো পোশাক পরা এক মোটর সাইক্লিস্ট। দু'চারটা বাক্য বিনিময় হলো দুজনের। তারপর পাইপটা তার হাতে তুলে দিল জাগারনাট চালক।

আট নম্বর চালান ছিল ওটা।

দু'হাতে রুক্ষ চুল মুঠো করে ধরে বসে আছে মাসুদ রানা। মুখ নিচু করে ফ্লোরের দিকে চেয়ে আছে। গর্তে বসে যাওয়া লাল চোখের দৃষ্টি খ্যাপাটে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সব মিলিয়ে উদভ্রান্ত চেহারা। মেজর ন্যাশনাল অ্যালার্ট ঘোষণা ছাড়া ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস যতদূর সম্ভব করছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই ওর।

ওদেরও এরচেয়ে বেশি কিছু করার নেই। ট্যুরিস্ট ও যানবাহনের নিত্য স্রোত ঠেকিয়ে দিয়ে যদি থরো সার্চের নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন হয় কখনও, সেক্ষেত্রে মেজর ন্যাশনাল অ্যালার্ট ঘোষণা করার নিয়ম আছে, যা জরুরী অবস্থার পর্যায় পড়ে। তেমন কিছু করতে গেলে প্রাণস্পন্দন থেমে যেত দেশের। কারণ রোজ যে পরিমাণ ট্যুরিস্ট চারদিক থেকে ব্রিটেনে প্রবেশ করে থাকে, তা রীতিমত বিস্ময়কর।

ওই জাতীয় কিছু করতে গেলে সামরিক বাহিনীকেও পথে নামাতে হত। কিন্তু মাসুদ রানা তা চায়নি। গোপন সূত্রে পাওয়া হুমকির মোকাবেলা করতে চেয়েছিল ও গোপনেই। কিন্তু ব্যর্থ হতে বসেছে ওর

পরিকল্পনা। নাকি হয়েই গেছে? সবগুলো চালান ঢুকে পড়েছে এরই মধ্যে? অনুশোচনা হচ্ছে এখন ওর। কেন এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে গেল?

আশঙ্কা হচ্ছে, সর্বনাশটা বুঝি শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারবে না রানা। ওর অনুরোধে মিডল্যাণ্ডের সবগুলো ইঙ্গ-মার্কিন বিমানঘাঁটির তালিকা ম্যাপ ইত্যাদি সেদিনই যোগাড় করে দিয়ে গেছেন স্যার লংফেলো। তিনটে ঘাঁটি আছে। রেনডেলহ্যাম ফরেস্ট, ওয়াঙফোর্ড ও সেইন্ট এডমাণ্ডস্-এ। এর যে কোন একটিই মস্কোর নিশানা। কিন্তু কোনটি? ধরা যাক, রেনডেলহ্যাম ঘাঁটি। কিন্তু যে ঘটাবে কাজটা, সে কোথায় লুকিয়ে আছে কি করে বুঝবে মাসুদ রানা? লোকটি যে কে, তাও তো জানতে হবে।

এতদিন এসব নিয়ে ভাবেনি ও। মনে করেছিল কয়েকটা চালান আটকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে কেজিবির স্পাইটিকে। ব্যর্থ হয়ে এক সময় বাধ্য হয়েই দেশে ফিরে যেতে হবে তাকে। কিন্তু তা বোধহয় আর হলো না। যতই নিজেকে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করুক, মন মানছে না। দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে আছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রথমে রাহাত খান ও পরে মাসুদ রানাকে কথা দিয়েছিলেন এ নিয়ে তেমন কোন উচ্চবাচ্য করবে না ব্রিটেন। সে যে ভেতরের ব্যাপার টের পেয়ে গেছে, বুঝতেই দেবে না মস্কোকে। তারপর নির্বাচন শেষ করেই টপাটপ্ জেলে পোরা হবে লেবার পার্টির লেফ্টিস্ট উইঙের মাথাগুলোকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ করেই বেজে উঠল টেলিফোন। মুখ তুলল মাসুদ রানা। রিসিভার কানে লাগাল। 'ইয়েস?'

'রানা!'

দূরাগত ভরাট কণ্ঠের ডাকটা দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি

করল ওর। ঝট্ করে সিধে হয়ে বসল রানা। 'স্যার!'

'রানা! কেমন আছ তুমি?' অদ্ভুতরকম নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'না, স্যার। ভাল না।'

'আমি বুঝি। ভাল কোন খবর হলে তুমি নিশ্চয়ই জানাতে আমাকে।'

'এখনও কিছুই করতে পারলাম না, স্যার,' কণ্ঠে হতাশা চাপা থাকল না রানার।

'রানা, তুমি কি হাল ছেড়ে দিয়েছ?' প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ চাবুকের মত সপাং করে আছড়ে পড়ল যেন কানের পর্দায়। টের পেল রানা, বৃদ্ধের কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে উঠেছে।

'জ্বি না, স্যার। কিন্তু...'

'হাল ছেড়ো না, রানা। হতাশ হয়ো না। তোমার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমার। আমি জানি তুমি পারবে। তুমি ন্যায়ের পক্ষে আছ, ওরা অন্যায়ের পক্ষে। কথাটা মনে রাখবে প্রতি মুহূর্তে। বুকে বল পাবে তাহলে। মনের জোর বেড়ে যাবে,' ঠিক যেন কোন বাচ্চা ছেলেকে পরীক্ষার আগে আদর করে মন দিয়ে লেখাপড়া করার ব্যাপারে বোঝানো হচ্ছে, এমনভাবে বললেন তিনি কথাগুলো।

'জ্বি, স্যার।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, বুঝলে? সমস্যার বিরুদ্ধে আঁটঘাট বেঁধে লাগতে পারলে ভয় পেয়ে সমস্যাই পিছিয়ে যায়। লেগে থাকো। কাজ হবে। হতেই হবে কাজ।'

আশ্চর্য! ভেতরের সমস্ত হতাশা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। মনের জোর হাজার গুণ বেড়ে গেল রানার। 'জ্বি, স্যার। লেগে আছি আমি। সুযোগের অপেক্ষায় আছি।'

'গুড! এখন রাখি তাহলে। দোয়া করি. সফল হও।'

আট

ওইদিনই অন্তরের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো মাসুদ রানার। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হলো সুযোগ।

ভিয়েনা থেকে ছেড়ে আসা অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইনসের একটি বিমান হিথ্রো অবতরণ করল বিকেল চারটে দশে। নিয়ম অনুযায়ী ইমিগ্রেশন ডেস্ক অতিক্রম করতে লাগল যাত্রীরা। তিনটে ইমিগ্রেশন ডেস্ক। একটা ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্যে, একটা ইইসি দেশসমূহের নাগরিকদের জন্যে এবং শেষেরটা নন্-ইউকে, নন্-ইইসি ডেস্ক।

শেষ ডেস্কটির সামনে এসে দাঁড়াল এক মাঝবয়সী লোক। আটত্রিশ-চল্লিশ বছর হবে বয়স। লম্বা পাঁচ ফুট আট। নীল চোখ। খাঁজ কাটা থুতনি। চেহারা সুরত সব মিলিয়ে মন্দ নয়। কিন্তু ঝামেলা বাধিয়েছে চুল। ভীষণ পাতলা মাথার চুল। খুলির প্রায় পুরোটাই দেখা যায় ওর ভেতর দিয়ে। একটা গ্রিপ ছাড়া আর কোন লাগেজ নেই তার সঙ্গে।

তার পাসপোর্টের ওপর শকুন দৃষ্টি বোলাতে আরম্ভ করল ইমিগ্রেশন অফিসার। লোকটাকে কেন যেন পছন্দ হয়নি তার। পরিচিত নীল প্লাস্টিক মোড়া পাসপোর্ট। ওপরে এমব্লেম্ করা সোনালি ঈগল। বেশিদিন হয়নি ইস্যু করা হয়েছে। কভার ওল্টাল অফিসার। ফ্রানজ ওসনিয়াক লোকটার নাম। পেশা ব্যবসা। পাসপোর্টের নাম্বারটা সামনের কম্পিউটরে ফিড

করল অফিসার।

কিছু একটা ঘটে গেল ডিসপ্লে স্ক্রীনে। শক্ত হয়ে গেল অফিসার। যদিও ওসনিয়াককে টের পেতে দিল না সে কিছু। বরং সন্তুষ্ট হওয়ার ভান করে মাথা দোলাল। 'ধন্যবাদ, স্যার। আনন্দের হোক আপনার ব্রিটেন সফর। নেক্সট, প্লীজ!'

ওসনিয়াক সামনে থেকে সরে যেতেই মুখ তুলল অফিসার। সরাসরি সামনের দিকে তাকাল। দশ-বারো গজ তফাতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের দুই পোর্টার দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হলো। একটা চোখ টিপল অফিসার, মুখ ঘুরিয়ে আবছাভাবে ইঙ্গিত করল অস্ট্রিয়ানের উদ্দেশে। অলস ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল দুই পোর্টার। তারপর পা বাড়াল লোকটার পিছন পিছন। ওদের একজন রানা এজেন্সির ব্রায়ান হারকোর্ট স্মিথ, অন্যজন বিএসএসের হ্যারি নিগেল।

কয়েক পা এগোতেই ডানে ল্যাভেটরি। চট্ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল স্মিথ। কেউ নেই ভেতরে। নিশ্চিত হয়ে পকেট থেকে ছোট, শক্তিশালী একটা কমিউনিকেটর বের করে খুব দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল সে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, বেরিয়ে এসে যোগ দিল স্মিথ হ্যারির সঙ্গে। ফ্রানজ ওসনিয়াক তখন কনকোর্সের শেষ মাথায় মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাচ্ছে। টেরও পেল না ওপরের ব্যালকনি থেকে টপাটপ্ চার পাঁচটা ছবি তুলে নেয়া হলো তার এই ফাঁকে।

আচমকা যেন ঢিল পড়েছে মৌচাকে। স্মিথের নির্দেশে এয়ারপোর্টে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও চারজন সহকারী যোগ দিল ওদের সঙ্গে। ফ্রানজ ওসনিয়াককে চারদিক থেকে ঘেরাও করে এগোতে থাকল দলটা। দু'নম্বর টার্মিন্যাল ভবনের সামনের র‍্যাঙ্ক থেকে ট্যাক্সি চাপল অস্ট্রিয়ান। তিনটে গাড়িতে ভাগ ভাগ হয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে লোকটাকে অনুসরণ করতে লাগল ওরা ছয়জন।

বেজওয়াটারের সাসেক্স গার্ডেন ও এজওয়্যার রোডের সংযোগস্থল প্যাডিংটনে ট্যাক্সি ত্যাগ করল ওসনিয়াক। বি অ্যাণ্ড বি, বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট বোর্ডিং হাউস আছে এখানে অনেকগুলো। এ বোর্ডিং ও বোর্ডিং ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল অস্ট্রিয়ানকে, তার মানে রিজার্ভেশন নেই লোকটার। অবশেষে একটার জানালায় 'রুম খালি' নোটিশ ঝুলতে দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

আশ্রয় জুটেছে ব্যাটার, ভাবল স্মিথ। পাশে বসা নিগেল হ্যারিকে বলল, 'তুমি ওটার ব্যাক ডোরের ওপর নজর রাখো। আমি কথা বলছি চীফের সাথে।' বিনা বাক্য ব্যয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। ঘড়ি দেখল স্মিথ। এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেছে ওরা এক ঘণ্টা আগে। আর দেরি না করে যোগাযোগ করল সে মাসুদ রানার সঙ্গে।

'একটার খোঁজ বোধহয় পাওয়া গেছে, চীফ।'

'হোয়াট!' লাফিয়ে উঠল রানা। 'কোথায়?'

'প্যাডিংটনের এক বোর্ডিং হাউসে ঢুকেছে এসে। আমরা আছি পাহারায়।'

'কোন্ দেশী?'

'অস্ট্রিয়ান। নাম ফ্রানজ ওসনিয়াক।'

'ওকে সন্দেহ করার কারণ?'

'পাসপোর্টে গোলমাল আছে। রেড লাইট শো করেছে কম্পিউটার।'

'ছবি তোলা হয়েছে?' উত্তেজনায় ফ্যাঁসফেঁসে শোনাচ্ছে রানার কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। এতক্ষণে মামির হাতে পৌঁছেও গেছে হয়তো।'

'অল রাইট। আমি যাচ্ছি মামির ওখানে। ক'জন আছ তোমরা?'

'ছয়জন।'

'গুড। আর, স্মিথ! ওয়েলডান। রাখছি। যোগাযোগ রেখো।'

'রাইট, চীফ।' কমিউনিকেটর রেখে বোর্ডিঙ হাউসের দিকে নজর দিল ব্রায়ান হারকোর্ট স্মিথ। সন্ধে হয়ে এসেছে। কোন ঘটনা ছাড়াই মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে। দশ মিনিট পর পর অন্যদের সঙ্গে কথা বলছে স্মিথ। তার নির্দেশে অন্য চারজন আরও আগেই বেরিয়ে পড়েছে গাড়ি ছেড়ে।

বোর্ডিঙ হাউসের সামনের রাস্তার ওপারে দু'জন আর এপারে দু'জন রয়েছে তারা। সবার সঙ্গেই রয়েছে একটি করে কমিউনিকেটর। আশায় আশায় রয়েছে, কিছু একটা করবে ফ্রানজ ওসনিয়াক। কিন্তু করছে না। কিছুই করছে না লোকটা। একসময় প্রতীক্ষার অবসান ঘটল ওদের। ঠিক সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এল অস্ট্রিয়ান। গা ছাড়া ভঙ্গিতে এজওয়্যার রোডের সাধারণ মানের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল। সাপার সারল ধীরেসুস্থে। ওখান থেকে বেরিয়ে আবার বোর্ডিঙ হাউস।

পথে কারও সঙ্গে কথা হয়নি ওসনিয়াকের। তুলে দেয়নি কিছু কারও হাতে, নেয়ওনি কিছু কারও কাছ থেকে। তবে দুটো কাজ করেছে সে যা তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত করে তুলেছে ওদেরকে। রেস্টুরেন্ট যাওয়ার পথে একটা দোকানের শো-কেসের কাঁচে চোখ রেখে পিছনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা কয়েক সেকেণ্ড। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছে বোর্ডিঙ হাউস পর্যন্ত। যখন নিশ্চিত বুঝেছে ওসনিয়াক যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, সোজা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকেছে। খাওয়ার সময় পাশের টেবিলে কফি পানরত ব্রায়ান স্মিথের দিকে একবার ভুলেও তাকায়নি লোকটা।

খাওয়া সেরে বেরিয়ে এসে আরেক খেল্ দেখিয়েছে লোকটা। রেস্টুরেন্ট আর বোর্ডিঙ হাউসের মাঝামাঝি পৌঁছে হাণ্ড্রেড মিটার স্প্রিন্ট দেয়ার মত আচমকা এক দৌড়ে রাস্তা অতিক্রম করে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে উঠেই কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেছে পিছনে, আর কেউ স্প্রিন্ট দেয়

কি না বোঝার জন্যে। কিন্তু তেমন কেউ ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। ওসনিয়াক যখন সম্ভাব্য অনুসরণকারীকে পিছনে খুঁজছে, তারা তখন ওপারেই, তার দশ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খোঁজার ভান করছে।

'শালারা আধুনিক কায়দা আর কবে শিখবে!' আপনমনে হেসেছে স্মিথ।

ওদিকে বিএসএস রেকর্ড অফিসে বসে ছটফট করছে মাসুদ রানা। আসার সময় গিলটি মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কাজে লাগতে পারে ভেবে। খবর পেয়ে স্যার লংফেলোও এসেছেন একটু আগে। এনসাইক্লোপেডিক মেমোরির অধিকারী পঁয়ষট্টি বছরের মিস ডরোথির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে ওরা। বৃদ্ধা সবার কমন মামি।

অন্য সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির তুলনায় বিএসএসের রেকর্ডরুমই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। এর সবচেয়ে বড় অংশটির নাম অ্যালবাম সেকশন। এমন কোন ব্যক্তি; যাকে বিদেশী এজেন্ট বা স্পাই হতে পারে বলে সন্দেহ হবে, পৃথিবীর সব গোয়েন্দা সংস্থাই ছবি তুলে রাখে তার সুযোগমত। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা হয় ছবিগুলো। সন্দেহ সত্য হোক, না হোক, প্রতি বছর অমন হাজার হাজার ছবি তুলে থাকে তারা। সব সময় সন্দেহভাজনদের ছবিই তোলা হয়, ব্যাপারটা তাও নয়। যার খুশি তারই ছবি তোলে ওরা।

এর কোনটিই ফেলে দেয়া হয় না। সযত্নে তুলে রাখা হয় অ্যালবাম সেকশনে। কে জানে কখন কোনটির প্রয়োজন দেখা দেবে। বিদেশী ডিপ্লোম্যাট, ট্রেড ডেলিগেটের সদস্য, সাইন্টিফিক অথবা কালচারাল ডেলিগেটের সদস্য, এদের ছবি তোলা হয় বেশি। কোন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা মহিলার সর্বোচ্চ ষাটটি পর্যন্ত ছবিও রয়েছে ব্রিটিশ অ্যালবাম সেকশনে। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে—সময়ে তোলা।

এছাড়া সংস্থাগুলোর আন্তঃদেশীয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিময় চুক্তির ফলেও এক সংস্থা অন্য সংস্থার কাছ থেকে প্রচুর ছবি পেয়ে থাকে প্রতি বছর। কখনও হয়তো কোন সোভিয়েত ট্রেড ডেলিগেশন গেল ক্যানাডা সফরে। তাতে রয়েছে হয়তো ইভানভ। সন্দেহভাজন। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস অবিলম্বে তার ছবি পাঠিয়ে দেবে ওয়াশিংটন, লণ্ডন ও অন্যান্য ন্যাটো মিত্রদের কাছে। সযত্নে ছবিটা সংরক্ষণ করা হবে।

হয়তো পাঁচ বছর পর কোন এক এশিয়ান অথবা আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিক হিসেবে দেখা যাবে তাকেই। কিন্তু তখন তার নাম কজলভ। এসব ক্ষেত্রে ইভানভ বা কজলভ বা আর যা-ই হোক লোকটির নাম, তার ছবির নিচে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্যাপশন হয় 'ফুল টাইম কেজিবি হুড'। সোভিয়েত এবং তার মিত্রদের বেলায় বিএসএস অত্যন্ত হুঁশিয়ার। এদের রুশ বা ইস্ট ব্লক স্পাই অথবা সম্ভাব্য স্পাইয়ের ছবির আর্কাইভ দেখলে মাথা ঘুরে যাবে যে কারও। এভারেস্ট সমান তার অ্যালবামের পাহাড়।

এর অর্ধেক সংগ্রহও যাদের নেই, তারা পর্যন্ত যেখানে সদ্য তোলা কারও ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্যে তার অতীতে তোলা কোন ছবি আছে কি না খুঁজে বের করতে কম্পিউটরের শরণাপন্ন হয়, সেখানে বিএসএস শরণাপন্ন হয় মিস্ ডরোথির। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধার। অদ্ভুত তার স্মরণশক্তি।

নাকের আকার, চোয়ালের গঠন, থুতনির কাটা দাগ, গালের তিল কি আঁচিল, ঠোঁটের বাঁক, চোখের আকার, গ্লাস অথবা সিগারেট ধরার ভঙ্গি, বা অস্ট্রেলিয়ার কোন পাবে হাসতে গিয়ে বেরিয়ে পড়া বাঁধানো দাঁত, একবার দেখলেই মুখস্থ হয়ে যায় বৃদ্ধার। জীবনেও ভোলে না।

ফ্রানজ ওসনিয়াকের ছবিগুলো পাশাপাশি বিছিয়ে চেয়ে আছে মামি।

কপালের কোঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকে আছে। ভেতরে অস্থিরতা থাকলেও তা চেপে রেখেছে সামনে বসা তিনজন। ঝাড়া এক ঘণ্টা পর দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল বৃদ্ধা, 'ফার ইস্ট!' উঠে গিয়ে একটা র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল। মিনিট পাঁচেক খোঁজাখুঁজি করে বের করে আনল প্রয়োজনীয় অ্যালবাম।

ফ্রানজ ওসনিয়াকের একটা ছবি বের করল মামি ভেতর থেকে। পাঁচ বছর আগে তোলা। তখন তার চুল অনেক ঘন ছিল। কোমর ছিল সরু। টোকিওর ভারতীয় দূতাবাসের এক পার্টিতে হাসিমুখে আলাপ করছে আরেকজনের সঙ্গে।

'চেক,' ঘোষণা করল মিস ডরোথি। 'পাঁচ বছর আগে টোকিওর চেক দূতাবাসের লো-লেভেল এজেন্ট ছিল। নাম জিরি হেইক।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার; খুশিতে না কিসে ঠিক বোঝা গেল না।

পরদিন সকাল এগারোটায় আবার বোর্ডিঙ হাউস ত্যাগ করল ফ্রানজ ওসনিয়াক। তার ওপর নজর রাখার জন্যে গিলটি মিয়াসহ রানা এজেন্সির সাতজন ওয়াচার রয়েছে এ মুহূর্তে। রাতে লোকটার আসল পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিল মাসুদ রানা। কিন্তু বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ওসনিয়াককে আর বেরোতে দেখা গেল না, তখন ফিরে গিয়েছিল ও সকালে আসার কথা বলে। যদি না এর মাঝে আসার প্রয়োজন পড়ে।

স্মিথ-হ্যারি ও অন্যদের বদলে রাতের পাহারাদারীর জন্যে এসেছিল আরেক দল। সে সময়ও থেকে গিয়েছিল গিলটি মিয়া রানার নিষেধ অমান্য করে। রাতে বিশ্রাম নিয়ে সকালে আসার কথা বলেছিল ওকে রানা।

'কাজের সোমায় আবার কিসের বিশ্রাম?' উত্তর দিয়েছিল গিলটি

মিয়া। 'চিন্তায় আমার ঘুম হবে ভেবেচেন? মাজরাতে উটে যদি ব্যাটা ন্যাজ তুলে পালায়, তকন?'

গাড়িতে বসেই রাত কাটিয়েছে গিলটি মিয়া। চোখ ছিল বোর্ডিং হাউসের দরজায়, ব্যাটা ন্যাজ তুলে পালায় কি না দেখার জন্যে। সকালে রাতের দল বিদেয় নিয়েছে, এসেছে কালকের দল। কিন্তু তাকে নড়ানো যায়নি। অনেকদিন পর মনের মত একটা কাজ পেয়েছে সে। মিস্ করতে রাজি নয় কারও কথায়।

এজওয়্যার রোডে এসে ট্যাক্সি নিল অস্ট্রিয়ান। রওনা হলো পার্ক লেন। পিছনে ব্রায়ান স্মিথের নেতৃত্বে তিনটে গাড়িতে তাকে অনুসরণ করছে দলটা। পিকাডিলিতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ওসনিয়াক। তারপর পিছনের কাল্পনিক ফেউ খসাবার জন্যে কয়েকটা বেসিক ট্রিক্ খাটাল। ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়েছে গিলটি মিয়া ও অন্য তিনজন ওয়াচার। একটু পর হঠাৎ ঝেড়ে দৌড় দিল লোকটা কাছের বড়সড় এক অফিস বিল্ডিং লক্ষ্য করে।

এ মাথা দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এল রিয়ার এক্সিট দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল আর কেউ দৌড়ে আসছে কি না দেখার জন্যে। কিন্তু না, ছুটে আসছে না কেউ। দরকারও ছিল না। কারণ সংক্ষিপ্ত পথে আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে এক ওয়াচার। কাল রাতের কথা মনে রেখেছে ওরা। তাই লোকটাকে ট্যাক্সি বিদেয় করতে দেখেই সতর্ক হয়ে গেছে। দ্রুত ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছে।

চারদিক দেখে শুনে সন্তুষ্ট মনে লোয়ার রিজেন্ট স্ট্রীটের ব্রিটিশ রেল ট্রাভেল সেন্টারে এসে ঢুকল সে। কাউন্টারে শেফিল্ডের ট্রেন ক'টায় ক'টায় ছাড়ে জেনে নিল। তারপর রাত নয়টা পঁচিশের গাড়ির একটা রিটার্ন টিকেট কিনল। দ্বিতীয় শ্রেণীর। তার পাশের কাউন্টারে মাদারওয়েলের

টিকেট কেনার জন্যে খুচরো শিলিং গুণছিল এক যুবক, ওসনিয়াক কাউন্টার ত্যাগ করতেই তারও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। ক্লার্কের উদ্দেশে 'জাস্ট আ মিনিট' বলে পিছিয়ে এল সে।

খবরটা মাসুদ রানাকে জানানো হলো। 'লেগে থাকো ' নির্দেশ দিল ও। 'মিস লীড করার জন্যেও করে থাকতে পারে টিকেটটা।'

'আমার মনে হয় না, চীফ। অত বুদ্ধি নেই শালার। ওর টেক্‌নিক সব মান্ধাতা আমলের।'

'হতে পারে। তবে সন্দেহ নেই একেই খুঁজছি আমরা। ভিয়েনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ওরা কনফার্ম করেছে জিরি হেইক এসটিবির হলেও ভেতরে ভেতরে কেজিবির।'

'অল রাইট, চীফ। ভাব্‌নার কিছু নেই। কথায় বলে চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন। ছুটতে পারবে না ও কিছুতেই।'

ওদিকে চার্লস স্ট্রীটের এক হোটেল কক্ষে জানালার পাশে বসে আছে মাসুদ রানা। বাঁ হাতে শক্তিশালী বিনকিউলার, ডান হাতে খুদে কমিউনিকেটর। ব্রায়ান স্মিথের সঙ্গে আলাপ সেরে বিনকিউলার চোখে লাগাল ও। কয়েকশো গজ দূরের সাউথ আফ্রিকান এমব্যাসি ওর লক্ষ্য। ডি অ্যাঙ্গাসের ওপর নজর রাখছে।

লোকটার সার্ভিস রেকর্ড জানা আছে মাসুদ রানার। দুই দফায় ভিয়েনার সাউথ আফ্রিকান এমব্যাসিতে সাত বছর চাকরি করেছে। ফ্রানজ ওসনিয়াক ওরফে জিরি হেইকের আগমনে তার মধ্যে বাড়তি কোন তৎপরতা দেখা যায় কি না আবিষ্কার করার আশায় বসে আছে রানা। কিন্তু দিনভর বসে থাকাই সার হলো। তেমন কিছু ঘটল না। যদিও তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। বলা যায় না, হয়তো শেফিল্ডেই মোলাকাত হবে দু'জনের।

রাত সাড়ে আটটায় শেষবারের মত বোর্ডিং হাউস ত্যাগ করল ফ্রানজ

ওসনিয়াক। ট্যাক্সি চেপে রওনা হলো গন্তব্যে। দশ মিনিট চলার পর লোকটার গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হলো ব্রায়ান স্মিথ, জানিয়ে দিল খবরটা মাসুদ রানাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পথে ছুটল ও লোয়ার রিজেন্ট স্ট্রীটের দিকে।

স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি বিদেয় করল অস্ট্রিয়ান। বেশ ধীরস্থির সে এবার। কোনদিক দেখাদেখি নেই, কোন ট্রিক খাটাবার চেষ্টাও নেই। নিশ্চিন্ত। ডিপারচার বোর্ডে চোখ বোলাচ্ছে। তার চারপাশে ভিড়ের মধ্যে মিশে রয়েছে মাসুদ রানা ও অন্যরা। নয়টা পঁচিশের লেস্টার-ডার্বি-চেস্টারফিল্ড-শেফিল্ড ইন্টারসিটি দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। একটু পর সেদিকে এগোল ওসনিয়াক।

প্রথমে বাইরে থেকে গাড়ির এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত ঘুরে এল লোকটা। এঞ্জিনের সঙ্গেই রয়েছে তিনটে ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিজ, বুফে কার। এরপর নীল কভার মোড়া ক্লাব সীটের তিনটে সেকেণ্ড ক্লাস ক্যারিজ। ওর মাঝেরটায় উঠে পড়ল অস্ট্রিয়ান। মাথার ওপরের র‍্যাকে গ্রিপটা রাখল। আরাম করে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

যাত্রী একেবারেই অল্প। কাজেই কাছাকাছি যাওয়ার ঝুঁকি নিল না রানা। ওসনিয়াকের সামনে-পিছনের ক্যারিজে ভাগ ভাগ হয়ে বসল। গিলটি মিয়া ও অন্য দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে রানা থাকল পিছনে। স্মিথসহ অন্যরা সামনে। ইন্টার ক্যারিজ কাঁচের দরজা দিয়ে ওসনিয়াককে দেখতে পাচ্ছে সবাই। গাড়ি ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে এক নিগ্রো যুবক উঠল মাঝেরটিতে। কানে ওয়াকম্যান। আধবোজা চোখ।

মিউজিকের তালে তালে তুড়ি বাজাতে বাজাতে ওসনিয়াকের তিন সারি সামনে বসে পড়ল সে। তারপর চোখ পুরো বুজে ফেলল। তুড়ি বাজাচ্ছে। পুরু সোলের কেডস্ পরা পা দোলাচ্ছে। তবে এতে রানা বা স্মিথের কোন অসুবিধে হলো না। দু'জনের ওপরই সমান নজর রাখতে

পারছে ওরা।

ঠিক সময় মতই সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশন ত্যাগ করল আন্তঃনগর। সোজা ছুটল উত্তরে। ঝাড়া এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট নিজের আসনে বসে থাকল অস্ট্রিয়ান। করার মত ছিলও না কিছু। সঙ্গে পত্রিকা-বই কিছুই আনেনি ব্যাটা। ধূমপানের অভ্যেসও নেই বোঝা গেল। জানালা দিয়ে স্রেফ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাল।

দশটা পঁয়তাল্লিশে গতি কমে এল আন্তঃনগরের। সামনেই লেস্টার। উঠে গ্রিপটা পাড়ল ওসনিয়াক। গ্রাহ্য করল না মাসুদ রানা ও তার সঙ্গীদের ভ্রূকুটি। টয়লেট এরিয়া পার হয়ে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। কাঁচ নামিয়ে পেট পর্যন্ত বাইরে বের করে দিয়ে ডানে তাকিয়ে থাকল ফ্রেমে দুই কনুইয়ে দেহের ভর চাপিয়ে।

গাড়ি থেমে দাঁড়াতে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো স্থানীয় রেলওয়ের এক পোর্টারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল অস্ট্রিয়ান। 'এক্সকিউজ মি, ইজ দিস শেফিল্ড?'

'নো, স্যার। ইট ইজ লেস্টার।'

'আহ্, সো। থ্যাঙ্ক ইউ।' গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর কাঁচ তুলে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এল। এগারোটা বারো মিনিটে দ্বিতীয়বারের ট্রেনের গতি কমে আসতে দেখে আবারও একই কাজ করল লোকটা। ডার্বি ইন করেছে গাড়ি। উঠে দরজায় এসে দাঁড়াল সে। একই প্রশ্ন করল একজন যাত্রীকে।

'ডার্বি,' উত্তর দিল যাত্রী।

গাড়ি যাত্রা শুরু করতে ফিরে এল আসনে। গ্রিপ্টা র‍্যাকে তুলে রেখে বসে পড়ল। এগারোটা তেতাল্লিশে চেস্টারফিল্ড স্টেশনে ইন করল গাড়ি। ভিক্টোরিয়ান মডেলের বিশাল, ঝকঝকে্ ভবন। মাথার ওপর রূপালি চেইনের সাহায্যে ঝোলানো অসংখ্য ফুলের ঝুড়ি।

উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল ফ্রানজ ওসনিয়াক। এবার আর গ্রিপ্টা

নিল না, র‍্যাকেই পড়ে থাকল ওটা। মুখ বের করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ডান পায়ে তাল ঠুকছে ফ্লোরে। চার-পাঁচজন যাত্রী নামল এখানে। গাড়ি ছাড়ার আগেই ফাঁকা হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম। লম্বা হুইসল বাজাল এঞ্জিন, পরমুহূর্তে বিশাল এক পাইথনের মত হেলেদুলে রওনা হলো ইন্টার সিটি।

হঠাৎ ঝট করে সিধে হলো অস্ট্রিয়ান, কেউ কিছু ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই এক হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল। প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়ল। ছুটে এল সবাই। এমনটা কেউ-ই আশা করেনি। গতি এখনও তেমন তুলতে পারেনি গাড়ি, ইচ্ছে করলেই নেমে যেতে পারে সবাই। কিন্তু তাতে ফাঁস হয়ে যাবে ওদের উপস্থিতি। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে নিজেদের গোপন রাখা যাবে না।

চট্ করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল মাসুদ রানা। শিকার হাতছাড়া হওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা। এদিকেই তাকিয়ে ছিল ওসনিয়াক, যখন নিশ্চিত হলো আর কেউ নামেনি গাড়ি থেকে, নিশ্চিন্তমনে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার দেহে। ঝট্‌কা মেরে দরজা খুলে ফেলল ও।

'শেফিল্ড চলে যাও তোমরা,' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে যত তাড়াতাড়ি পারো। দরজা বন্ধ করে দাও।'

রানিং বোর্ডে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। বাইরে অন্ধকার। বেশ বেড়ে গেছে ট্রেনের গতি। ত্রিশ মাইলে উঠে গেছে কম করেও। মনে খানিকটা দ্বিধা থাকলেও সাহস হারাল না ও। ঝাঁপ দিল সামনে প্যারাট্রুপারদের মত। মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করল যেন কোন লোহার খুঁটি বা বোল্ডারের ওপর আছড়ে না পড়ে। বাতাসের গতি অনুযায়ী প্যারাট্রুপাররা এগারো থেকে পনেরো মাইল গতিতে মাটি স্পর্শ করে।

মাসুদ রানা করল বিশ মাইল গতিতে। তবে ওর ভাগ্য ভাল, কার্পেটের

মত মোলায়েম, ঘন মে-ঘাস মৃদু অভ্যর্থনা জানাল। পরমুহূর্তেই বল হয়ে গেল রানা। পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত দু'হাঁটু বুকের কাছে, কনুই দুই পায়ের ফাঁকে, মাথা ও দুই হাঁটু দুই কনুইয়ের মাঝখানে—টেনিস বলের মত ড্রপ্ খেতে খেতে পনেরো-বিশ গজ গিয়ে থামল মাসুদ রানা। আন্তঃনগর ততক্ষণে সরে গেছে অনেক দূরে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ও। ছুটল আলোকিত স্টেশনের দিকে। টিকেট ব্যারিয়ারের সামনে যখন পৌঁছল রানা, গার্ড তখন রাতের মত কাজ সেরে স্টেশন সংলগ্ন নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়িয়েছে। ওর দিকে তাকাল লোকটা অবাক হয়ে।

'শেষ যে যাত্রীটি বেরিয়ে গেল, গ্রে স্যুট পরা, খালি হাত, কোনদিকে গেছে লোকটা?'

হাত তুলে স্টেশনের সামনের কার পার্ক দেখাল গার্ড, 'ওদিকে।'

তীরবেগে ছুটল মাসুদ রানা। পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকছে ওকে গার্ড, 'হেই, ম্যান! হেই, কাম ব্যাক!' টিকেটের কথা মনে পড়ে গেছে বোধহয় তার। পাত্তা দিল না রানা কার পার্কে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাল। একটা ট্যাক্সিও নেই। শেষ গাড়িটাই নিয়ে ভেগেছে হারামজাদা। হঠাৎ ওপাশের আড়াল থেকে এক পোর্টারকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। সঙ্গে মোটর সাইকেল রয়েছে লোকটার, ঠেলে নিয়ে আসছে। বাড়ি ফেরার ধান্ধায় আছে হয়তো।

সেদিকে ছুটল রানা। দৌড়ের ফাঁকে পকেট থেকে একশো পাউণ্ডের দুটো নোট বের করে ফেলেছে। ও দুটো পোর্টারের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'দু'ঘণ্টার জন্যে তোমার বাইকটা ধার দাও।'

'হবে না,' সোজা সাপ্টা জবাব লোকটার। চেহারা দেখে চোর-ছ্যাঁচড় ভেবেছে হয়তো রানাকে।

ওজন মেপে মারল রানা। কথা বাড়াবার সময় নেই, অনেক দূরে চলে গেছে তখন ফ্রানজ ওসনিয়াক। তার চোয়ালের ওপর মাঝারি শক্তির এক

ঘুসি বসিয়ে দিল মাসুদ রানা। জায়গাটা চেপে ধরে বসে পড়ল পোর্টার বাইক ছেড়ে। এক লাফে এগিয়ে এসে পড়ন্ত বাইক ধরল রানা, নোট দুটো লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কিক্ করল স্টার্টারে। 'সরি,' দুঃখ প্রকাশ করল ও। 'সকালে ফেরত পাবে গাড়ি।'

পরমুহূর্তেই লাফিয়ে ছুটল মোটর সাইকেল। রাস্তার দু'পাশের সবগুলো পোস্টেই আলো আছে, কাজেই হেড লাইট জ্বালল না রানা। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একজোড়া টেইল লাইট, গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে ধেয়ে চলল সেদিকে। পর পর দু'তিনটে ট্রাফিক পয়েন্টে লাল সিগন্যালের কারণে দাঁড়াতে হলো ট্যাক্সিটিকে, ফলে ব্যবধান দ্রুত কমিয়ে আনতে সক্ষম হলো রানা। হলিওয়েল রোড ছেড়ে ওটা যখন সল্টারগেটে পৌঁছল, ও তখন ওসনিয়াকের মাত্র একশো গজ পিছনে।

হঠাৎ ট্যাক্সির ব্রেক লাইট জ্বলে উঠতে দেখল মাসুদ রানা। জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল ও বাইক। বন্ধ করে দিল এঞ্জিন। ওসনিয়াক বেরিয়ে পড়েছে গাড়ি ছেড়ে, তাকাচ্ছে না সে কোনদিকে। কেউ যে ওকে অনুসরণ করেনি সে ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। মোটর সাইকেলটা পথের পাশে কাৎ করে শুইয়ে রাখল মাসুদ রানা। নিজেও বসে পড়ল ওটার পাশে।

চলে গেল ট্যাক্সি। জন-যানহীন পথের এ-মাথা ও-মাথা নজর বোলাল একবার অস্ট্রিয়ান, তারপর রাস্তা পেরিয়ে ওপারের উঁচু দেয়াল ঘেরা চেস্টারফিল্ড ফুটবল মাঠের দিকে চলল। ছায়ায় ছায়ায় সন্তর্পণে এগোল মাসুদ রানা। মাঠ অর্ধেকটা চক্কর দিতেই কম্পটন স্ট্রীট। মাঠের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো এ রোডের বাড়িগুলো। বেশিরভাগই অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষ। সোজা হেঁটে গিয়ে ওর একটার সামনে থামল ওসনিয়াক। নক্ করল দরজায়।

কয়েক সেকেণ্ড পর আলো জ্বলে উঠল অন্ধকার ঘরটির ভেতরে। দরজা খুলে গেল, ভেতরে সেঁধিয়ে গেল ফ্রানজ ওসনিয়াক। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রানা, বসে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে। ঘড়ি দেখল, সবে

বারোটা পাঁচ। আশ্চর্য হলো ও, মাত্র বিশ মিনিট হয়েছে চেস্টারফিল্ড পৌঁছেছে ট্রেন? অথচ মনে হচ্ছিল না জানি কয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ধারেকাছেই কোথাও গাড়ির আওয়াজ উঠল। মনে হলো দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা। খুব সম্ভব ফুটবল মাঠের ওপাশে কোথাও হবে। রানা যেখানে মোটর সাইকেল রেখে এসেছে, সেখানে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই আবার চলতে শুরু করল ওটা। আওয়াজ ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

পরক্ষণেই চমকে উঠল রানা কমিউনিকেটরে গিলটি মিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠ শুনে। 'স্যার, আপনি কি ধারেকাচে কোতাউ রয়েচেন।'

ব্যাপারটা বিশ্বাসই হতে চাইল না ওর। 'গিলটি মিয়া!'

'আপনি কোতায়, স্যার?'

'তুমি কোথায়!'

'মটোর সাইকেলটার কাচে।'

'কোন দিক থেকে এখানে আসতে হবে জানাল তাকে রানা। দুই মিনিট পর ভূতের মত নিঃশব্দে হাজির হলো মানুষটা। নির্দেশ অমান্য করেছে গিলটি মিয়া, কাজেই ওর ওপর রাগ হওয়ার কথা। অথচ উল্টে কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা।

'কি করে এলে তুমি?'

একটু ইতস্তত করল গিলটি মিয়া। 'আপনার পেচন পেচন আমিও লাপিয়ে পড়েচিলুম টেরেন থেকে।'

'ওরা বাধা দেয়নি তোমাকে?'

অন্ধকারে সাদা দাঁত দেখা গেল তার। 'সুযোগ পেলে তো!'

'খুব খারাপ কাজ করেছ। হাত-পা ভাঙত যদি?'

'আপনার হাত-পা ভাঙত যদি?'

এরপর কথা বাড়ানো নিরর্থক। 'বুঝলাম। কিন্তু এতদূর এলে কি করে?'

'গাড়িতে করে।'

'কোথায় পেলে গাড়ি!'

'আপনি স্যার দেকেননি। ইস্টিশানের বাইরে বাঁ দিকে একটা পেট্রল পাম্প ছিল। আপনি তো কুলি ব্যাটাকে ঢিসুম দিয়ে লম্বা দিলেন। আমি কি করি? খুঁজতে খুঁজতে গেলাম পেট্রল...'

'কথা কম। সংক্ষেপে বলো।'

মুখ ব্যাজার হয়ে গেল গিলটি মিয়ার। ভেবেছিল গাড়ি সংগ্রহের কাহিনী শেষ করে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার লোমহর্ষক একটা বর্ণনা দেবে। কিন্তু হলো না। 'ওকেনে তেল নিচ্চিল একটা ট্যাক্সি। ওটা লিয়ে এয়েচি।'

'ভাল করেছ।' রানা জানে আরও কথা বাকি আছে গিলটি মিয়ার। চান্স পেলে রাত কাবার করে দিতে পারবে। কাজেই চুপ করিয়ে দিল ওকে। 'বসে পড়ো চুপ করে।'

দুটোর দিকে ব্রায়ান স্মিথের সাড়া পাওয়া গেল। রেঞ্জের ভেতর এসে পড়েছে ওরা। আরও আধঘণ্টা পর একত্র হলো সবাই। রানার সঙ্গে গিলটি মিয়াকে দেখে আশ্চর্য হলো দলের অন্যরা। 'গড!' অস্ফুটে বলল ব্রায়ান। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম... ।'

আরেকবার দন্ত প্রদর্শন করল গিলটি মিয়া।

বিটওয়েল স্ট্রীট। চেস্টারফিল্ড পুলিস স্টেশনে পুলিস সুপার স্যাম রসটনের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। এত রাতে গভীর ঘুম থেকে উঠে আসতে হয়েছে বলে মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন ভদ্রলোক। তবে মাসুদ রানা কেন কি কাজে এসেছে, খানিকটা আভাস পাওয়ার পর মেজাজ মোটামুটি নিউট্রাল হয়েছে।

সুপারের আগ্রহ মেটাবার জন্যে আসল ঘটনা যতদূর সম্ভব রেখে-ঢেকে জানাল মাসুদ রানা। 'বলেন কি!' লাফিয়ে উঠলেন সুপার। 'তাহলে তো এখনই অ্যারেস্ট করতে হয় ব্যাটাকে।'

'উঁহুঁ, তাতে কোন লাভ হবে না। অ্যারেস্ট করলে তো লণ্ডনেই করা যেত।'

'তাহলে?'

'আগে জানতে হবে ওই বাড়িতে কে থাকে।'

'কোন সমস্যা নয়। নম্বর কত বাড়িটার?'

'অন্ধকারে দেখতে পাইনি। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সে জন্যে।'

'আই সী দ্য পয়েন্ট। তাহলে আর কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'সকালে চার-পাঁচজন ওয়াচার দরকার হবে আমার। আমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের কাউকে না কাউকে ট্রেনে হয়তো দেখেছে লোকটা। এখানে যদি আবার দেখে নিশ্চয়ই সন্দেহ করে বসবে।'

'দেয়া যাবে। আর কিছু?'

'যে বাড়িতে ঢুকেছে আমার সাসপেক্ট, তার মুখোমুখি কোন একটা বাড়ি প্রয়োজনে খালি করে দিতে হবে। অথবা যদি রাস্তার দিকের একটা রুমও পাওয়া যায়, তাতেও চলবে। আড়াল থেকে লোকটার এবং ও বাড়িতে আর যারা থাকে তাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে দরকার হবে। আমার লোক থাকবে ওখানে।'

কি যেন ভাবলেন সুপার। কম্পটন রোড বললেন না? আমার এক বন্ধু থাকে ওখানে, আটষট্টি নম্বর বাড়ি ও...'

রানার কমিউনিকেটর খড়মড় করে উঠতে থেমে পড়লেন ভদ্রলোক। ওটা মুখের কাছে তুলল রানা। 'ইয়েস! হ্যাঁ, কত? ফিফটি নাইন? শিওর? ঠিক আছে।' যন্ত্রটা টেবিলে রাখল রানা। 'আমার লোক বলছে ওই বাড়ির নম্বর ঊনষাট।'

'দারুণ!' বললেন সুপার। 'মনে পড়েছে, আমার বন্ধুর মুখোমুখি বাড়িটির নম্বর ষাট।'

নয়

ভোর চারটা। কম্পটন রোডের আটষট্টি নম্বর বাড়ির কিচেনে দাঁড়িয়ে আছেন পুলিস সুপার স্যাম রসটন। পিছন দরজা দিয়ে ঢুকেছেন ভদ্রলোক।

'কি বললে?' চোখ বড় করে সুপারের দিকে চেয়ে আছেন বাড়ির মালিক ব্যারি ব্যাংকস্। 'ডাকাত?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন রসটন।

'মাই গড!' পাশে দাঁড়ানো হতভম্ব স্ত্রীর দিকে তাকালেন একবার ভদ্রলোক। 'তা এখন কি করতে চাইছ?'

'খানিক কষ্ট দেব তোমাদের। ওপরতলার রাস্তার দিকের একটা রুম ছেড়ে দাও। আমার লোক ওখান থেকে নজর রাখবে বাড়িটার ওপর।'

'তা না হয় দিলাম,' চিন্তিত ব্যাংকস্। 'কিন্তু এখনই কেন অ্যারেস্ট করছ না ওদের?'

'ধারণা করছি দলে আরও লোক আছে ওদের। টাকার বখ্রা নিতে আসতে পারে। তখন একসঙ্গে ধরতে চাই সব ক'টাকে।'

'তাহলে দেরি করে কাজ নেই। যাও, ডেকে নিয়ে এসো সবাইকে। রুম একটা খালিই আছে ওপরে।'

ওদিকে পুলিস স্টেশনে এক ডেস্ক সার্জেন্টের সামনে বসে আছে মাসুদ রানা। ইচ্ছে করেই সুপারের সঙ্গে যায়নি ও। উনষাট কম্পটন স্ট্রীটে কে বা কারা থাকে, জানার জন্যে রয়ে গেছে। রেকর্ড রুম থেকে একটা ফাইল

নিয়ে এসে ভেতরে নজর বোলাচ্ছে সার্জেন্ট।

'দু'জন থাকে ও বাড়িতে। ওরা গ্রীক সাইপ্রিয়ট, স্যার,' বলল সার্জেন্ট। 'দুই ভাই, যমজ। দুজনেই অবিবাহিত। অ্যানড্রিয়াস এবং স্পিরিডন স্টেফানিডেস। চার বছর ধরে আছে এখানে। হলিওয়েল ক্রসে ডোনার কাবাবের ব্যবসা আছে।'

স্লীপার ট্র্যান্সমিটার, ভাবতে লাগল মাসুদ রানা, এবং লো-লেভেল দুই স্লীপার—ডীপ কভার এজেন্ট! ওই ঘরেই কি আছে সেই ট্র্যান্সমিটারটি, যেখান থেকে স্কোয়ার্ট দুটো ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে? ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্ট এবং শেফিল্ডের উত্তরের পাহাড়ি এলাকা, দুটোই খুব কাছাকাছি এখান থেকে। ট্র্যান্সমীটিং সেরে চট্ করে এখানে এসে গা ঢাকা দেয়া খুব সম্ভব। বোমার অংশগুলোও কি এখানে এনে জড়ো করা হয়েছে? উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল মাসুদ রানা।

টেলিফোন তুলল ও। ঘুম ভাঙাল স্যার লংফেলোর। 'কি ব্যাপার, রানা? খবর ভাল?'

'মোটামুটি, স্যার। জরুরী একটা প্রয়োজনে ডিসটার্ব করছি আপনাকে।'

'দ্যাট'স অল রাইট, সান। বলো।'

'যাকে ফলো করছি, সে হয়তো আজ কোনও এক সময় ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করবে। যদি করে, আমি চাই কেউ যেন বাধা না দেয় তাকে। আমার সন্দেহ তাকে ভিয়েনায় আশা করবে কেউ নির্ধারিত সময়ে। ও পৌঁছতে ব্যর্থ হলে অন্যরকম হয়ে যেতে পারে পরিস্থিতি।'

'বুঝেছি। সকালে তোমার হয়ে অর্ডারটা ইস্যু করে দেব আমি।'

'ওর পাসপোর্ট নাম্বার হিথ্রোর সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানতে পারবেন আপনি।'

'ওকে।'

একটু পর ফিরে এলেন পুলিস সুপার রসটন। একান্তে আধ ঘণ্টা আলাপ করল রানা তাঁর সঙ্গে।

সকাল সাড়ে ন'টায় ফিফটি নাইন, কম্পটন রোড ত্যাগ করল ফ্রানজ ওসনিয়াক। হ্যারি নিগেল এবং আরেকজন অ্যাশগেট রোড থেকে পিছু নিল তার। ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে গেল লোকটা, উঠে পড়ল লণ্ডনগামী ট্রেনে। সেন্ট প্যানক্রাসে অন্য একদল ওয়াচারের ওপর লোকটার ভার ছেড়ে দিয়ে চেস্টারফিল্ডে ফিরে এল প্রথম দু'জন।

বোর্ডিং হাউসে আর গেল না ফ্রানজ ওসনিয়াক। যদি কিছু রেখে এসে থাকে সে ওখানে, এক সেট পায়জামা-শার্টসহ হ্যাণ্ড গ্রিপ ট্রেনে ফেলে যাওয়ার মতই একেবারে ফেলে এসেছে। সোজা হিথ্রো এল সে। দুটোর ফ্লাইটে রওনা হয়ে গেল ভিয়েনা। সোভিয়েত এমব্যাসির দু'জন রিসিভ করল তাকে ওখানে।

ঠিক এগারোটায় বাসা থেকে বেরোল দুই গ্রীক সাইপ্রিয়ট। এরাও প্রায় মধ্যবয়সী। পুলিস সুপারের সরবরাহ করা শক্তিশালী লেন্সওয়ালা ক্যামেরার সাহায্যে বেশ কিছু ছবি তোলা হলো ওদের। ছবি নিয়ে ব্রায়ান স্মিথ রওনা হয়ে গেল লণ্ডন। ম্যানচেস্টার থেকে একদল এক্সপার্ট এসে গ্রীকদের বাসা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করল। একটা ডিরেকশন ফাইণ্ডার ব্লীপারও জুড়ে দেয়া হলো ওদের গাড়িতে।

শেষ বিকেলে উত্তর এল লণ্ডনের। জানা গেল, ওরা সাইপ্রিয়ট, কথাটা ঠিক নয়। এক সময় গ্রীক মেইনল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিল। গোঁড়া কমিউনিস্ট। হেলাস মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত ছিল দুই ভাই। প্রায় বিশ বছর আগে সাইপ্রাসের উদ্দেশে গ্রীস ত্যাগ করে ওরা পুলিসের তাড়া খেয়ে। লণ্ডনের প্রশ্নের উত্তরে এথেন্স জানিয়েছে, ওদের আসল নাম

কোস্টাপোপোলাস। নিকোশিয়ার মতে আট বছর আগে ওখান থেকে উধাও হয়ে গেছে দু'জনে।

এদিকে ক্রয়ডন ইমিগ্রেশন রেকর্ড অনুযায়ী সাইপ্রিয়ট নাগরিক পরিচয়ে লণ্ডন আসে ওরা দুই ভাই। ব্রিটেন সরকার তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এদেশে থাকার অনুমতি দেন স্টেফানিডেস ভ্রাতৃদ্বয়কে। সবশেষে চেস্টারফিল্ড রেকর্ড। এদের মতে সাড়ে তিন বছর আগে লণ্ডন থেকে এখানে আসে তারা। বাসা ভাড়া নেয় ফিফটি নাইন কম্পটন রোডে। হলিওয়েল ক্রসে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে কাবাব-ব্যবসা আরম্ভ করে। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির অমায়িক মানুষ দুই ভাই। আইন মেনে চলে কঠোরভাবে।

'হুঁম!' রিপোর্টগুলো রেখে দিল মাসুদ রানা। বাইরে ঘনিয়ে এসেছে রাত।

একটি ছাড়া আজকাল আর কোন ইউরোপিয়ান গাড়ি নির্মাতা অতীতের মত বড়, গোল হেড লাইট তৈরি করে না। এখন বেশিরভাগই চৌকো হয়ে গেছে। একমাত্র অস্টিন এখনও তৈরি করে। অস্টিন মিনির জন্যে কেবল। মাসুদ রানা যখন গ্রীক যমজদের ব্যাপারে লণ্ডনের রিপোর্ট পড়ছে, ঠিক সেই সময় সাউদাম্পটনের চেরবার্গ জেটিতে এই ধরনের একটি মিনি অস্টিন অবতরণ করল ফেরি থেকে। ওটা এসেছে অস্ট্রিয়ার সালজবার্গ থেকে।

অস্টিন এবং তার চালক-কাম-মালিক, কারও কাগজপত্রে কোন খুঁত নেই। অকৃত্রিম অস্ট্রিয়ান কাগজপত্র। আসলে লোকটি চেক এসটিবির এজেন্ট, ফ্রানজ ওসনিয়াকের মত।গাড়িটা সার্চ করল কাস্টমস। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। ছেড়ে দিল তারা ওটা। লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে গেল মিনি অস্টিন। এক নাগাড়ে দুই ঘণ্টা চলার পর সাউদাম্পটনের উত্তর প্রান্তে পৌঁছল গাড়িটা।

হেড লাইট নিভিয়ে পথের পাশের প্রকাণ্ড এক ঝোপের আড়ালে এসে গাড়ি দাঁড় করাল চালক। হাইওয়ে থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে চলে এসেছে সে। কেউ দেখতে পাবে না। একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে নেমে এল লোকটা, অন্ধকারেই শুরু করে দিল কাজ। প্রথমে বডি এবং হেডলাইট ইউনিটের মাঝের ফাঁক আড়াল করে রাখা চকচকে ক্রোম রিঙটা খুলে ফেলল সে।

এবার বডির ভেতরের উইঙের সঙ্গে জোড়া পুরো হেডলাইট ইউনিট খুলে বের করে আনল সকেট থেকে। ওর পিছনে, এঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে যুক্ত হওয়া তারগুলোও খুলে ফেলল সে। এরপর বালবের পিছনের অর্ধ গোলক আকৃতির রিফ্লেকটিং বাউল দুটো আলাদা করে একটা হেসিয়ান ব্যাগে পুরল লোকটা। অস্বাভাবিক ওজন ও দুটোর।

এক ঘণ্টারও বেশি ব্যয় হলো কাজটা সারতে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল চেক। চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত নিয়ে অন্ধের মত চেয়ে আছে মিনি অস্টিন। কাল কোন এক সময়, ভাবল লোকটা, ওরকম আরেক সেট হেডল্যাম্প কিনে আনবে সে সাউদাম্পটন থেকে। ওগুলো ফিট করে কাল রাতেই ফিরে যাবে সালজবার্গ।

সে তো পরের কথা, আগের কাজ আগে। সিগারেটটা মাড়িয়ে দিল চেক। ব্যাগ ঝোলাতে ঝোলাতে বড় রাস্তায় উঠে হেঁটে এগোতে লাগল ফেলে আসা বন্দরনগরীর দিকে। পাঁচশো গজমত এগোতে বাস স্টপটা আবার দেখতে পেল লোকটা। এটার সামনে দিয়েই গেছে সে তখন। ঘড়ি দেখল। বেশ সময় আছে হাতে এখনও। প্রায় পনেরো মিনিট।

আর কোন যাত্রী নেই বাস স্টপে। সে একাই। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল লোকটা। আরও পাঁচ মিনিট বাকি সময় হতে। হঠাৎ মোটর সাইকেলের ভারি আওয়াজে ঘাড় ফেরাল লোকটা। আগাগোড়া কালো পোশাক পরে রয়েছে বাইক চালক। থেমে দাঁড়িয়েছে বাইকটা তার

চার হাতের মধ্যে।

'রাতের শেষ বাসে বাড়ি ফেরা খুব বিরক্তিকর,' বলে উঠল লোকটা।

ফোঁস করে দম ছাড়ল চেক। 'তাও ভাল, যত দেরিই হোক, অন্তত পৌছানো যায়।'

ব্যাগটা আগন্তুকের হাতে তুলে দিল চেক। পিছনের ফাইবার গ্লাস বক্সে সঙ্গে সঙ্গে চালান হয়ে গেল তা। এই সময় স্টপেজে এসে থামল সাউদাম্পটনের শেষ বাস। উঠে পড়ল লোকটা। ছেড়ে দিল বাস। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকল তাতায়েভ। তারপর বিএমডব্লিউ ঘুরিয়ে রওনা হলো লণ্ডনের দিকে।

পরদিন সূর্যোদয়ের একটু আগে ইপসউইচ পৌছল সে থেটফোর্ড হয়ে। মনটা দারুণ খুশি। নবম চালান পৌছে গেছে হাতে। সর্বশেষ চালান।

পরদিন সকালে ইপসউইচ শহরের এ-দোকান ও-দোকানে কেনাকাটা করতে দেখা গেল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে। হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে প্রথমেই কিনল সে একটা হালকা, খাটো হাতলওয়ালা দুই চাকার পুশ ট্রলি। সাধারণত ভারি কোন বোঝা, বস্তা, ডাস্টবিন বা স্যুটকেস স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয় এগুলো। নির্মাণ সামগ্রী বিক্রি করে এমন একটি দোকান থেকে কিনল দুটো দশ ফুটি তক্তা।

এরপর অফিস ইকুইপমেন্টের বড় এক দোকানে দেখা গেল তাতায়েভকে। এখান থেকে ছোট একটা স্টীলের ফাইলিং কেবিনেট কিনল সে। ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, আঠারো ইঞ্চি পাশে, বারো ইঞ্চি গভীর। একটা টিম্বার স্টোর থেকে সংগ্রহ করল কয়েকটি কাঠের হুড়কো, গোল ব্যাটন এবং কড়িকাঠ জাতীয় এক খণ্ড কাঠ। ওখান থেকে বেরিয়ে একটা ডু-ইট-ইওর-সেলফ দোকানে ঢুকল তাতায়েভ। কিনল কমপ্লিট এক সেট টুল

বক্স। নানান মাপের বিটসহ একটি হাই-স্পীড ড্রিল মেশিন। পেরেক, নাট-বল্টু, স্ক্রু এবং এক জোড়া হেভি ডিউটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্লাভস্।

এখানকার কাজ সেরে এক প্যাকেজিঙ ওয়্যারহাউসে ঢুকল মেজর ভ্যালেরি। কিনল কিছু ফোম ইনসুলেশন। সবশেষে ইলেক্ট্রিক এমপোরিয়াম থেকে চারটা নয় ভোল্টের ব্যাটারি এবং কয়েক গজ মাল্টিকালারড সিঙ্গল-ফ্লেক্স তার কিনল সে।

এত জিনিস সেলুনে করে চেরিহে'জ ক্লোজে নিয়ে আসতে দুটো ট্রিপ দিতে হলো ভ্যালেরিকে। সমস্ত কিছু গ্যারেজেই ফেলে রাখল সে। আবার রাত নামতেই ওর বেশিরভাগ স্থান পেল কিচেনে।

সে রাতেই তাতায়েভের জন্যে নির্ধারিত মস্কো রেডিওর কমার্শিয়াল ব্যাণ্ড জানাল তার 'অ্যাসেম্বলার' আসার সংবাদ। দু'দিন পর লণ্ডন পৌঁছবে সে।

রুমটা বেশ বড়। রাস্তার দিকে তিনটে জানালা। মাঝেরটার সামনে বসে আছে মাসুদ রানা। আরও একটা রাত কেটে গেছে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছাড়াই। কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখা যায়নি গ্রীক যমজের। আজও ঠিক সময়ই কাজে বেরিয়েছে তারা। ফিরেও এসেছে যথানিয়মে। বেতাল কিছু করার চেষ্টাও করেনি। এমন কি বাসা বা দোকানের টেলিফোনও তোলেনি ওরা নিজে থেকে। যে ক'টা ফোন এসেছে, দোকানের নাম্বারে এসেছে। সবগুলোই কাবাবের অর্ডার বা টেবিল রিজার্ভেশন সম্পর্কিত।

একবার ভেবেছে রানা ওদের অনুপস্থিতিতে বাসার ভেতরে ঢোকার একটা চান্স নেবে কি না স্লীপার ট্র্যান্সমিটারের খোঁজে। কিন্তু পরে বাতিল করে দিয়েছে সে ইচ্ছে। মারাত্মক ঝুঁকি আছে তাতে। ও বাড়িটা নিঃসন্দেহে সিকিউরিটি অ্যালার্মের কারখানা। হেজিপেজি নয় ওরা

দু'ভাই, টপ ক্লাস স্লীপার এজেন্ট। নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপার ভালই বোঝে। তিল পরিমাণ এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই বরবাদ হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। এগারোটা। চোখ তুলতেই গ্রীক যমজের ওপর চোখ পড়ল। বেরিয়ে আসছে বাসা থেকে। কাজে যাওয়ার সময় হয়েছে। কি কারণে কে জানে, হাসছে খুব দু'ভাই। গাড়ি বের করে রওনা হয়ে গেল অ্যানড্রিয়াস ও স্পিরিডন স্টেফানিডেস ওরফে কোস্টাপোপোলাস যমজ। বলতে হলো না, অপেক্ষমাণ পুলিসের দুই ওয়াচার এবং বিএসএসের হ্যারি নিগেল বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সবার ডিউটি ভাগ-ভাগ করে দিয়েছে মাসুদ রানা। কাউকে যদি দেখে ফেলে ওরা দেখুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু একবারের বেশি দু'বার যাতে চোখে না পড়ে সে, ফেউ বলে তাকে সন্দেহ করতে না পারে ওরা দু'ভাই, সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ রয়েছে সবার ওপরে।

পরদিন ফিনএয়ারের একটি জেট অবতরণ করল হিথ্রো। সরাসরি হেলসিঙ্কি থেকে এসেছে। যাত্রীরা সব ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস্ পেরিয়ে এল। কারও কাগজপত্রে কোনরকম গণ্ডগোল নেই। ওর মধ্যে একজন; লম্বা, গাল ভর্তি চাপ দাড়ি, মাঝবয়সী লোক রয়েছে। ফিনিশ পাসপোর্টের অধিকারী। পাসপোর্ট অনুযায়ী উরহো নুটিলা তার নাম।

ফিন ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে লোকটা, বাধে না একটুও। কারণ তার মা ক্যারেলিয়ান। বাবা রুশ। জন্মগতভাবে লোকটা রুশ। সেমিয়ানভ নাম। পেশাঃ সোভিয়েত অর্ডন্যান্স ডিরেক্টরেটের আর্মি আর্টিলারি কোরের কর্ণেল। আসলে লোকটা যতটা না সৈনিক, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞানী নিউক্লিয়ার এঞ্জিনিয়ার। ফিনদের মত চলনসই ইংরেজি বলতে পারে লোকটা।

কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে এয়ারপোর্টের কার্টসি কোচে এসে উঠল সেমিয়ানভ অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। হিথ্রোর পেন্টা হোটেলে এসে থামল বাস। ভেতরে ঢুকল সে। কিন্তু রিসেপশন ডেস্কে গেল না। সামনে দিয়ে 'কাট্টি' মেরে সোজা রিয়ার এক্সিটে চলে এল। দরজা দিয়ে বেরোলেই সামনে হোটেলের কার পার্ক। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হলো সেমিয়ানভকে। কেউ নেই ধারে কাছে।

ধীরগতিতে কাছে এসে দাঁড়াল একটা ফ্যামিলি সেলুন। জানালার কাঁচ নামিয়ে প্রশ্ন করল ওটার চালক, 'এয়ারপোর্টের বাস কি এখানেই যাত্রী নামায়?'

'না। সামনেই নামিয়েছে,' বলল কর্ণেল।

'কোত্থেকে এসেছেন আপনি?'

'ফিনল্যাণ্ড।'

'আই সী! ওখানে নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা এখন?'

'নাহ্! খুব গরম। ওটা আসলে সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে মশা।'

মাথা ঝাঁকাল তাতায়েভ। সামনে দিয়ে ঘুরে ওপাশের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল এঞ্জিনিয়ার। গাড়ি ছাড়ল মেজর। বিনা বাক্য ব্যয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল। মাইলখানেক এগিয়ে প্রশ্ন করল তাতায়েভ, 'আপনার নাম?'

'সেমিয়ানভ।'

'ওতেই চলবে, আর কিছু দরকার নেই। আমি ফ্ল্যানারি। মার্টিন ফ্ল্যানারি।'

'বেশি দূরে যেতে হবে আমাদের?'

'দুই ঘণ্টার পথ।'

বাকি পথ দু'জনের কোন কথা হলো না। তিন জায়গায় তিনটে বেসিক ট্রিক খাটাল তাতায়েভ পিছনে কেউ লেগেছে কি না বোঝার জন্যে। কিন্তু

না, লাগেনি। চেরিহে'জ ক্লোজে যখন পৌঁছল ওরা, দিনের আলো তখন সামান্যই বাকি। সামনের বাসার ভাড়াটে ডানকান রস তার বাগানের পরিচর্যা করছিল, ফ্ল্যানারির সঙ্গে নতুন একজনকে দেখে এগিয়ে এল সে।

'হেড অফিস,' তার উদ্দেশে চোখ টিপল তাতায়েভ। 'মনে হচ্ছে প্রমোশনের ব্যাপার-স্যাপার।'

হেসে শুভেচ্ছা জানাবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে।

বাতি জ্বালার আগে ঘরের কার্টেন ভাল করে টেনে দিল ভ্যালেরি তাতায়েভ। কার্টেন না টেনে কখনোই বাতি জ্বালে না সে।

'আগে কাজের কথা হোক,' বলল কর্ণেল।

মাথা দোলাল মেজর, 'হোক।'

'চালান সবগুলো হাতে পেয়েছেন আপনি?'

'পেয়েছি।'

'নয়টা?'

'নয়টা।'

'লেট'স কনফার্ম। বাচ্চাদের খেলার বল একটা। ওজন বিশ কিলোগ্রাম।'

'চেক্।'

'এক জোড়া জুতো, এক বাক্স চুরুট, একটা প্লাস্টার কাস্ট।'

'চেক্।'

'একটা পোর্টেবল্ ট্র্যানজিস্টর সেট, একটা ইলেক্ট্রিক শেভার।'

'চেক্।'

'একটা দেড় ফুট লম্বা স্টীল টিউব, একটা ছোট ফায়ার এক্সটিঙগুইশার। দুটোই অস্বাভাবিক ভারি।'

'চেক্।'

'এক জোড়া হেড ল্যাম্প বাউল, খুব ভারি।'

'চেক্।'

'ঠিকই আছে তাহলে। অন্য সব টুকটাক কেনাকাটা যদি সারা হয়ে থাকে, তাহলে কাল সকালে হাত দেব কাজে।'

'এখনই নয় কেন?'

'ইয়ংম্যান, কাঠ কাটা, ড্রিল করা, এসবে শব্দ হয়। আরও এখন রাত। তাছাড়া আমি ক্লান্ত। যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে সামান্যতম ভুল হলেই সর্বনাশ। তাই এখন নয়। কাল সন্ধে নাগাদ সেরে ফেলতে পারব কাজটা, আশা করি।'

মাথা দোলাল মেজর।

দশ

সীটিং রুমেই কাজ করবে ঠিক করল সেমিয়ানভ। মেঝেয় বসে অবশ্যই। তাকে সাহায্য করার জন্যে বসে আছে তাতায়েভ। 'প্রথমে গারবেজ ব্যাগ চাই একটা,' বলল সেমিয়ানভ। সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো নির্দেশ।

'এবার আমি যেটা যেটা চাইব, এগিয়ে দিন এক এক করে,' বলল সে। 'প্রথমে চুরুটের বাক্স।'

ওটা হাতে নিয়ে সীল খুলল অ্যাসেম্বলার। ঢাকনা তুলল। ভেতরে পঁচিশটা চুরুট। নিচের সারিতে বারোটা, ওপরে তেরোটা। প্রতিটি আলাদা আলাদা অ্যালুমিনিয়ামের মুখ-বন্ধ টিউবে মোড়া। টিউব কেটে

বের করতে হয় ওগুলো। 'নিচের সারির বাঁ দিক থেকে তৃতীয়টা,' নিজের মনে বলল সে।

ওটা বের করে ব্লেড দিয়ে কেসিঙটা কেটে ফেলল সেমিয়ানভ। তারপর আলতো এক পোচে চুরুটের এ মাথা ও মাথা কেটে তামাকের ভেতর থেকে বের করে আনল ইঞ্চি দুয়েক লম্বা, সরু কাঁচের শিশি। ওর এক মাথা কোঁচকানো। ভেতর থেকে দুটো প্যাঁচানো, শক্ত তার বেরিয়ে আছে। 'ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটর,' তাতায়েভকে শুনিয়ে উচ্চারণ করল বিজ্ঞানী। ওটা বাদে আর সব গারবেজ ব্যাগে ভরল সে।

'প্লাস্টার কাস্ট।'

ওটা তৈরি দুই স্তর প্লাস্টার দিয়ে। প্রথম স্তর শক্ত হওয়ার পর ওপরে আরও এক স্তর জোড়া হয়েছে। দুটোর ভেতর রয়েছে ছাই রঙের পাটির মত নরম কিছু একটার আরেক স্তর। প্লাস্টারের আঁঠার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে পলিথিনে মুড়ে মাঝে স্থাপন করা হয়েছে জিনিসটা। প্লাস্টার অভ প্যারিসের দুটো স্তর আলাদা করল সেমিয়ানভ। পলিথিন প্যাকেটটা বের করে ওটা থেকে খসিয়ে নিল নরম জিনিসটা। তারপর জিনিসটা দলা করে মুঠোয় পুরে চেপে চেপে বল বানাতে বানাতে বলল, 'হাফ পাউণ্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।'

পুরো প্লাস্টার স্থান পেল গারবেজ ব্যাগে।

'এবার জুতোজোড়া।'

দুটোরই হিল বিচ্ছিন্ন করে ফেলল সেমিয়ানভ। একটায় পাওয়া গেল দুই ইঞ্চি ডায়া, এক ইঞ্চি পুরু একটা স্টীল ডিস্ক। ওটার রিম প্যাঁচ কাটা। সমতল পিঠের একদিকে এ মাথা ও মাথা গভীর খাঁজ। চওড়া মাথায় স্ক্রু-ড্রাইভার ধারণ করার জন্যে কাটা হয়েছে খাঁজটা। অন্যটার ভেতর আছে আরেক গ্রে-মেটাল ডিস্ক। এটাও দুই ইঞ্চি ডায়ার।

'লিথিয়াম,' পরেরটা দেখিয়ে ঘোষণা করল বিজ্ঞানী। 'ইনিশিয়েটর। অ্যাটমিক পাওয়ারকে ফুল ফোর্সে বিস্ফোরিত হতে সহায়তা করবে।' জুতো এবং হিলের অবশিষ্টাংশ ফেলে দিল সে ব্যাগে।

'শেভার।'

ওর ভেতর থেকে বেরোল বিকল্প পোলোনিয়াম ডিস্কটি। গ্লাসগোয় ডেকহ্যাণ্ড পাভলভ এরই পয়লা চালানটি খুইয়েছিল। এটার ব্যাপারে রানিং কমেন্ট্রি দিতে ভুলে গেল বিজ্ঞানী। এরপর হিট রেজিসট্যান্ট প্যাড খুলে ভেতর থেকে দেড় ফুট লম্বা, বিশ কেজি ওজনের স্টীল টিউবটা বের করার কাজে লেগে গেল।

চার ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটা টিউব ওটা। হার্ডেনড্ স্টীলের তৈরি, এক মাথা খোলা টিউব। ভেতরে দুই ইঞ্চি ফাঁকা, এক ইঞ্চি পুরু স্টীলের তৈরি জিনিসটা। টিউবের উন্মুক্ত মাথার ভেতরদিকটা প্যাঁচ কাটা। অন্য প্রান্তে স্টীলের সংযুক্ত ক্যাপ পরানো, ঠিক মাঝখানে ছোট একটা ফুটো আছে ক্যাপটার। কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করার ফলে কথা বন্ধ হয়ে গেছে সেমিয়ানভের। নীরবে হাত চলছে তার। তাতায়েভ হাঁ করে দেখছে লোকটার কাজ।

ফার্স্ট অফিসার ভলকভের পোর্টেবল থেকে বের হলো টাইমার ডিভাইস। আকার দুটো ফাইভ-ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট লম্বালম্বিভাবে জুড়লে যতটা দীর্ঘ হয়, ততটা। পাশেও তেমনি। দুই সমতল মাথার একদিকে আছে দুটো সুইচ। একটা হলুদ, অন্যটা লাল। আরেক মাথা দিয়ে বেরিয়ে আছে দুটো রঙিন তার; নেগেটিভ, পজিটিভ। ওটার চার কোণে চারটে ফুটো। যে স্টীল কেবিনেটে রাখা হবে তৈরি বোমা, ওটার দরজার সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে জুড়ে দেয়ার সুবিধের জন্যে।

এবার ফায়ার এক্সটিংগুইশার। ওর তলাটা কাটা, প্যাঁচ কষে

লাগানো। কাজটা এত নিখুঁতভাবে সারা হয়েছে যে চোখেই পড়েনি কাস্টমসের। ওটাই স্বাভাবিক, কারণ কাটা মুখ যাতে সহজে চোখে না পড়ে সে জন্যে নতুন করে পুরু রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছিল পুরো জিনিসটায়। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মোটা প্যাড বের করল সেমিয়ানভ। প্যাডের ভেতর রয়েছে সীসার মত দেখতে একটা ধাতব রড। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, দুই ইঞ্চি ডায়া। ওজন সাড়ে চার কেজি। ওটা স্পর্শ করার আগে হেভি ডিউটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্লাভস পরে নিল বোমা বিশেষজ্ঞ। কারণ ওটা খাঁটি ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ।

'জিনিসটা রেডিওঅ্যাকটিভ, তাই না?' প্রশ্ন করল মোহাচ্ছন্ন তাতায়েভ।

'হ্যাঁ।'

'ডেঞ্জারাস?'

'ততটা নয়। সবাই ভাবে রেডিওঅ্যাকটিভ মানেই বুঝি বিপজ্জনক, আসলে তা নয়। লিউমিনাস হাতঘড়িও রেডিওঅ্যাকটিভ, কিন্তু আমরা তা হাতে পরি। ইউরেনিয়াম আসলে আলফা-এমিটার, লো-লেভেল। তেমন তেজস্ক্রিয় কিছু নয়। এটা বিপদজনক হয়ে উঠবে তখনই, যখন বোমাটা ফাটবে।'

এবার হেডল্যাম্প বাউল দুটো মুক্ত করল সে ইউনিট থেকে। দুটো অর্ধবৃত্ত, এক ইঞ্চি পুরু হার্ডেণ্ড স্টীলে তৈরি বাউল। দুটোরই প্রান্ত বাইরের দিকে সামান্য ভাঁজ করা, ষোলোটা করে ছিদ্র আছে তাতে পরস্পরের সঙ্গে নাট-বোল্ট দিয়ে যুক্ত করার জন্যে। দুটো এক হলে নিখুঁত একটা গ্লোব তৈরি হবে।

একটা বাউলের পিছনদিকে, ঠিক মধ্যিখানে দুই ইঞ্চি ডায়ার ছিদ্র আছে, ভেতরটা প্যাঁচ কাটা। প্রথম জুতোর হিল থেকে বের হওয়া খাঁজ কাটা স্টীল ডিস্কটা সময়মত নিখুঁতভাবে ফিট্ হবে ওই ছিদ্রে। অন্য

বাউলের একই জায়গায় দুই ইঞ্চি ডায়ার খাটো একটা রড ঠেলে বেরিয়ে আছে। রডটা প্যাঁচ কাটা, যাতে হ্যানোমাগ জাগারনাটে করে বয়ে আনা দেড় ফুটি পাইপটার প্যাঁচ কাটা প্রান্তে জুড়ে দেয়া যায় ওটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

সবশেষের আইটেমটি জার্মান ক্যাম্পার ভ্যান মালিকের ছেলেমেয়ের খেলার বল। ওপরের রঙচঙে রাবারের খোলটা কেটে ফেলল সেমিয়ানভ। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল আরেকটা ধাতব বল, ত্রিশ কেজি ওজনের। এটাও ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ। আবার রানিং কমেন্ট্রি দেয়ার কথা খেয়াল হলো বিজ্ঞানীর। 'এটা ইউরেনিয়ামের একটা বল, ওপরটা পাতলা সীসা দিয়ে মোড়া।'

সবগুলো কমপোনেন্টের ওপর নজর বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো নিউক্লিয়ার সাইনটিস্ট। এবার স্টীলের ফাইলিং কেবিনেট নিয়ে পড়ল সে। ওটাকে মেঝের ওপর শুইয়ে দরজা হাট্ করে খুলে রাখল। তারপর খুদে কড়িকাঠ ও ব্যাটন দিয়ে ওটার ভেতরে একটা ইনার ফ্রেম তৈরি করল। ফ্রেমটা মুড়ে দিল সে পুরু শক্-অ্যাবজরবেন্ট ফোম রাবার দিয়ে।

'দু'পাশে এবং ওপরেও ফোম জুড়বার ব্যবস্থা করতে হবে পরে,' ব্যাখ্যা করল সেমিয়ানভ। 'বোমা ভেতরে সেট করার পর।'

ব্যাটারি চারটে পাশাপাশি সাজিয়ে একটার সঙ্গে অন্যটার টার্মিনাল পেঁচিয়ে লাগাতে আরম্ভ করল এবার লোকটা। তারপর মাস্কিং টেপ দিয়ে সবগুলো ব্যাটারি গায়ে গায়ে লাগিয়ে শক্ত করে আটকে দিল যাতে একটা অন্যটা থেকে আলাদা হতে না পারে। ড্রিল মেশিন দিয়ে কেবিনেটের দরজায় চারটে ছিদ্র করল সে। তারপর দরজার ভেতরদিকে ব্যাটারি ব্লকটা ঠেকিয়ে ফুটোর মধ্যে দিয়ে তার কয়েকবার করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জুড়ে দিল ওটা দরজার সঙ্গে। তখন মাঝ দুপুর।

'নিউক্লিয়ার বোমা দেখেছেন কখনও?' প্রশ্ন করল সেমিয়ানভ।

'না,' ফ্যাসফেঁসে শোনাল তাতায়েভের কণ্ঠ। আন-আর্মড কমব্যাটে সে একজন এক্সপার্ট। পিস্তল-ছুরি চালনাতেও 'এ' ক্লাস সার্টিফিকেট রয়েছে তার। কিন্তু এই মাঠে একেবারেই আনাড়ি। একটা ছোটখাট শহর উড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে যে জিনিসগুলো, তা নিয়ে সেমিয়ানভ ঠাণ্ডা মাথায় যে-সব কাণ্ড করছে, দেখে গলা শুকিয়ে এসেছে তার।

'এক সময় ছিল, যখন এ কাজ ছিল খুবই কঠিন। খুব অল্প শক্তির নিউক্লিয়ার বোমাও আকারে বিশাল হত। ল্যাবরেটরির সাহায্য ছাড়া তৈরি করার কথা ভাবাও যেত না। কিন্তু সে দিন আর নেই। একটা বেসিক অ্যাটমিক বোমা আজকাল একটা ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর বসেও তৈরি করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় কমপোনেন্ট, একটু সতর্কতা, আর নোহাউ, এই তিনটে হলেই হলো।'

'তাই তো দেখছি,' ঢোক গিলল তাতায়েভ।

ইউরেনিয়াম বলের ওপরকার পাতলা সীসার আবরণ কেটে ফেলল সেমিয়ানভ। আসল জিনিসের ওপর চোখ বোলাল। বলটা পাঁচ ইঞ্চি ডায়ার। ঠিক মধ্যিখানে দুই ইঞ্চি ডায়ার এক ফুটো, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। একদিকে চার-পাঁচটা হালকা গর্ত আছে বলটার গায়ে।

'এর কি কাজ জানতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'বোমার সুইচ অন্ করা হলে এটা ফিজ করতে আরম্ভ করে। কোল্ড ড্রিঙ্কস্ বা শ্যাম্পেন গ্লাসে ঢালার পর যেমন মৃদু হিস্ হিস্ আওয়াজ ওঠে, ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। আপনাকে বোঝাবার জন্যে বলছি, শব্দ কিন্তু আসলে হয় না। ফিজ করে ঠিকই, তবে সেটা রেডিওঅ্যাকটিভ টার্মে। ওই ফিজ গিয়ে আঘাত করে ডেটোনেটরে,' মেজরকে ঠোঁট চাটতে দেখে দ্রুত যোগ করল সেমিয়ানভ, 'না, এখনই তেমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে না। পুরোটা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ভয়ের কিছু নেই।'

'গ্রেট।'

'এই যে এটা,' ফায়ার এক্সটিংগুইশার থেকে বের করা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা রডটা তুলে নিল বিজ্ঞানী। 'বলের এই ফুটো দিয়ে যখন ঢুকিয়ে দেয়া হবে এই রড, তখন ক্রিটিক্যাল পর্যায়ে পৌঁছবে জিনিসটা। ওই যে দেড় ফুট লম্বা টিউব, বন্দুকের নলের মত, ওর ভেতর দিয়ে বুলেটের বেগে ছুটবে এই রডটা। যখন...'

'বুম!' সমঝদারের মত মাথা দোলাল ভ্যালেরি তাতায়েভ।

ঠোঁট মুড়ে হাসল সেমিয়ানভ। 'নট কোয়াইট। বুম হবে, তবে যখন ইনিশিয়েটর সেট করা থাকবে তখন। ওই যে লিথিয়াম আর পলোনিয়ামের দুই ডিস্ক, ও দুটোই হলো সেই জিনিস। দুটো আলাদা আলাদা যতক্ষণ আছে, চিন্তা নেই। কিন্তু এক হলেই বদ কম্মটি ঘটিয়ে বসবে। রিঅ্যাকশন ঘটতে শুরু করবে। ঝড়ের বেগে নিউট্রন ছড়াতে শুরু করবে ওরা। এবং এই ইউরেনিয়াম বল ও টিউব অবিশ্বাস্য শক্তিতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে নিজেদের। অ্যাণ্ড দ্যাট উইল টেক ওয়ান হাণ্ড্রেড মিলিয়নথ্ অভ আ সেকেণ্ড।'

'বুঝলাম না। আরেকটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন।'

'বেশ।' মুখ দেখে মনে হলো ওস্তাদি দেখাবার সুযোগ পেয়ে খুশিই হয়েছে নিউক্লিয়ার সাইনটিস্ট। 'দেখতে থাকুন।'

পলোনিয়াম ডিস্কটার এক পিঠে এক ফোঁটা সুপারগ্লু লাগাল বিজ্ঞানী, তারপর জুতোর হিল থেকে সংগৃহীত খাঁজ কাটা স্টীল ডিস্কের সঙ্গে জুড়ে দিল ওটা। পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে গেল ডিস্ক দুটো। এবার পলোনিয়াম চাকতিটা ভেতর দিকে রেখে দুই হেড ল্যাম্প বাউলের মধ্যে যেটার প্যাঁচ কাটা ফুটো আছে পিছনে, সেটার সঙ্গে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে টাইট করে লাগিয়ে দিল সে স্টীল ডিস্ক। এরপর বাউলটা চিত করে

ইউরেনিয়াম বলটা রাখল তার পেটের ভেতর। পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকল পলোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম।

বাউলের ভেতরে চার-পাঁচটা খুদে টিপিমত আছে। বলের গর্তগুলোর মধ্যে ঢুকে গেল টিপিগুলো নিখুঁতভাবে। একচুলও নড়ছে না এখন বল। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে বলের ছিদ্র দিয়ে তলার দিকটা দেখল বিজ্ঞানী। বলের দুই ইঞ্চি ডায়া ছিদ্রের সঙ্গে তলায় বসানো দুই ইঞ্চি ডায়ার পলোনিয়াম ডিস্কটা একদম মুখে মুখে সেট হয়েছে।

এবার অন্য বাউলটা তার ওপর উপুড় করে বসাল সেমিয়ানভ। একটা গোলকের আকার পেয়েছে এখন বাউলজোড়া। ষোলোটা নাট-বোল্ট জুড়ে বাউল দুটো যুক্ত করল সে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজটা সারতে হলো তাকে। সময় ব্যয় হলো পুরো এক ঘণ্টা।

'এইবার বন্দুক,' মন্তব্য করল বিজ্ঞানী।

দেড় ফুটি টিউবটা তুলে নিল সে। দলা পাকানো আধ পাউণ্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ঢুকিয়ে দিল ভেতরে খোলা মুখ দিয়ে। কিচেন থেকে লম্বা হাতলওয়ালা একটা ঝাড়ু আনাল সে তাতায়েভকে দিয়ে, ওটার হাতল দিয়ে তলার দিকে যতটা যায়, চেপে চেপে, ঠেসে ঢোকানো হলো বলটা। তারপর টর্চ জ্বেলে ভেতরটা দেখল আবার সেমিয়ানভ। মাথা দোলাল সন্তুষ্ট হয়ে।

এবার সুপারগ্লুর সাহায্যে পাঁচ ইঞ্চি ইউরেনিয়াম রডের এক মাথায় দ্বিতীয় জুতো থেকে পাওয়া লিথিয়াম ডিস্কটি সাঁটিয়ে দিল সে শক্ত করে। শক্ অ্যাবজরবিঙ টিস্যু দিয়ে খুব ভাল করে মুড়ে নিল ও দুটো, তারপর ডিস্ক নিচের দিকে রেখে রডটা সেঁধিয়ে দিল টিউবে, ঝাড়ুর হাতল দিয়ে ঠেসে তলায় বসানো প্লাস্টিকের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিল লিথিয়াম ডিস্ক। টিস্যু দিয়ে মোড়া হলো যাতে ভাইব্রেশনের ফলে পিছলে সামনে চলে আসতে

না পারে ওটা। সংযোগটা মজবুত করার জন্যে আরও খানিক চাপাচাপি করা হলো জিনিসটা হাতল দিয়ে। একসময় সন্তুষ্ট হলো বিজ্ঞানী, দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়েছে ও দুটো।

এবার যে বাউলটির পিছনদিকটায় প্যাঁচ কাটা দুই ইঞ্চি রডমত আছে, টিউবের উন্মুক্ত প্রান্তের ভেতরের থ্রেডের সঙ্গে যতদূর সম্ভব শক্ত করে আটকে দেয়া হলো সেদিকটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। জিনিসটা দেখতে হলো একটা ব্যাটনের মাথায় সাত ইঞ্চি ব্যাসের একটা বল বসিয়ে প্রস্তুত অর্থহীন কিছু একটার মত। বা বড় আকারের স্টিক গ্রেনেডের মত।

'হয়ে এসেছে প্রায়,' বলল সেমিয়ানভ। 'বাকিটুকু সেরে নিয়ে বলছি।'

সরু শিশির মত দেখতে কাঁচের ডেটোনেটরটা তুলে নিল সে এবার। এক মাথা দিয়ে বেরিয়ে থাকা রঙিন তার দুটো নিরাপত্তার খাতিরে টেনে সরিয়ে দিল দু'দিকে। ফাইভ এএমপি ফ্লেক্সের রোল থেকে এক ফুট আকারের দুটো খণ্ড বের করে কালার কোড অনুযায়ী ডেটোনেটরের দুই তারের সঙ্গে ওগুলোর এক প্রান্ত করে জুড়ে দিল সে। জোড়া দুটো মাস্কিং টেপ দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে মুড়ে ফেলল সেমিয়ানভ।

বেখেয়ালে কাজের সময় যদি একটা অন্যটার ছোঁয়া পায়, প্রিম্যাচিওর ডেটোনেশন ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এবার টিউবের সীলড তলার মাঝখানে যে ছোট ছিদ্র, ওটা দিয়ে ডেটোনেটরের কোঁচকানো, সুচোল মাথাটা আলতো করে ঢুকিয়ে দিল বিজ্ঞানী। বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিতে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের ভেতরে ঢুকে গেল ওর প্রান্ত। পরখ করে দেখল সেমিয়ানভ, ঠিকমতই বিঁধেছে। নড়াচড়া করছে না।

আস্ত বোমাটা আলগোছে কেবিনেটের ভেতরে প্যাডের বিছানায় শুইয়ে দিল এবার লোকটা। আরও এক ফুট ফ্লেক্স কাটল সে কয়েল থেকে। ওটার এক মাথা ব্যাটারি ব্লকের পজিটিভ টার্মিন্যালের সঙ্গে আটকে টেপ পেঁচিয়ে দিল। অন্য মাথা পড়ে থাকল পাশে, পরে কাজে লাগবে।

ডেটোনেটরের দুই তার দু'হাতে তুলে তাতায়েভের দিকে তাকাল নিউক্লিয়ার সাইনটিস্ট। দাড়ির ফাঁকে মধুর হাসি। 'এখন,' বলল সে, 'যদি এই দুটি তার ওপরের আবরণ কেটে ফেলার পর কোনমতে এক হয়, দ্যাট উইল স্পেল ব্যাড নিউজ। এই যে ডেটোনেটর, এটা অ্যাকটিভেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটুকু ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এই উত্তাপ প্রথমে লিথিয়ামকে এবং লিথিয়াম ইউরেনিয়াম রডটিকে ওপরদিকে সজোরে ঠেলে দেবে। ফিজ শুরু হয়ে যাবে তার আগেই।

'এই দুই শক্তি টিউবের গা ঘেঁষে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে টিউবের মাথার ফুটো গলে ঢুকে পড়বে এই বলের ভেতর, এবং প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেদের একসঙ্গে বিস্ফোরিত করবে ওরা সবাই। দ্যাট'স ইট।'

টাইমার ডিভাইসে হাত লাগায়নি এখনও সেমিয়ানভ। পাশেই সঙ্গীহীন পড়ে আছে ওটা। হাই-স্পীড ড্রিল মেশিনের সাহায্যে ফাইলিং কেবিনেটের দরজায় আরও পাঁচটা ফুটো করল সে। চার কোণে চারটে, মাঝখানে একটা। ডেটোনেটরের সঙ্গে লাগানো ফ্লেক্সের একটা ব্যাটারি ব্লকের নেগেটিভ টার্মিন্যালে জুড়ল এবার বিজ্ঞানী। তারপর পজিটিভ টার্মিন্যালে আগেই লাগানো ফ্লেক্সের এক মাথা এবং ডেটোনেটরের অন্য ফ্লেক্সটির মাথা মাঝখানের ফুটোটা গলিয়ে দরজার বাইরে নিয়ে এল।

এরপর ঝাঁকি বা দুলুনিতে বোমা যাতে নড়াচড়া করতে না পারে, সেজন্যে ওটার চারদিকে আচ্ছা করে ফোম ইনসুলিশন চাপাল সেমিয়ানভ, একেবারে ভরে ফেলল খুদে কেবিনেট। টাইমার ডিভাইসটা চার ফুটোয় চারটে স্ক্রু বসিয়ে ফিট্ করল সে আস্তে ধীরে। ভাল করে কষে প্যাঁচ এঁটে দিল। টেনেটুনে দেখল বেশ মজবুত হয়েছে সংযোগটা। এবার কালার কোড মিলিয়ে টাইমারের সঙ্গে ফ্লেক্স দুটো জুড়ে দিল লোকটা। তাতায়েভের নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার শব্দে হেসে অভয় দিয়ে বলল সে,

'ভয়ের কিচ্ছু নেই। এই টাইমার পাঠানোর আগে বহুবার চেক্ করে দেখা হয়েছে। কাটআউট বা সার্কিট-ব্রেকারে কোন খুঁত নেই এর।'

টাইমার-ফ্লেক্সের সংযোগ প্রচুর টেপ খরচ করে জোড়া লাগাল বিজ্ঞানী। কেবিনেটের দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল। এবং সবশেষে চাবিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল টোকা মেরে। 'হিয়ার ইট ইজ, ক্যাচ!'

ফোঁস করে চেপে রাখা দম ছাড়ল ভ্যালেরি তাতায়েভ। লুফে নিল চাবিটা, চালান করে দিল ট্রাউজারের পকেটে।

'সো, কমরেড ফ্ল্যানারি, আমার কর্তব্য শেষ। ট্রলিতে বসিয়ে কেবিনেটটা যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারেন, বোমার কোন ক্ষতি হবে না তাতে। চাইলে গাড়িতে উঠিয়ে লম্বা একটা ড্রাইভ দিয়েও আসতে পারেন, তাতেও কিছু আসবে যাবে না। আর এই যে,' টাইমারের হলুদ সুইচটা দেখাল সেমিয়ানভ। 'এটা পুশ করলে শুরু হয়ে যাবে কাজ। তবে ইলেকট্রিক সার্কিট পুরো হতে দু'ঘণ্টা লাগবে এটার ক্ষেত্রে। কারণ সে ভাবেই সেট করা হয়েছে ডিভাইস। আপনার জন্যে। এই সময়ের মধ্যে যাতে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারেন আপনি, সেই জন্যে। ঠিক দু'ঘণ্টা পর ফাটবে বোমা।

'আর লালটা ম্যানুয়াল ওভাররাইড। তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে।'

নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্টের জানা নেই যে কথাটা আদৌ সত্যি নয়। তাকে যা বলা হয়েছে, তাই সে বলে গেছে। আসলে হলুদে আর লালে কোন তফাৎ নেই, দুটোই ম্যানুয়াল ওভাররাইড—সেট করা হয়েছে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের জন্যে।

আঁধার হয়ে গেছে বাইরে। আলো জ্বেলে দিল তাতায়েভ। অপ্রয়োজনীয় সবকিছু গারবেজ ব্যাগে ভরে ফেলেছে ততক্ষণে বিজ্ঞানী। 'এবার পেটে কিছু না দিলেই নয়, কমরেড,' বলল সে। 'সঙ্গে দু'চার পেগ

হুইস্কি হলে ভাল হয়। তারপর লম্বা ঘুম দিয়ে সকালে ফিরতি পথ ধরতে চাই।'

'নিশ্চই নিশ্চই।'

পরদিন সকালে সেমিয়ানভকে নিয়ে হিথ্রো রওনা হলো ভ্যালেরি তাতায়েভ। কলচেস্টারের দক্ষিণ পশ্চিমের এক ঘন বন অতিক্রম করার সময় পথের পাশে সেলুন দাঁড় করাল মেজর। তলপেটের ভার মুক্ত না করে পারা যাচ্ছে না। বনের ভেতর ঢুকল সে কাজ সারতে। কয়েক মুহূর্ত পর তার চাপা কণ্ঠের আর্ত চিৎকারে চমকে উঠল সেমিয়ানভ, গাড়ি থেকে নেমেই তীরবেগে ছুটল আওয়াজ লক্ষ্য করে।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে বুঝল বোকা বিজ্ঞানী, কি ভুল সে করেছে। ঘাড়ের ওপর কারাতের ভয়ঙ্কর এক কোপ খেয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা। মৃত্যু হয়েছে তার দেহ মাটি স্পর্শ করার আগেই। মৃতদেহটা টেনে খানিকটা গভীরে নিয়ে গেল তাতায়েভ। খুলে ফেলল পরনের কাপড়-চোপড়। একটা গর্তে ফেলে ডালপালা দিয়ে লাশটা ঢেকে ফেলল সে।

এমনিতে জানাজানির চান্স নেই। তবে পচে গন্ধ ছড়ালে খোঁজ পড়বে। তাতে চার-পাঁচদিন, এমনকি পুরো এক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে। তারপর পুলিস এনকোয়ারি হবে নিশ্চয়ই, হয়তো স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সেমিয়ানভের ছবিও ছাপা হবে। ফোলা মুখের সে চেহারা মনে হয় না চিনতে পারবে তাতায়েভের প্রতিবেশি ডানকান রস।

আর চিনতে পারলেই বা কি? সে তো তার অনেক আগেই হাওয়া হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে আরও কয়েকটা ডাল ভেঙে এনে ফেলল সে স্তূপের ওপর। তারপর বিজ্ঞানীর শার্ট-ট্রাউজার ইত্যাদি জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে তাতে ভরল মেজর। ওগুলোয় লোকটার পরিচয় লেখা নেই বটে, তবে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করলেই

বোঝা যাবে ওসব রাশিয়ায় তৈরি।

বেন্টওয়াটার্সের ধারেকাছে তাই এ জিনিস সে আবিষ্কৃত হতে দিতে পারে না। সেলুন ঘুরিয়ে ইপসউইচ ফিরে যেতে যেতে ভাবল তাতায়েভ, গারবেজ ব্যাগের সঙ্গে এগুলোরও একটা বিহিত করতে হবে তাকে আজ রাতেই। বিজ্ঞানীকে হত্যা করতে হয়েছে বলে মনে বিন্দুমাত্র আফসোস নেই ভ্যালেরি তাতায়েভের। লোকটার বিহিত করার ব্যাপারে মস্কোর নির্দেশই কেবল সে পালন করেছে, অন্য সব নির্দেশের মত। লোকটা কি করে ভাবল যে দেশে ফিরে যেতে পারবে সে, মাথায় এল না মেজরের।

অন্য সমস্যা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করল তাতায়েভ। এর মধ্যে রেনডলেসহ্যাম ফরেস্ট ঘুরে এসেছে সে দু'-দু'বার। স্পট ঠিক করে রেখে এসেছে। জায়গাটা বিমান ঘাঁটির পেরিমিটার ফেন্সের মাত্র একশো গজ তফাতে। ভোর চারটেয় ট্রলি নিয়ে পৌঁছবে সে জায়গামত, টেরটিও পাবে না কেউ। তারপর হলুদ বোতামটা টিপে দিয়ে বিজ্ঞানীর মতই তার কর্মটিকেও ভালমত ডালপালা দিয়ে আড়াল করে রেখে প্রাণপণে গাড়ি হাঁকাবে লণ্ডনের উদ্দেশে।

এ সব জানা আছে কেজিবির তুখোড় ইললিগ্যালস ভ্যালেরি তাতায়েভের। কেবল জানা নেই কোন দিন বোমা ফাটাতে হবে। ওটা তাকে জেনে নিতে হবে। সব প্রস্তুত, কাজেই আজই তাকে স্কোয়ার্ট মেসেজ ট্র্যান্সমিট করতে হবে। তারপর প্রতিরাতে রেডিও মস্কো থেকে প্রচারিত ইংরেজি ভাষার অনুষ্ঠান, বিশেষ করে রাত দশটার খবরের প্রথম নিউজ আইটেমটা শুনতে হবে তাকে। খবর-পাঠকই জানাবে তাকে কবে কাজটা করতে হবে। প্রথম আইটেম পাঠ করার শুরুতেই ইচ্ছেকৃত একটা ভুল করবে সে। ওটাই তার সঙ্কেত। ওই রাতেই ঝামেলা শেষ করে ভাগবে মেজর প্রাণ নিয়ে।

আজই শেষ স্কোয়ার্ট পাঠাবে সে। আর প্রয়োজন পড়বে না। তারপর পপলার ট্র্যান্সমিটারের স্লীপার পাহারাদারের ব্যবস্থা। সে ব্যাপারেও পরিষ্কার নির্দেশ আছে মস্কোর। ভবিষ্যতে ওদের আর প্রয়োজন পড়বে না কোনদিনও। সন্ধের একটু পর চেরিহে'জ ক্লোজ ত্যাগ করল তাতায়েভ। থেটফোর্ডে পৌঁছল রাত ন'টার দিকে।

সেলুন গ্যারেজে রেখে পরনের কাপড়ের ওপরই লেদার জ্যাকেট-ট্রাউজার পরল সে। তারওপর চাপাল রেইনকোট। পায়ে দিল জ্যাকবুট। সবশেষে ভাইজরড্ হেলমেট। বিএমডব্লিউ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। রওনা হলো উত্তর-পশ্চিমে, ব্রিটিশ মিডল্যাণ্ডের দিকে।

এগারো

রাত দশটা। খোলা জানালার সামনে বসে আছে মাসুদ রানা। তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে রয়েছে সামনের অন্ধকার বাড়িটির দিকে। অন্য দুই জানালায় রয়েছে আরও চারজন। এ বেলা ব্রায়ান স্মিথ, গিলটি মিয়া ও পুলিসের দুই ওয়াচার নজর রাখছে দুই গ্রীকের ওপর। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে রানার দুশ্চিন্তা। চেক স্পাইটিকে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছে কি না, সবে ভাবতে শুরু করেছে রানা, এই সময় কমিউনিকেটরে গিলটি মিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল।

'স্যার, হারামী দুটোর ন্যাজ নড়তে শুরু করেচে বোদহায়।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সিধে হলো মাসুদ রানা। অন্য সবাই একযোগে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে। 'যমজ দু'ভাইয়ের কথা বলছ?'

'ওই হলো,' উত্তর দিল গিলটি মিয়া। 'একই কতা।'

'কি হয়েছে?'

'আজব এক কাণ্ড, স্যার। একটু আগে ওদের টেলিফোনে দু'বার রিঙ বেজে থেমে গেচে। এক মিনিট পর ফের দু'বার বেজে ঠাণ্ডা মেরে গেচে। এইমাত্র আবারও ঘটেচে ব্যাপারটা। পর পর তিনবার।'

'ওরা কেউ ধরেছে টেলিফোন?' উত্তেজনায় মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে রানার।

'না, স্যার। সে চেষ্টাই করেনি কেউ...স্যার!'

'কি হয়েছে, গিলটি মিয়া?'

'স্যার, ওদের একটা বেরিয়ে আসচে পেচন দরজা দিয়ে। গাড়িতে গিয়ে উটেচে।'

'তুমি ওখানেই থাকো,' চাপা গলায় দ্রুত নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। 'স্মিথকে বলো অন্যদের নিয়ে ওকে ফলো করতে। লোকটা শহর ত্যাগ করছে হয়তো।'

কিন্তু না। পাঁচ মিনিট পরই সামনের রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেল মাসুদ রানা। অ্যানড্রিয়াস স্টেফানিডেস ফিরে এসেছে বাসায় অসময়ে। গাড়ি গ্যারেজে রেখে ঘরে ঢুকল সে। বন্ধ করে দিল দরজা। ভারি পর্দার ওপাশে আলোর আভাস টের পাওয়া গেল একটু পরই। তারপর সব চুপচাপ, কোন তৎপরতা নেই। কোথাও টেলিফোনও করছে না লোকটা।

এগারোটা বিশে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিল স্পিরিডন। অস্বাভাবিক! মন্তব্য করল পুলিসের এক ওয়াচার। বারোটার আগে কোনদিন এমন হতে দেখেনি সে গত তিন বছরে। ওদেরকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল মাসুদ

রানা। পুলিসের দুটো আনমার্কড ভ্যানে আছে ওরা। ধীর গতিতে ওদেরকে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘোরাঘুরি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল রানা।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরে এল স্পিরিডন। তারপর আবার নীরবতা। আলো জ্বলছে এখনও ভেতরে।

বারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি থাকতে ঘড়মড় আওয়াজ উঠল মাসুদ রানার সেটে। 'এক লোককে দেখতে পাচ্ছি, চীফ,' বলল স্মিথ চাপা কণ্ঠে।

'কোথায়?'

'ক্রস স্ট্রীট আর কম্পটন স্ট্রীট জাংশনে।'

'কি করছে?'

'কিচুই না,' উত্তর দিল গিলটি মিয়া। 'অন্ধকারে স্রেফ ডেঁড়িয়ে আচে।'

'নজর রাখো। এদিকেই আসবে ও।'

ঘরের ভেতর কালিগোলা অন্ধকার। কার্টেন সরান। জানালার কিনারা থেকে সামান্য পিছিয়ে বসেছে ওরা সবাই। সুপার স্যাম রসটনের দেয়া ক্যামেরাটা গলায় ঝোলাল মাসুদ রানা। ইনফ্রা রেড লেন্সে চোখ রেখে বাইরে তাকাল। বিশ গজ দূরের একটা লাইট পোস্ট স্পষ্ট করে তুলল ফোকাসিং নব্ ঘুরিয়ে। যদি আসে লোকটা এদিকে, যদি নয়, আসবেই সে। এবং ওর নিচে দিয়েই আসবে। তখন ছবি তুলবে ও লোকটার।

'পা বাড়িয়েছে! আপনার দিকেই যাচ্ছে, চীফ।'

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। ক্যামেরা দু'হাতে বুকের কাছে ধরা। গরম রক্তের নাচন শুরু হয়ে গেছে শিরায় শিরায়। নাক কান দিয়ে গরম ভাপ্ বেরচ্ছে।

'লম্বা ছয় ফুটের ওপরে,' বলল ব্রায়ান। 'গাঢ় রেইনকোট পরা।'

এক মিনিট পর হঠাৎ করেই লাইট পোস্টের নিচে উদয় হল দীর্ঘ কাঠামোটা। মেশিনের মত পর পর পাঁচবার শাটার টিপল মাসুদ রানা।

ফ্ল্যাশহীন ক্যামেরা নিঃশব্দে কাজ সারল তার। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে ঊনষাট নম্বর বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

মৃদু নকের আওয়াজ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। হলরূমটা অন্ধকার। দেখা গেল না কিছু। এক মুহূর্ত পরই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ক্যামেরার ব্যাক কাভার খুলে দ্রুত ফিল্মটা বের করে আনল মাসুদ রানা। কি যেন একটা মনে পড়ব পড়ব করছে ওর, অথচ পড়ছে না। লোকটার কোথায় যেন কি এক অসামঞ্জস্য চোখে পড়েছে রানার। কি সেটা?

বিএসএসের হ্যারি নিগেলের হাতে রোলটা তুলে দিল ও নীরবে। কিছু বলার প্রয়োজন হলো না। লোকটা জানে কি করতে হবে। ওটা নিয়ে স্থানীয় পুলিস ল্যাবে যাবে নিগেল। ছবি ডেভলপ করিয়ে ফিরে আসবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিগেল দুই মিনিটের ভেতর।

হঠাৎ করেই খেয়াল পড়ল রানার ব্যাপারটা। রেইনকোট! রেইনকোট কেন পরে ছিল সে? বৃষ্টির দেখা নেই, অথচ রেইনকোট! কেন? সঙ্গে নিয়ে আসা কিছু লুকিয়ে রাখার জন্যে? 'লোকটার পরনে কি ছিল, স্মিথ?'

'রেইনকোট, চীফ।'

'আর?'

'জ্যাকবুট।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। বাকি চার জনের উদ্দেশে চাপা কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেরোও সবাই! লোকটা মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। ধারেকাছেই কোথাও রেখে এসেছে ওটা। খুঁজে বের করো গিয়ে। গাড়ি নিয়ে নয়, পায়ে হেঁটে খোঁজো। ফাস্ট, ফাস্ট!'

দুদ্দাড় করে ছুটল সবাই। কমিউনিকেটরের সাহায্যে একই নির্দেশ দিল রানা বাইরের সবাইকে। "পাওয়া গেলে ওটার রিয়ার মাডগার্ডে ডিএফ ব্লীপার প্ল্যান্ট করতে হবে,' স্মিথকে বলল ও। 'মুভ! সব রাস্তা খুঁজে

দেখো।'

কতক্ষণ থাকবে লোকটা ও বাড়িতে? ভাবতে লাগল মাসুদ রানা, দশ মিনিট, বিশ মিনিট, এক ঘণ্টা? নাকি-এখনই বেরিয়ে আসবে? ইয়াল্লা! আর অন্তত কিছুক্ষণ যেন থাকে লোকটা। হাতের কাছে নিচু একটা টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল মাসুদ রানা। এ বাড়ির প্রায় প্রতিটি রুমেই টেলিফোন প্লাগ আছে। বলতে হয়নি, প্রয়োজন হতে পারে ভেবে ব্যারি ব্যাংকস্ নিজেই একটা সেট জুড়ে দিয়ে গেছেন ওদের সুবিধের জন্যে।

ঘুম ভাঙাল রানা পুলিস সুপারের। ঝড়ের বেগে কথা বলে গেল পাঁচ মিনিট। 'ডোন্ট উওরি,' ওর বক্তব্য শেষ হতে বললেন স্যাম রসটন। 'আমি এখনই বেরচ্ছি।'

বিশ মিনিট পর একজনের সাড়া পাওয়া গেল। লোকটা স্থানীয় পুলিসের ওয়াচার। 'মোটর সাইকেলটা পাওয়া গেছে, স্যার। বড় একটা বিএমডব্লিউ। কুইন স্ট্রীটের শেষ মাথায়। এঞ্জিন, এগজস্ট পাইপ এখনও গরম।'

'রেজিস্ট্রেশন নাম্বার?'

লিখে নিল রানা নম্বরটা। পুলিস স্টেশনে ফোন করে আবার সুপারকে ধরল ও। অনুরোধ করল যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে রানাকে জানানো হয়। পনেরো মিনিট পর খবর এল, ওটা ডরচেস্টারের জনৈক কম্পিউটর এঞ্জিনিয়ার মিস্টার মার্টিন ফ্ল্যানারির নামে রেজিস্টার্ড।

'আমার সন্দেহ ওটা হয় চুরি করা, নয়তো ফলস্ প্লেট। অথবা ব্লাইণ্ড অ্যাড্রেসও হতে পারে,' বলল মাসুদ রানা। 'আপনি ডরচেস্টার পুলিসের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা কনফার্ম করে আমাকে জানান, প্লীজ।'

ফোন রেখে কমিউনিকেটর তুলে নিল মাসুদ রানা। বাইকটায় ব্লীপার প্ল্যান্ট করে পুলিসের ওয়াচার দু'জনকে ফিরে আসার নির্দেশ দিল। ওদের

বাড়িটার ওপর নজর রাখার কাজে লাগিয়ে নিজে মাঠে নামতে চায়। ব্যারি ব্যাংকস্ দম্পতিকে কষ্ট স্বীকার করার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিল ও। গিলটি মিয়া, ব্রায়ান স্মিথ ও হ্যারি নিগেলকে সঙ্গে নিয়েছে ও, অন্যরা আপাতত এখানেই থাকছে। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রথম গাড়িতে রানা ও গিলটি মিয়া, অন্যটায় বাকি দু'জন। কোথায় কোন্ জাহান্নামে যায় লোকটা, কে জানে! দুটো গাড়ি সঙ্গে রাখাই ভাল।

সেন্ট মার্গারেট'স ড্রাইভে বসে আছে ওরা। অনেক দূরে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে মার্টিন ফ্ল্যানারির মোটর সাইকেলটা। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কোন খবর আসছে না পুলিস ওয়াচারদের তরফ থেকে। করে কি লোকটা বসে বসে? ভাবনাটা শেষ হয়নি রানার, এই সময় কথা বলে উঠল কমিউনিকেটর।

'হি ইজ মুভিঙ!'

'অল রাইট,' বলল রানা। 'স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সুপারকে ঠিক এক ঘণ্টা পর ইন করতে বলবেন ফিফটি নাইনে।' ড্যাশবোর্ডের ওপর যন্ত্রটা রাখল ও। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর রেইনকোট পরা দীর্ঘ ছায়াটা উদয় হলো বিএমডব্লিউর পাশে। স্টার্ট নিল দৈত্যাকার বাইক। চলতে শুরু করবে এখনই।

কোন ব্যস্ততা নেই রানার। সামনের প্যানেলে ফিট্ করা ব্লীপার কনসোলের ওপর সেঁটে আছে দৃষ্টি। জিনিসটা খুদে রাডার স্ক্রীনের মত দেখতে। উজ্জ্বল একটা বিন্দু খানিক পর পর পর্দার এক মাথায় উদয় হচ্ছে, তারপর সোজা গিয়ে ও মাথা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যান্টেড ব্লীপার মুভ করলেই ওটার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, পথ দেখাতে আরম্ভ করবে

সে।

আচমকা জার্ক করল বিন্দুটা, চলতে শুরু করেছে বিএমডব্লিউ। 'এক মাইল এগিয়ে থাকার সুযোগ দিচ্ছি ওকে,' দ্বিতীয় গাড়ির আরোহীদের জানাল মাসুদ রানা। 'তারপর।'

শহরের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে এগোচ্ছে বিন্দুটা। সময় মত গিয়ার দিল রানা, রওনা হয়ে গেল। শহর ছেড়ে এ-সিক্স সেভেনটিনে পড়ল মোটর সাইকেল, ম্যানসফিল্ড-নিউআর্কের দিকে চলেছে। ওটা যদি কার হত, খুশি হত মাসুদ রানা। দু'পেয়ে যান অনুসরণ করা মুশকিল। বিশেষ করে দিনের বেলা। প্রয়োজনে উড়ে চলে ওগুলো। তবে লোকটার বুদ্ধি আছে, এ কাজে ঠিক জিনিসটিই বেছে নিয়েছে। ওর জায়গায় রানা হলেও তাই করত।

প্রয়োজনে ইচ্ছেমত মাঠ-ঘাট পেরিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়া সম্ভব। যেখানে কার চলতে পারবে না, সে-সব জায়গায় ওগুলো চলবে তুফানের মত। ঠিক কাজই করেছে মার্টিন ফ্ল্যানারি, ওরফে যেই হোক, ভাবল রানা।

একই গতিতে ড্রাইভ করছে লোকটা, স্পীড লিমিট ব্রেক করছে না। বরং কখনও কখনও স্বাভাবিক গতির চেয়ে কম গতিতে চালাচ্ছে। বাঁক নেয়ার সময় ঘটছে ব্যাপারটা। ঘুমন্ত ম্যানসফিল্ড পেরিয়ে নিউআর্কের দিকে চলল এবার সে। শহরে নাক ঢোকাবার আগে গতি কমে এল তার। কারের সঙ্গে মোটর সাইকেলের ব্যবধান কমে আসতে লাগল খুব দ্রুত।

হেডলাইট নিভে গেল পিছনের দুই কারের। থেমে দাঁড়াল সাইড করে। সরু একটা গলিতে মোটর সাইকেল রেখে বড় রাস্তায় ফিরে এল তাতায়েভ। ঝাড়া দশ মিনিট পিছনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। পিছনে ওরাও বসে থাকল চুপ করে একটা বড় ট্রাক বাতাসে ঝড় তুলে নিউআর্কের দিকে ছুটে গেল কেবল। তারপর আর কিছু নেই।

ফিরে এসে গাড়িতে উঠল ভ্যালেরি তাতায়েভ। রওনা হয়ে গেল আবার। পিছু নিল জোড়া সেডান। মাঝে এক মাইল দূরত্ব রেখে এগোতে লাগল। ট্রেন্ট নদী পর্যন্ত চলল একনাগাড় ধাওয়া। ডানে বিশাল এক সুগার রিফাইনারি রেখে যখন শহরে পৌঁছল ওরা, তখন তিনটে বাজে। শহর ছাড়িয়ে এ-সেভেনটিন ধরল মোটর সাইকেল—স্লিফোর্ড চলেছে।

চেস্টারফিল্ড। সুপারিনটেনডেন্ট স্যাম রসটনের নেতৃত্বে বারোজন পুলিসের একটি দল কম্পটন স্ট্রীটের ঊনষাট নম্বর বাড়ির ওপর চড়াও হলো দুটো পঞ্চান্ন মিনিটে। সঙ্গে সাদা পোশাকের আরও দু'জন রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের। আর পাঁচ মিনিট আগে এলে দুটোকে খুব সহজেই পাকড়াও করা যেত। ব্যাপারটাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিলেন সুপার।

দলটা যখন বাড়ির মাত্র দশ ফুট দূরে, এই সময় আচমকা দরজা খুলে গেল। স্লীপার ট্র্যান্সমিটারটা নিয়ে বেরিয়ে আসছিল দুই ভাই। ওর মধ্যে তাতায়েভের রেকর্ড করা কোডেড স্কোয়ার্ট মেসেজটা রয়েছে, ওটা ট্র্যান্সমিট করতে যাচ্ছে তারা। অ্যানড্রিয়াস স্টেফানিডেস ছিল সামনে, পিছনে ট্র্যান্সমিটার হাতে স্পিরিডন স্টেফানিডেস। জমে গেল প্রথমজন।

সামনেই ইউনিফর্ম পরা পুলিস বাহিনী দেখে আঁতকে উঠল সে। 'পুলিস!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে সতর্ক করল ভাইকে, পরমুহূর্তে দু'পা পিছিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে, দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে বিশালদেহী দুই পুলিসও ঝাঁপ দিল, কাঁধ দিয়ে পড়ল তারা দরজার ওপর।

কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা এবং তার পিছনে দাঁড়ানো অ্যানড্রিয়াসকে নিয়ে ভেতরের সরু হলরুমে আছড়ে পড়ল তারা। কোনমতে ভারমুক্ত হয়েই দুই পুলিসের সঙ্গে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত লড়াই শুরু করে দিল অ্যানড্রিয়াস। নাকেমুখে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ভয়ঙ্কর এক আঘাত

বসিয়ে দিতেই ঠাণ্ডা মেরে গেল লোকটা।

এবার হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল অন্যরা। স্পিরিডনকে দেখা গেল না কোথাও। নিচতলার রুমগুলো সার্চ করে দোতলায় ছুটল সবাই। সবার আগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের দু'জন। লোকটাকে পাওয়া গেল বাথরুমে। ট্র্যান্সমিটারটা তার পায়ের কাছে, ফ্লোরে রাখা। ওটার প্লাগ ওয়াল সকেটে ঢোকানো। কনসোলে টকটকে লাল আলো জ্বলছে। বার্তাটা যাই হোক, পাঠাতে পেরেছে স্পিরিডন।

বিনা বাধায় ধরা দিল সে।

মেনউইথ হিল জিসিএইচকিউ লিস্নিঙ পোস্ট একটা সিগন্যাল স্কোয়ার্ট ইন্টারসেপ্ট করল দুটো সাতান্ন মিনিটে। ওটা ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে চেস্টারফিল্ডের পশ্চিম প্রান্তে ফুটবল গ্রাউণ্ডের কাছাকাছি থেকে, ব্যাপারটা জানা যেতেই সুপার স্যাম রসটনের সঙ্গে যোগাযোগ করল ওরা।

'আমি জানি,' হাসিমুখে উত্তর দিলেন সুপার। 'ধরে নিয়ে এসেছি ব্যাটাদের।'

মস্কো। ওয়ারেন্ট অফিসার রেডিও অপারেটর হেডফোন নামিয়ে পাশের টেলিপ্রিন্টার মেশিনটির দিকে তাকাল। মাথা দুলিয়ে বলল, 'দুর্বল সিগন্যাল। তবে বোঝা গেছে পরিষ্কার।'

স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে গেল মেশিনটা, টপাটপ টাইপ হয়ে চলেছে অর্থহীন একের পর এক শব্দ। ওটা থেমে পড়তে টাইপ হওয়া কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে বসল ওয়ারেন্ট অফিসার, ফিড করল ডিকোডার মেশিনে। ওর সঙ্গের কম্পিউটর চালু হলো এবার, প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে এল মূল বার্তাটা।

পড়ল তা রেডিও অপারেটর। হাসি ফুটল মুখে। টেলিফোন তুলে

একটা নাম্বার ঘোরাল সে। ও প্রান্তের সাড়া পেয়ে নিজের পরিচয় জানাল প্রথমে, তারপর যে ধরেছে ফোন তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলো। সবশেষে ঘোষণা করল ওয়ারেন্ট অফিসার, 'অরোরা ইজ ''গো''।'

স্লিফোর্ড ছেড়ে লিঙ্কনশায়ারের দিকে চলেছে এখন বিএমডব্লিউ। একসময় ওটাও অতিক্রম করল। তীরের মত সোজা হাইওয়ে ধরে ফেন কাউন্টির দিকে এগোতে লাগল। তারপর ওয়াশ এবং কাউন্টি অভ নরফোক। আরও দু'বার থেমেছিল তাতায়েভ পিছনের দিগন্তে চোখ বোলাবার জন্যে। দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচ মিনিট করে। কিন্তু দেখা পায়নি কারও।

সাটারটন গ্রামে ঢোকার মুখে খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল মাসুদ রানা। যে পথে এসেছে ওরা এতক্ষণ, সাটারটনের মাঝামাঝি জায়গায় ওয়াই-এর মত ভাগ হয়ে গেছে সেটা। একটা থেকে দ্বিতীয় হাইওয়ে; এ-সিক্সটিন, বেরিয়ে চলে গেছে সোজা দক্ষিণে, স্পালডিঙে। আর এ-সেভেনটিন গেছে দক্ষিণ-পুবে, লঙ সাটন, তারপর নরফোক কাউন্টি বর্ডার কিংস লিন।

পুরো দু'মিনিট পর কনসোলের ব্লিপ নিশ্চিত করল এ-সেভেনটিনেই রয়েছে এখনও বিএমডব্লিউ। ততক্ষণে প্রায় তিন মাইল পিছনে পড়ে গেছে ওরা। এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল রানা ফুটবোর্ডের সঙ্গে। দুই মিনিটে স্পীডোমিটারের কাঁটা উঠে গেল নব্বইয়ে। ওই গতি বজায় রাখল রানা যতক্ষণ না আগের মত এক মাইলে নেমে এল ব্যবধান।

কিংস লিনের দক্ষিণে প্রশস্ত আওজ নদী অতিক্রম করল ওরা। ব্রিজ থেকে নেমে মাইলখানেক এগিয়েই ডানের বাই-পাস রোড ধরল মোটর সাইকেল। ডাউনহ্যাম মার্কেট হয়ে থেটফোর্ড গেছে ওটা।

'জ্বালিয়ে মারলে তো হারামজাদা,' আর সহ্য করতে না পেরে বিড়বিড় করে বলল গিলটি মিয়া।

'আর বেশি দেরি নেই,' বলল রানা। 'আশেপাশেই কোথাও ঘাঁটি ওর যতদূর মনে হয়। আলো ফোটার আগেই সেখানে পৌঁছতে চাইবে লোকটা।'

কিন্তু রানার ধারণায় ভুল ছিল। আলো ফুটতে শুরু করেছে। এখনও চলছে তো চলছেই মোটর সাইকেল, থামার লক্ষণ নেই। হেডলাইট অফ করে দিল ও দশ মিনিট পর। কেবল সাইড লাইট জ্বলছে দু'পাশে।

ওরাও সাইড লাইট জ্বেলে এগোচ্ছে। অত্যন্ত ধীরগতিতে। দৈত্যাকার যাত্রীবাহী কোচের সুবিশাল এক কলাম। সাফোকের বারি সেন্ট এডমাণ্ডস অতিক্রম করছে ওরা এ মুহূর্তে। কেবল কোচই হবে দু'শোর বেশি। তার ওপর সামনের কার, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল এবং পদযাত্রীদের সংখ্যার তো কোন সীমা পরিসীমাই নেই। গজেন্দ্রচালে এগোচ্ছে লেবার পার্টির অ্যান্টি নিউক্লিয়ার মিছিল।

ব্যানার আর প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে আছে তার আগামাথা। শহর ছেড়ে এ ওয়ান ফর্টি থ্রী ধরে ইক্সওয়ার্থ জাংশনের দিকে এগোল মিছিল। ওখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ফের চলা শুরু হবে।

ডাউনহ্যাম মার্কেট ছাড়িয়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে এগোবার পর পুবদিকে ঘুরে গেল সামনের ওটা। ম্যাপের ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। এ ওয়ান থার্টি ফোর ধরেছে লোকটা। তার মানে থেটফোর্ড চলেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। সামনে চমৎকার একটি উজ্জ্বল দিনের আভাস। আধ ঘণ্টা পর কয়েক মাইল দীর্ঘ বিশাল বীচ, ওক আর পাইন বনে ঢুকল ওরা। দু'পাশে আকাশছোঁয়া সবুজ গাছ, মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে পথ।

বন পেরিয়ে গ্যালোম হিল। তারপরই থেটফোর্ড। শহরে ঢোকার আগে ফের থামতে হলো মাসুদ রানাকে। কারণ আবার থেমে দাঁড়িয়েছে

মোটর সাইকেল।

'আবার ডেঁড়িয়ে পড়েচে?' তেড়ে উঠল গিলটি মিয়া। রেগে উঠেছে।

রেঞ্জ ইণ্ডিকেটর পরীক্ষা করে বুঝল রানা, থেটফোর্ডের ঠিক মাঝখানে রয়েছে এখন লোকটা। কি করছে ওখানে সে? কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে? হতে পারে। এত দীর্ঘ পথ ড্রাইভ দিয়ে এসে খিদে ওর নিজেরও লেগেছে। দশ মিনিট অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা।

এক চুলও নড়ল না ব্লিপ পনেরো মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরও। কেমন সন্দেহ হলো রানার। ব্যাপার কি? লোকটা কি ওর গাড়িতে ব্লীপার প্ল্যান্ট করার ব্যাপার টের পেয়ে গেছে? জিনিসটা খুলে ফেলে দিয়ে কেটে পড়েছে? নাকি ওখানেই ওর ঘাঁটি? যাই হোক, চেক করে দেখার সময় হয়েছে এখন। আবার রওনা হলো রানা।

জেগে উঠেছে থেটফোর্ড। ব্লীপারের নির্দেশমত ম্যাগডালেন স্ট্রীটের একসার বন্ধ গ্যারাজের সামনে এসে থামল ওরা। গাড়ির নাক বার কয়েক ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ওর একটার সামনে স্থির করল মাসুদ রানা। টানা 'টুঁ-উঁ-উঁ' আওয়াজ করছে ব্লীপার। এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে পর্দার বিন্দুটা।

'ওটার ভেতর আছে লোকটা,' বলল মাসুদ রানা।

নেমে পড়ল সবাই গাড়ি থেকে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। যার যার অস্ত্র বের করে হাতে নিল প্রত্যেকে। তারপর পায়ে পায়ে এগোল। গ্যারেজের দরজায় তালা মারা নেই। ভেড়ানো আছে কেবল। বাঁ হাতে একটা পাল্লা ধরল মাসুদ রানা, লম্বা করে দম নিল। তারপর এক ঝট্‌কায় খুলে ফেলল দরজা। ডান হাতে উদ্যত ওয়ালথার পিপিকে। মুহূর্তে মুখটা কালো হয়ে উঠল ওর হতাশায়।

গ্যারাজের মাঝখানে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মোটর সাইকেলটা। ঘাড় কাৎ করে এক চোখে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে ওদের দিকে। যেন

নীরবে প্রশ্ন করছে, কারা তোমরা? কি চাও এখানে?

দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে রাইডারের লেদার জ্যাকেট, জিপ্ সাইডেড ট্রাউজার ও রেইনকোট। মেঝেতে পড়ে আছে জ্যাকবুট। মাটিতে আরও একজোড়া চাকার দাগ দেখে ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। ছোট আকারের কোন কারের হবে। বুঝে ফেলল রানা ব্যাপারটা। মোটর সাইকেল রেখে অনেক আগেই গাড়ি নিয়ে কেটে পড়েছে রুশ স্পাইটি। শেষ মুহূর্তে মস্ত এক ঠক্ দের দিয়ে গেছে ওদের লোকটা।

বারো

ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। অদ্ভুতরকম ধীরস্থির দেখাচ্ছে ওকে। 'লোকাল পুলিস স্টেশনে চলো।' ধারেকাছের যে কোন এয়ারবেস থেকে হেলিকপ্টার আনিয়ে ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

বেরিয়ে এল ওরা। পাঁচ মিনিটের পথ পেরিয়ে গ্রোভ লেনের পুলিস স্টেশনে পৌঁছল। ফ্রন্ট অফিসে একজন ডিউটি কনস্টেবলকে পাওয়া গেল। ভেতরে আছে আরেক সার্জেন্ট, চা পানে ব্যস্ত। নিজের পরিচয় এবং আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করল রানা ফ্রন্ট অফিসে। সব শুনে ঘাবড়ে গেল কনস্টেবল। ছুটে গিয়ে সার্জেন্টকে ডেকে নিয়ে এল। এই ফাঁকে রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করে দিয়েছে রানা। কথা বলতে চায় বিএসএস

চীফের সঙ্গে।

গিলটি মিয়া ভেতরে ঢোকেনি। দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। দুনিয়ার সব দেশের পুলিসের ওপরই তার সমান বিতৃষ্ণা। এই জাতটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই ভাল মনে করে সে।

সার্জেন্টকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল হ্যারি নিগেল, নতুন করে ব্যাখ্যা করতে লাগল ঘটনা। হাতে রানার তোলা তাতায়েভের পোস্ট কার্ড সাইজের একটা ছবি রয়েছে, ওটা দেখাল সে তাকে। সেই সঙ্গে মুখ চলছে দ্রুত। এই সময় থেটফোর্ড মোটর সাইকেল পেট্রোল টীমের এক কনস্টেবল স্টেশনের সামনে তার মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে অচেনা মুখগুলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা।

পাশ থেকে মাসুদ রানাকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর আলাপরত নিগেল আর সার্জেন্টের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ শুনেই বুঝে নিল লোকটা কি নিয়ে আলোচনা চলছে ওদের। সার্জেন্টের হাতে রয়েছে এখন তাতায়েভের ছবি। ওটায় চোখ বোলাল কনস্টেবল। পরক্ষণেই চরম বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখা গেল তার চোখেমুখে।

'আপনারা এই ভদ্রলোককে খুঁজছেন?' নিজেকে সামলাতে না পেরে কথার মাঝে কথা বলে উঠল কনস্টেবল।

'হ্যাঁ,' কথা থামিয়ে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল নিগেল। 'কেন?'

'লোকটিকে একটু আগেই দেখেছি আমি।'

'কোথায়!'

'ইক্সওয়ার্থ থর্পের সামান্য ওপাশে। আটকে গেছেন গাড়ি নিয়ে। মিছিলের জন্যে এগোতে পারছেন না।'

'কিসের মিছিল?' জানতে চাইল রানা। কথা শেষ করে উঠে এসেছে ও।

'সেকি!' অবাক হলো কনস্টেবল। 'আজ যে লেবার পার্টির অ্যান্টি নিউক্লিয়ার মিছিল হওয়ার কথা, জানেন না?'

'আপনি শিওর যে একেই দেখেছেন?'

'অফকোর্স, শিওর! আমি নিজেই তো থামিয়েছি তাকে। মিছিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত নড়ার উপায় নেই কোন গাড়ির। আর যে মিছিল, বাপরে! কয় ঘণ্টা লাগবে শেষ হতে কে জানে!'

দ্বিগুণ হয়েছে বেড়ে মিছিলের আকার। সহস্র কামানের মত গর্জন করছে জনতা অনবরত। সামনের লিটল্ ফেকেনহ্যাম নামে ছোট একটা গ্রাম তাদের গন্তব্য। ওখানকার হনিংটন ইঙ্গ-মার্কিন এয়ার ফোর্স বেজ ঘেরাও করা হবে। ব্যানারে ব্যানারে ছেয়ে আছে মিছিলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। সবগুলোর বক্তব্য প্রায় একই—ইয়াঙ্কস আউট!

কয়েক বছর আগে হনিংটন আরএএফ বেজের কোন গুরুত্ব ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটা টর্নেডো স্ট্রাইক বম্বার থাকত তখন এখানে। গুরুত্ব পাওয়ার মত তেমন কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ করেই গুরুত্ব বেড়ে গেছে এই ঘাঁটির, সারা দেশের নজর পড়ে গেছে ওর ওপর, যেদিন ইউএস এয়ার ফোর্সের গ্যালাক্সি ট্র্যান্সপোর্ট বিমান ক্রুজ মিজাইল নিয়ে অবতরণ করে ওই ঘাঁটিতে।

টর্নেডো বম্বার পরে আস্তে আস্তে সরে গেছে এখান থেকে স্কটল্যাণ্ডে। তার স্থান দখল করেছে মার্কিন এফ-একশো এগারো স্ট্রাইকার। সারাদিন এই এলাকা সরগরম থাকে ওদের গগনবিদারী হুঙ্কারে। কিছুদিন পরই শুরু হয়ে যায় স্থানীয়দের প্রতিবাদ বিক্ষোভ। এসব আগেও অনেক হয়েছে। কিন্তু আজকের মিছিল যেন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। কোলের শিশু নিয়ে গৃহিণীরা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আছে ওতে।

প্রেস, টিভি ক্যামেরার মিছিলটি সবার আগে। তাল রাখতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা ক্যামেরাম্যানদের। তবে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কারও মধ্যে জনসাধারণের সম্পত্তি ধ্বংস করার আগ্রহ দেখা গেল না। এত বড় এক মিছিলকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে পুলিসের দু'জন মাত্র মোটরসাইকেল আউটরাইডার।

থেটফোর্ড থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক গতিতে ইপসউইচগামী বড় রাস্তায় উঠে এল ভ্যালেরি তাতায়েভ। ক্লান্ত সে। বাসায় ফিরে ঘুম দেবে টানা। ইউসটন হল বর্ডার পার হয়ে সাফোকে ঢুকল মেজর। মাইলখানেক এগোতে পথের পাশে দাঁড়ানো পুলিসের এক মোটরসাইকেল আউটরাইডারের ওপর চোখ পড়ল তার। পথের পাশে বাইক স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা।

শক্ত হয়ে গেল তাতায়েভ। কি ব্যাপার! এ পথে বহুবার আশা-যাওয়া করেছে সে, কখনও কোন রাইডারকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। কেন দাঁড়িয়ে আছে লোকটা? ওকে থামাবার জন্যে? কিন্তু না। ওকে দেখল কেবল লোকটা, থেমে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিল না। সাঁ করে জায়গাটা পেরিয়ে এল তাতায়েভ। এক মাইল পেরিয়ে লিটল ফেকেনহ্যাম পৌঁছল।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে দুটো সাদা রঙের রোভার পুলিস কার পার্ক করা আছে পথের পাশে। কাছেই জটলা করছে একদল সিনিয়র অফিসার। গাড়ির শব্দে মুখ তুলে চাইল লোকগুলো। এখানেও বাধা দেয়া হলো না তাতায়েভকে। ব্যাপারটা কি? ভাবছে সে, এত পুলিস কেন রাস্তায়? ফেকেনহ্যাম ছাড়িয়ে এসে ইক্সওয়ার্থ থর্প পৌঁছল সে, গির্জা ডানে রেখে এগোচ্ছে, আচমকা কলজে লাফিয়ে উঠল তার।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুলিসের এক কনস্টেবল, তাকে থামতে

বলছে। গতি কমাতে শুরু করল তাতায়েভ। করণীয় ঠিক করে ফেলেছে মুহূর্তে। ডোর প্যানেলের নিচের দিকের পকেটে ঢুকিয়ে দিল সে ডান হাত। ভেতরে উলের সোয়েটারে মোড়া রয়েছে তার ফিনিশ সাকো। ধারেকাছে আর কেউ নেই। এই সুযোগে লোকটাকে শেষ করে দিয়ে পালাবে সে।

এটা যে একটা ফাঁদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই ভ্যালেরি তাতায়েভের। কিন্তু তাহলে আর লোকজন কোথায়? ভাবতে ভাবতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল সে, টান টান হয়ে আছে স্নায়ু।

'সমস্যাটা কি, অফিসার?'

'সামনের রাস্তা বন্ধ, স্যার। যেতে পারবেন না। দেরি হবে।'

'কেন? বন্ধ কেন?'

'বড় একটা মিছিল আসছে এদিকে। ওটা ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত…ওই চার্চের সামনে গাড়ি পার্ক করতে হবে আপনাকে, স্যার। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঝামেলা বিদেয় হবে আশা করি।'

ব্যাটা চালাকি করছে না তো? ভাবতে ভাবতে ধীরগতিতে গজ পঞ্চাশেক এগোল ভ্যালেরি তাতায়েভ। গির্জার সামনের খোলা জায়গায় সেলুন দাঁড় করাল। তারপর লুকিং গ্লাসের ভেতর দিয়ে পিছনে তাকাল। না, ওর দিকে কোন খেয়াল নেই পুলিসটির। আরেকটা গাড়ির গতিরোধ করতে ব্যস্ত সে। দু'মিনিট পর ওটাও দাঁড়াল এসে তাতায়েভের পিছনে। হুঁম! ভাবল সে, তার মানে সত্যি কথাই বলেছে লোকটা।

কিন্তু ঝামেলা তাতে কমল না তার। ভেবেছিল তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে বিশ্রাম নেবে, হলো না তা। গ্লাসে চোখ রেখে বসে থাকল তাতায়েভ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দশ বারোটা গাড়ি জমে গেল তার পিছনে। ওদিকে আরেক আউট রাইডার এসে পৌঁছল। প্রথমজনকে কি যেন বলল সে। দু'জনে হাসল খানিক। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে থেটফোর্ডের

দিকে ফিরে গেল প্রথমজন। পরেরজন রইল তার জায়গায়। শিফট্ বদল হলো বোধহয়, ভাবল তাতায়েভ।

পাক্ খেয়ে আরও খানিকটা ওপরে উঠল 'কপ্টারটা। পাইলট এবং ওপাশের জানালা ঘেঁষে বসা মাসুদ রানার মাঝখানে বসে আছে কনস্টেবল। সবার নজর নিচের জনস্রোতের ওপর। অবাক হলো মাসুদ রানা। এতবড় মিছিল আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

'ওই যে সেই গির্জা,' হাত তুলে দেখাতে যাচ্ছিল কনস্টেবল, ধরে ফেলল রানা হাতটা।

'হাত দেখাতে হবে না। মুখে বলুন।'

'উই যে, একদম আগের সেলুনটা, ওটাই।'

ভাল করে তাকাল মাসুদ রানা। মিছিলের প্রায় সিকি অংশ ততক্ষণে গির্জার এদিকে পৌঁছে গেছে। ওটার আকার দেখে খানিক সাহস এল বুকে ওর, কম করেও আরও এক ঘণ্টা আটকে থাকতে হবে লোকটাকে। কাছে চলে এসেছে গির্জা। এবার তাকে দেখতে পেল রানা। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জনতার দিকে চেয়ে আছে।

হ্যাঁ, এই-ই সেই। বিনকিউলারে মুখটা একবার দেখে নিয়েই ঝট্ করে ওটা নামিয়ে নিল মাসুদ রানা। এক পলকেই তাকে চিনতে পেরেছে ও। ইশারায় পাইলটকে 'কপ্টার ঘোরাতে বলল রানা। ফিরে চলল ওটা থেটফোর্ড।

'ইপসউইচ পুলিসকে কি জানাব, স্যার?' প্রশ্ন করল সার্জেন্ট। মাসুদ রানার ওপর রীতিমত শ্রদ্ধা জন্মে গেছে তার। এখানে ওখানে ফোন করে যে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে লোকটা, রীতিমত অবিশ্বাস্য।

নিমগ্ন হয়ে ম্যাপ দেখছে মাসুদ রানা। আকাশে কয়েক চক্কর দিয়ে

এইমাত্র ফিরে এসেছে ও। ইক্সওয়ার্থে যখন আটকেছে লোকটা, তখন ছাড়া পাওয়ার পর হয় স্টোমার্কেট অথবা ইপসউইচ যাবে সে। তবে যেদিকেই যাক, রাস্তা একটাই পরেরটায় যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, ভাবল রানা। কারণ জায়গাটা একজন ইললিগ্যালের গা ঢাকা দেয়ার জন্যে আদর্শ স্থান। 'বলবেন, স্টোমার্কেটে আমার জন্যে একটা গাড়ি আর দুটো মোটর সাইকেল রেডি রাখতে। এখনই রওনা হব আমরা।'

রানার বক্তব্য দ্রুত রিলে করল সার্জেন্ট টেলিফোনে। বিএসএস চীফের সরাসরি নির্দেশ পেয়েছে সে মাসুদ রানাকে যতরকম সহায়তা প্রয়োজন, করতে। কাজেই রানা যা বলছে, বিনা প্রশ্নে তাই করে যাচ্ছে সে। একই নির্দেশ ইপসউইচ পুলিসও পেয়েছে লণ্ডন থেকে। সার্জেন্টকে জানাল তারা, এখনই পালন করতে যাচ্ছে তারা মাসুদ রানার নির্দেশ।

রিসিভার রেখে বিনয়ের সঙ্গে রানার আর কিছু প্রয়োজন কি না, জানতে চাইল সার্জেন্ট। 'চেস্টারফিল্ডের পুলিস সুপার স্যাম রস্টনের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল রানা।

দুই মিনিটে জানা হয়ে গেল যা জানতে চেয়েছিল ও। হ্যাঁ, জানালেন উচ্ছ্বসিত সুপার, আপনার ধারণাই ঠিক। ফ্ল্যানারির ঠিকানাটা ব্লাইণ্ড। ওই ঠিকানায় নেই কেউ ও নামে। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার সার্জেন্টের হাতে তুলে দিল রানা।

সকাল নয়টা। রাস্তার পাশে গাড়ির এঞ্জিন কভার তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। গত আধ ঘণ্টা ধরেই দাঁড়িয়ে আছে ও, একের পর এক সিগারেট টেনে সময় পার করছে। গিলটি মিয়া ভেতরে বসা। ওরা রয়েছে স্টোমার্কেটের এপাশে। ওদিকে ব্রায়ান স্মিথ আর হ্যারি নিগেল দুই মোটর সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে সামনে।

সাড়ে ন'টার দিকে দূর থেকে চোখে কাঁচের প্রতিফলিত আলো পড়ল

মাসুদ রানার। আসছে ইপসউইচ বাউণ্ড ট্রাফিক! ঝুঁকে পড়ল ও এঞ্জিনের ওপর। ঠিক চার মিনিট পর হুশ্-শ্ করে ওকে পাশ কাটাল ভ্যালেরি তাতায়েভ। মাঝখানে আরেকটা গাড়ি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর এঞ্জিন কভার বন্ধ করে ঝটপট্ উঠে পড়ল গাড়িতে। মাঝের বাধাটার জন্যে এখন তাকে দেখতে পাচ্ছে না তাতায়েভ। ছুট্ লাগাল মাসুদ রানা।

স্টোমার্কেট পেরিয়ে এসে পথে আরও দুটো মোটর সাইকেলকে পাশ কাটাল ভ্যালেরি। কিন্তু এখন ওসব দিকে নজর দেয়ার সময় নেই তার, তুমুল গতিতে ধেয়ে চলেছে সে। হুইটনের সামান্য আগে ডানে বাঁক নিয়ে শিভালিয়ার স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল তাতায়েভ। তারপর অঁরওয়েল নদীর ওপরকার হ্যাণ্ডফোর্ড ব্রিজ পেরিয়ে রেনেলাগ রোডে পড়ল।

ব্যাটা ইপসউইচ থামছে না, ভাবল মাসুদ রানা। বেলস্টেড রোডে গিয়ে পড়েছে তখন সেলুন। ইপসউইচ থেকে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে রাস্তাটা, কলচেস্টারের দিকে। শেষ মুহূর্তে আচমকা বাঁক নিল গাড়িটা বাঁয়ে, ঢুকে পড়ল ইপসউইচ হাউজিং এস্টেট কমপ্লেক্সে। কয়েকশো গজ পিছনে খুদে একটা মার্কেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। সামনের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। কোন বাড়িতে ঢুকল সেলুনটা বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না ওর।

একটার দিকে ঘুম ভেঙে গেল ভ্যালেরি তাতায়েভের। ভাল ঘুম হয়নি। অথচ যে ধকল গেছে গত প্রায় বারো ঘণ্টা, হওয়া উচিত ছিল। বিছানায় উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল সে ঝাড়া দশ মিনিট। নেটের পর্দার ভেতর দিয়ে উল্টোদিকের বাড়িটার সামনে চার-পাঁচজন লোককে দেখতে পেল তাতায়েভ। কারা ওরা?

পরক্ষণে ওদের অতি বিনয়ী ভাব-সাব দেখে বুঝল, নিশ্চয়ই

ক্যানভাসার। ভোট চাইতে এসেছে। মুচকে হাসল তাতায়েভ। বাথরুমে ঢুকে গোসল-শেভ সেরে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এল। নিচতলার কিচেনে এসে হালকা কিছু খাবার তৈরি করে পেটে চালান করল। ওর ফাঁকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে পিছনের খুদে বাগানটার দিকে তাকাল সে কয়েকবার।

বাগানে ঢোকার পিছনের গেটের ভেতরদিকে, বাগানের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত একটা মিহি, প্রায় অদৃশ্য ফিশিং লাইন বাঁধা আছে। তাতায়েভ নিজেই বেঁধেছে। হাঁটু সমান উচ্চতায়। যেখানে যেখানে ফুলের গাছ আছে, ঠিক তার আড়ালে আবডালে; যাতে বাইরে থেকে কিছুই টের না পাওয়া যায়, এক ইঞ্চি ব্যবধানে বেশ কিছু খালি টিন ক্যান ঝুলিয়ে রেখেছে সে ওই লাইনের সঙ্গে।

কেউ যদি ওই পথে প্রবেশ করতে চায়, নিঃসন্দেহে ফাঁদটায় পা দিয়ে ফেলবে সে। ক্যানের সংঘর্ষের আওয়াজে সতর্ক হয়ে উঠবে তাতায়েভ। বেরিয়ে যাওয়ার সময় লাইনের এক প্রান্ত খুলে রেখে যায় সে। যখন বাসায় থাকে, তখনই ওটা টানা থাকে। যেমন থাকার কথা, ওটা তেমনি আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলো ভ্যালেরি।

সাঁঝ গড়িয়ে গেছে। বারো নম্বর চেরিহে'জ ক্লোজের পিছনে বাগানের বাইরে, একটু দূরে মাটিতে বসে আছে মাসুদ রানা, গিলটি মিয়া এবং আরেকজন- জিম প্রেসটন। জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকার। জরুরি তলব দিয়ে লণ্ডন থেকে আনিয়ে নিয়েছে ওকে মাসুদ রানা। যা-তা কথা নয়, হেলিকপ্টার নিয়ে ওস্তাদ নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। নিজেকে খুব বড় কেউকেটা মনে হচ্ছে জিম প্রেসটনের।

এই মুহূর্তে নাইটগ্লাস দিয়ে বাড়িটার পিছনের বাগান পর্যবেক্ষণ করছে সে। দোতলার বেডরুমে আলো জ্বলছে বাড়িটার। জানালার পর্দায় মাঝেমধ্যে ছায়া দেখা যাচ্ছে একটা, হাঁটাহাঁটি করছে। লোকটা এ বাড়ির বাসিন্দা—মার্টিন ফ্ল্যানারি।

'একটা কিছু আছে মনে হয়, স্যার,' নাইটগ্লাস নামিয়ে রানার দিকে তাকাল প্রেসটন।

'কি ধরনের?'

মাথা চুলকাল লোকটা। 'আমরা একে বলি লাইন-ট্র্যাপ। সরু, মজবুত সুতোয় বেঁধে খালি ক্যান টিন ঝুলিয়ে রাখা। অসাবধানে ক্রস করতে গেলে পায়ে লেগে শব্দ ওঠে, সেই জন্যে পাতা হয় এ-ফাঁদ।'

'লাইনটা দেখতে পেয়েছ?'

'না, স্যার। তবে কয়েকটা ক্যান দেখেছি। লাইন খোঁজার প্রয়োজন নেই, ডিঙিয়েই চলে যেতে পারব আমি।'

সন্দেহ গেল না মাসুদ রানার। 'পারবে তো! না হলে কিন্তু··· ।'

যেন লজ্জা পেয়ে গেছে, মুখ নামিয়ে আবার মাথা চুলকাল প্রেসটন। আড়চোখে ওস্তাদের দিকে তাকাল একবার।

'ও হলো, স্যার, বাগের বাচ্চা,' ওকালতি করল গিলটি মিয়া। 'ওসব কোন ব্যাপারই নয় ওর কাচে।'

'বেশ। তৈরি হও।'

কাঁধের ঝোলাটা টেনে সামনে নিয়ে এল প্রেসটন, ধরে থাকল একহাতে। তারপর পা বাড়াল আড়ালে আড়ালে। নজর দোতলায়, বেডরূমের জানালায়। আবার দেখা গেল ছায়াটা। এখনও হাঁটাহাঁটির ওপরেই আছে লোকটা। নেটের বেড়া ডিঙিয়ে সন্তর্পণে ঢুকে পড়ল প্রেসটন বাগানে। ক্যানগুলোর ওপর সতর্ক চোখ রেখে লাইনটা টপকাল। পর মুহূর্তে মিশে গেল অন্ধকারে।

দরজার সামনে বোঁচকাটা নামিয়ে বসে পড়ল সে হাঁটু গেড়ে। লেগে পড়ল কাজে। দরজার তালাটা দেখে হাসি পেল প্রেসটনের। একেবারে সাধারণ ইয়েল লক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে বলে সময় একটু বেশি লাগল। বিশ মিনিট পর ফিরে এল সে। তুলে দিল চাবিটা মাসুদ রানার হাতে।

তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'ওয়েল ডান।'

থুত্নি নেড়ে আদর করল গিলটি মিয়া শিস্যকে। 'কেমন, স্যার, বলিনি, ও হচ্চে' গে বাগের বাচ্চা!'

নিচে নেমে এল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। কেন যেন অস্থির লাগছে। টিভি অন্ করে তাতে মন বসাতে চাইল, হলো না। কিছুই ভাল লাগছে না। কেন যেন টান-টান হয়ে আছে স্নায়ুগুলো। বাইরের রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি গেলেই চমকে উঠছে সে। সাকো অটোমেটিকটা সামনের সেন্টার টেবিলে রেখেছিল তাতায়েভ, তুলে নিল আবার।

আমি কি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি? নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, কিন্তু কেন? দূর! নিজের ওপর চটে উঠল সে। হাতঘড়ি দেখল, দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বরং মস্কো রেডিওর কমার্শিয়াল শোনা যাক। দেখা যাক, কোন সংবাদ থাকে কি না ওর জন্যে। থাকতে পারে। কারণ তাতায়েভ ওর তরফ থেকে শেষ খবর জানিয়ে দিয়েছে ওদের।

টিভি অফ্ করে রেডিও খুলল সে। সেই একই সময়ে, পিছনের দরজার তালা খুলে ফেলেছে মাসুদ রানা। সময় নির্ধারণ করেই দুদিক থেকে এগিয়েছে ওরা। ঠিক দু'মিনিট পর প্রকাণ্ড একটা ঢিল এসে পড়ল বাড়ির সামনের কাঁচের দরজায়। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেরি তাতায়েভ। হতভম্বের মত ঘুরে তাকাল। পর মুহূর্তে পড়ল আরেকটা ঢিল। পিছনে নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে পড়ল ঘরে মাসুদ রানা। ওয়ালথার বাগিয়ে পায়ে পায়ে এগোল। কোথায়, নিশ্চয়ই দোতলায় আছে লোকটা, ছুটে আসবে এখনই।

আরও দু'পা এগোতেই লোকটাকে দেখতে পেল ও। প্রচণ্ড রাগে টকটকে মুখটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তাতায়েভের। ছুটে বেরিয়ে আসছে সীটিংরূম থেকে। হিসেবে সামান্য ভুল হয়ে গেল। রানা ভেবেছে দোতলায়

আছে সে। কাঁচ-ভাঙার শব্দে নেমে আসবে, তখনই পিছন থেকে তাকে কাবু করবে ও। কিন্তু লোকটা যে নিচে থাকবে, ভাবেনি। পলকে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে রানাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে, বিদ্যুৎগতিতে অস্ত্র তুলেই টেনে দিল ট্রিগার। কিন্তু আগেই বসে পড়েছে রানা ঝপ্ করে। ওর অন্তত এক সেকেণ্ড আগে শত্রুকে দেখতে পেয়েছে রানা, সময়টা কাজে লাগাতে ভুল হয়নি ওর।

রানা জানে লোকটা 'স্পেৎস্নৈজ', কেজিবির সর্বোচ্চ ট্রেনিং পাওয়া এলিট স্যাবোটিয়ার। একে বিন্দুমাত্র আণ্ডারএস্টিমেট করা মানেই পলকে মৃত্যু। কাজেই তাকে কোন সুযোগ দিতে পারে না ও। পিস্তল তুলেই গুলি করল মাসুদ রানা। তাতায়েভের বাঁ দিকের বুকে ছোট্ট একটা ফুটো করে ঢুকে গেল বুলেটটা।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল ভ্যালেরি, পলকে বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। বুলেটের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল এক পা। ওই অবস্থায়ই আবার গুলি করল সে, গর্জে উঠল সাকো অটোমেটিক। রানার কানের পাশ দিয়ে 'বিঙ' শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বিষাক্ত বুলেট। পর পর আরও দুটো গুলি করল মাসুদ রানা, উড়ে গিয়ে পিছনের সোফার ওপর আছড়ে পড়ল তাতায়েভ।

ওই অবস্থায়ই শূন্যে উঠে গেল তার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত, অস্ত্রটা নেই ওখানে, পড়ে গেছে। প্রচণ্ড আক্ষেপে চেঁচিয়ে কি যেন বলতে গেল লোকটা, কিন্তু শেষ করতে পারল না। এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, আটকে দিল কথাটা। শিথিল হাতটা থপ করে দেহের পাশে নেতিয়ে পড়ল। মারা গেছে মেজর ভ্যালেরি আলেক্সেইভিচ তাতায়েভ।

মৃত মেজরের কানের কাছে বাজছে রেডিও। 'রেডিও মস্কোর ইংরেজি ভাষার অনুষ্ঠান থেকে প্রিয় শ্রোতাদের জানাই শুভরাত্রি। এখন শুনুন দশটার খবর। প্রথমে শিরোনাম। তেরি..., আমি দুঃখিত, তেহরান থেকে

পাওয়া খবরে... ।'

এগিয়ে এসে সেটটা অফ করে দিল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্ত অপলক চেয়ে থাকল তাতায়েভের খোলা চোখের দিকে। কী এক অব্যক্ত বেদনা, হতাশা যেন রয়েছে ওখানে।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

জেনেভা। সাত দিন পরের ঘটনা। কেজিবির এক সেফ হাউস। চার তলার জানালা দিয়ে নিচের রাস্তা দেখছেন জেনারেল ভ্লাদিমিরোভিচ বরিসভ। ঠিক সময়মতই পৌঁছুল যুবক। সেফ হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল একটা নীল কর্টিনা। পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে।

দীর্ঘদেহী। পরনে চমৎকার ছাঁটের গ্রে স্যুট। সাদা শার্ট। হাতে বোনা লাল টাই। চুল ব্যাক ব্রাশ করা। হাতে একটা ব্রিফকেস্। তিন মিনিট পর জেনারেলের মুখোমুখি বসা দেখা গেল যুবককে। ব্রিফকেস খুলে একটা ফাইল জেনারেলের দিকে এগিয়ে দিল আগন্তুক।

'এর মধ্যে আপনি যা যা চেয়েছিলেন সব পাবেন, কমরেড জেনারেল।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার মাসুদ রানা,' অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ফাইলে চোখ বোলাতে শুরু করলেন জেনারেল। খস্ খস্ করে দু'তিনটে পৃষ্ঠা উল্টে গেলেন। পড়লেন না, কেবল দেখে অনুমান করে নিলেন কি আছে এতে। সশব্দে ফাইল বন্ধ করে আবার বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

চেয়ে থাকল রানা জেনারেলের দিকে। ওই ফাইলে আছে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভের 'জবানবন্দী'। 'ধরা পড়ার' পর বিএসএসকে বাধ্য হয়েছে সে 'সব জানাতে'। লিপিবদ্ধ আছে তা এই ফাইলে। প্ল্যান অরোরার সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি। যার পূর্ণ বিবরণ ক'দিন আগে জেনারেল নিজেই রানার হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর এক লণ্ডন রেসিডেন্টুরার

সাহায্যে। এই 'জবানবন্দীর' একটি কপি নিয়ম অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা।

তবে যে জন্যেই হোক, ব্রিটিশ সরকার এমন দুনিয়া কাঁপানো ষড়যন্ত্রের খবরটি এখনও চেপে রেখেছে। প্রেসকে জানায়নি।

'আপনার উদ্দেশ্য কি জেনারেল? এগুলো দিয়ে কি করতে চাইছেন?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেনারেল। 'তার আগে বলুন, এগুলো, কাগজগুলো খাঁটি কি না।'

'সম্পূর্ণ খাঁটি। ব্রিটিশ ডিফেন্স মিনিস্ট্রির এক্সপার্টরা নিজ হাতে ডকুমেন্টগুলো তৈরি করেছেন আমার অনুরোধে।'

'আমি যে এগুলো চেয়েছিলাম, আপনি আর জেনারেল রাহাত খান ছাড়া আর ক'জন জানে?'

'বিএসএস চীফ আর মিনিস্ট্রির দুই এক্সপার্ট। আপনি যা ভাবছেন, তার কোন সম্ভাবনাই নেই। কোনমতেই এর গোপনীয়তা ফাঁস হবে না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। 'মেজর ভ্যালেরির জন্যে খুব খারাপ লাগছে, মিস্টার রানা। ওর মত খাঁটি হীরে জীবনে খুব কমই নজরে পড়েছে আমার।'

'আমি দুঃখিত, কমরেড জেনারেল। ওরকম পরিস্থিতিতে...'

'আমি বুঝি, ইয়াং ম্যান। বুঝি। আপনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আমি ভাবি তাদের কথা যারা ওকে এ কাজে পাঠিয়েছিল। সে যাকগে, কি যেন জানতে চেয়েছিলেন? ও, হ্যাঁ। কি করব ওগুলো দিয়ে, না? মেজর বাষট্টির কিউবা মিজাইল সঙ্কটের কথা মনে আছে আপনার?'

'আছে।'

'সঙ্কটটা সৃষ্টি করেছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চভ। পুরো বিশ্বকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তাঁর সেই হঠকারী সিদ্ধান্ত। এই অভিযোগে চৌষট্টিতে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন মিখাইল সুসলভ। এই

দলিলগুলোর সাহায্যে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলেছি আমি।'

'আপনাদের জেনারেল সেক্রেটারি এমন একটা কাজ কেন করতে গিয়েছিলেন?'

'শুধুই নাম কেনার আশায়। নিজেকে অমর করে রাখার জন্যে। অবশ্য তাঁকে ইন্ধন জুগিয়েছিল অন্যরা।' চেহারা কঠোর হয়ে উঠল জেনারেলের। 'ওদের একজনকেও আমি ছাড়ব না।'

'ধরে নিতে পারি আপনি এর পিছনে রাজনৈতিক সমর্থন পাবেন?'

'একশোবার! পলিটব্যুরো সমর্থন দেবে আমাকে। তবে আগে তাদের এগুলো,' ফাইলের গায়ে টোকা দিলেন তিনি, 'দেখাতে হবে। তারপর। আমি মস্কো ফিরে যাওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সোভিয়েত ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লিখিত হবে।'

'আরেকটা প্রশ্ন। অস্ট্রিয়ান ফ্রানজ ওসনিয়াক কেন গিয়েছিল চেস্টারফিল্ডে?'

'নিয়মিত মিশনে। ট্র্যান্সমিটার এবং তার দুই রক্ষকের খোঁজ-খবর নিতে-প্রতি মাসে একবার ওখানে যেত সে।'

এই লোক যদি না যেত চেস্টারফিল্ড, মাসুদ রানা নিশ্চিত, ও কেন, কারও পক্ষেই কিছু করা সম্ভব হত না। 'অল রাইট, কমরেড জেনারেল,' উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাল ও। 'আশা করছি আপনার মিশন সফল হবে। চলি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেন্টলম্যান, অ্যাণ্ড গুড বাই। আবার দেখা হবে।'

দরজার কাছে এসে পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। হ্যাঁ, হয়তো হবে, ভাবল ও। হয়তো আর কোথাও। হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে তখনকার পরিবেশ। আমার বুকে অস্ত্র ধরবেন হয়তো তখন আপনি, অথবা আমি আপনার। দায়িত্ব ও কর্তব্যের কী বিচিত্র খেলা।

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

***

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২৩-৮-৯৪ আমি রবিন বলছি (প্রজাপতি থ্রিলার) রকিব হাসান

বিষয়: কিশোর বন্ধুরা, আমি রবিন মিলফোর্ড। হ্যাঁ, তিন গোয়েন্দার রবিন।... বাংলাদেশে আরও গিয়েছি আমরা—আমি, মুসা, কিশোর। জানানো হয়নি তোমাদের। এ-বইতেই বিস্তারিত জানতে পারবে সব। নাও, এবার পড়ে ফেলো আমাদের,অর্থাৎ তিন গায়েন্দার, আরেকটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

২৩-৮-৯৪ মধুযামিনী (রোমান্টিক) শেখ আবদুল হাকিম

বিষয়: লিলি—ভালবাসা শুধু দিতেই জানে। ফিউরি—জড়সুদ্ধ ভালবাসা উপড়ে ফেলতে চায়। আছে ভালবাসার কাঙাল—রায়হান। আর আছে পাগলামি ও মহানুভবতায় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী—শাহীন।...তবুও জন্ম নেয় প্রেমের চারা।

আরও আসছে

২৫-৮-৯৪ কুয়াশা (৪৬, ৪৭, ৪৮) ভলিউম ১৬ কাজী আনোয়ার হোসেন

২৮-৮-৯৪ রহস্যপত্রিকা (১০ বর্ষ ১১ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৯৪)